ঠাকুর

শ্রীহরনাথ

সম্বন্ধে

আমার অভিজ্ঞতা

চতুর্থ খণ্ড

রায় সাহেব

শ্রীঅক্ষয় কুমার গুপ্ত

লিখিত

এবং

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের

দ্বিসপ্ততিতম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে

কলিকাতা শ্রীহরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

বিনামূল্যে বিতরিত। [illegible]

১৩৪৪

প্রকাশক—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত
১৫ নং চূণাপুকুর লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা।

আষাঢ়, ১৩৪৪ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৫২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আলোচনা করিলে কৃতার্থ হইব।" এসবই দয়াময় ঠাকুরের ইচ্ছা, আমাদের বুদ্ধির অগম্য লীলা !!

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরের এক বাণী "জীবনে একটী লোককেও নাম লওয়াইতে পারিলেই তৃণ তুলিবার মত নিত্যানন্দকে সাহায্য করা হবে, তখন নিতাই কোলে তুলে তোমাদের মুখ চুম্বন করিবে, তখন কৃতার্থ হবে।" (পত্রাবলী, ৪।১৩১)

শুনিয়াছি উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামনিবাসী জনৈক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক "অভিজ্ঞতা" পাঠ করিয়া ঠাকুরের একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছেন।

আমার পুত্র কন্যাগণের শিশুকাল হইতেই ঠাকুরের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যকুমার ছোট বেলায় একবার তাহার মায়ের সহিত কোন্দল করিয়া বলিয়াছিল 'কৈ মা তোমার ঠাকুর আমাকে ত স্পর্শ করে না!" সেই দিনই আমরা যখন ঠাকুর সকাশে গিয়াছি ঠাকুর প্রথমেই তাহার পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমান্ অমূল্য এখন মান্দ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়েব ইঞ্জিনিয়ার, পুনায় আছে। প্রতি মাসে একজন পে ক্লার্ক হেড্ কোয়ার্টার হইতে প্রত্যেক ষ্টেশনে আসিয়া রেলের কর্ম্মচারিগণের বেতন বিলি করিয়া যান। শ্রীমান অমূল্যের এলাকার মধ্যে বেতন বিলি করার কালে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। এই কাজের সময় সে একদিন লক্ষ্য করে যে ঐ মান্দ্রাজী ভদ্র লোকের বুকে ঠাকুরের প্রতিকৃতিযুক্ত একটী ছোট লকেট দেখিয়া সে ঔৎসুক্য বশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারে যে তিনি ঠাকুরের একজন পরম ভক্ত। আমি আনন্দ পাইব এই জন্য সে ঐ পে ক্লার্ক বাবুর ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার নিজের যাহা অভিজ্ঞতা আছে তাহা তাঁহার নিজের হাতে ইংরাজিতে লিখাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

"গত জুলাই মাসে মাদ্রাজে ঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২রা জুলাই

রাজমহেন্দ্রীর শ্রীযুক্তা কমলা বাঈ আম্মল বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস উপাসনা ও বক্তৃতা শেষ হইতে রাত্রি হয়। তখন সকলেই আহার করিতে চলিয়া যান। ঐ সময় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে পান ঠাকুরের ফটোর গালে ও ঠোঁটে মাখন। ক্রমে উহা বাড়িতে লাগিল। ইহা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সকলে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ফটোর পায়ের কাছে বাটিতে মাখন ও ফল মূল ভোগের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন বাটীতে মাখন নাই, ছোট ছোট আঙ্গুলের দাগ রহিয়াছে।

অন্য একদিনের কথা। Queen Mary's College—যাহা এখন গণ্টুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে—উহা বিজয়নগরে ছিল। ঐ কলেজের লেকচারার শ্রীযুত বীরভদ্র রাও ঠাকুরের জীবন ও লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন হঠাৎ একতাল মাখন সকলের মধ্যস্থলে পড়িয়া ছড়াইয়া গেল। তখন বিশ্বনাথ শর্ম্মা (বিজয়নগর কলেজের লেকচারার) সমপঞ্জী রাও (শিক্ষক) প্রভৃতি বড় বড় কতিপয় ভক্ত বলিলেন ইহা ঠাকুরের একটি লীলা। আপনারা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করুন। তখন আমরা প্রসাদ লইলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ থাকিয়া গেল। ইহার অল্পক্ষণ পরে Perambur High Schoolএর শিক্ষক বেঙ্কট বামন যিনি এতক্ষণ গভীর ভাবাবেশে তন্ময় ছিলেন তিনি প্রকাশ করিলেন যে তিনি দেখিয়াছেন ঠাকুর বহু ঊর্দ্ধ হইতে সশরীরে নামিয়া আসিয়া সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাখন ছিটাইয়া দিয়াছেন ও দুই হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তাঁহার চেহারা ঠিক এই ছবির মত শ্মশ্রু শোভিত।"

'ঠাকুর হরনাথ' পত্রিকায় এই সকল এবং এই প্রকার অন্যান্য লীলার বিবরণ দেখিয়াছি। ইহাতে ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে কখনও কখনও আমার মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, আমি ভাবিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অবতার ছাড়িয়া ঠাকুর হরনাথের অবতারত্বে বিশ্বাস করি কেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রি, খোলা মাঠে বসিয়া

গুন্ গুন্ করিয়া ঠাকুরের নাম গান করিতেছি অকস্মাৎ আমার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিলাম তরুলতাগুল্ম শোভিত একটি মনোরম উদ্যান নবপল্লব ও বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত। একটি সুশ্রী বালক, বয়স অনুমান নয় বৎসর, চেহারা ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ছবির মত, তেমনি মন ভুলান বসন ভূষণ মুকুট পরা, বাঁশী হাতে, —অকস্মাৎ উদ্যানের একস্থান আলো করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার পর ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, রাম, কৃষ্ণ কিম্বা হরনাথ পৃথক নয়—সকল নামই সেই এক ঠাকুরের।

আমার ভক্তি অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল। একদিন প্রাতঃকালে রাজমহেন্দ্রী Pay Clerkএর আফিস হইতে বাহির হইয়া শৌচ করিতে যাইতেছি, দেখিলাম পুলিশ কম্পাউণ্ডে সুন্দর একটি গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে। আমার নিকট ঠাকুরের একখানি ছবি ছিল। ভাবিলাম ফুলটী তুলিয়া আনিয়া সেই ছবির উপরে রাখি কিন্তু পাছে পুলিশেরা আপত্তি করে এই ভয়ে আর ফুল তোলা হইলনা। ইহার ১০ দশ মিনিট পরে রানিং শেডের একটি কুলী একটী গোলাপ ফুল হাতে করিয়া আমার আফিসে উপস্থিত, তাহার বেতন সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। কুলিটী ফুলটিকে আঘ্রাণ করিতে উদ্যত, তখন আমার মনে হইল আহা! এই ফুলটী যদি ঠাকুরকে দিত তবে বড়ই ভাল হইত। এই কথা আমার মনে হওয়ামাত্র কুলী সেই ফুলটী আমার দিকে নিক্ষেপ করিল, আমি নিয়া ঠাকুরের ছবির উপর রাখিলাম। কুলিটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে পুলিশ কম্পাউণ্ড হইতে ফুলটী আনিয়াছিল।

গত নবেম্বর মাসে আমি কার্য্যব্যপদেশে যখন বাহিরেই কাটাইতেছিলাম তখন কিছুকাল যাবৎ আমার একদিন অন্তর জ্বর হইত। ১৯শে নবেম্বর তারিখে আমি প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার সাহেব (Dr Kurian of Rajah mundri) আমাকে Sick list ভুক্ত করিলেন। জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোঁকাইতেছি এবং মনে মনে ভাবিতেছি ঠাকুর আমার

অদৃষ্টে এই ছিল, এই বিদেশে আমাকে একটু সাহায্য করে এমন কেহ নাই এই অবস্থায় এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। ঐ দিবস বেলা অনুমান ১২॥০ টার সময় দেখি ঠিক ঠাকুর হরনাথের আকৃতি বিশিষ্ট একজন সন্ন্যাসী ষ্টেশনের পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া হঠাৎ আমার আফিসের দরজায় দাঁড়াইলেন। কোন কথা বলিলেন না। আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঐ সময় কোন গাড়ী যাতায়াতের সময় নয় এবং ষ্টেশনে কোন যাত্রীও ছিল না। আমি সন্ন্যাসীকে ভিতরে আসিয়া বসিতে সঙ্কেত করিলাম। তিনি আসিয়া বসিলেন কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা তামিল ভাষায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "ভয় পাইও না, এই প্রকার সামান্য সামান্য অসুখ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে হইয়া থাকে, ইহা ক্ষণস্থায়ী, ঠাকুরের নাম করিতে থাক। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যাইবে।" তিনি চলিয়া যান দেখিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটি কমলা লেবু দিলাম, তিনি কমলাটি নিয়া ঘরের বাহির হওয়ামাত্র অদৃশ্য হইয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না! তিনি যাহা বলিয়া গেলেন তাহাই হইল। সেই দিন সূর্য্যাস্তের সময় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম, তদবধি আর আমার জ্বর হয় নাই।

মাতা কুসুমকুমারীর একখানি ছোট ফটো সর্ব্বদা আমার সঙ্গে রাখি। লাইন হইতে ফিরিয়া ফটোখানি অন্যান্য ছবির মধ্যে পূজার ঘরে রাখি। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন আমার শরীরটা ভাল বোধ করিতেছিলাম না। ঠাকুরের ভোগ দিবার জন্য স্ত্রীকে বলিয়া আমি রাত্রির খাওয়া তাড়াতাড়ি সারিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি যখন প্রায় ১১টা তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে, মনে পড়িল মায়ের ফটোত আমার কাছেই রহিয়া গিয়াছে, ভোগ নিবেদন করার সময় পূজার ঘরে রাখা হয় নাই। এখন এত রাত্রে আর কি করা যায়! ইহা ভাবিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি অনুমান ৫টার সময় আমার স্ত্রী ঘুম হইতে জাগিয়া আমাকে বলে "সে স্বপ্ন দেখিয়াছে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্যায় সাদা শাড়ী পরা গায়ে গহনা কপালে

সিন্দূর দেওয়া একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহার কামরায় প্রবেশ করিল, তাহা দেখিয়া সে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ইনি কে, আমি বলিলাম উনি মাতা কুসুমকুমারী দেবী উঁহাকে প্রণাম কর। তখন সে প্রণাম করিলে মা যেন বলিলেন শুধু প্রণামে হইবে না কিছু ভোগ নিবেদন করিতে হইবে। তাহাতে সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাইরে গেল ও দেখিল বহু লোক একত্র হইয়া ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছে। তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তন্মুহূর্ত্তেই আসিয়া এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার কাছে বলিল।"

এই প্রকার আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি আমার অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ঠাকুরের অপার মাধুর্য্য, অসীম দয়া ও অগণিত লীলা বৃত্তান্ত সামান্ত পুস্তকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়াস বাতুলতা ভিন্ন আর কি! তবে যতটুকু কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করা যায়, তাহারই চেষ্টা তাঁহারই ইচ্ছায় যে ভাবে করাইয়াছেন সে ভাবেই করিয়াছি।

যাহাদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম—সেই পরম ভক্ত বৈষ্ণবগণ যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদাদির অপেক্ষাও রাখেন না তাহা জানি, তত্রাপি অন্ততঃ চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহাদের নিকট একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। তাই নিবেদন এই যে কলিকাতা শ্রীহরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সভার নিকট—বিশেষতঃ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এবং নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট—আমি চিরঋণী থাকিব। এই চারিজন লোকের প্রেরণায়, উৎসাহে এবং সাহায্যে—আমার মত গণ্ড মূর্খের এই গ্রন্থ লিখা। কোন দিন কল্পনায়ও ভাবি নাই এবং আমাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাও কোন দিন ভাবেন নাই যে আমি কোন দিন কোন গ্রন্থ লিখিব। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাদা ত আমার পিছনে লাগিয়াই আছেন। প্রত্যেক বৎসর ফাল্গুন চৈত্র—মাসেই এই গ্রন্থ লিখার আদেশ তাঁহার নিকট হইতে আগত হয়। আমি

আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া যখন যাহা লিখিতে পারি লিখিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেই। পাণ্ডুলিপি সংশোধন আরম্ভ করিয়া গ্রন্থ বিতরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহার এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন দাদার উপর। বৈদ্যনাথ দাদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারক দাদা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিলে তবে তাহা প্রেসে যায়।

আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে কাগজের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় বৈদ্যনাথ দাদা আমাকে প্রথমতঃ লিখিয়াছিলেন "পুস্তক অত্যধিক বৃহৎ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক"। তৎপর কি জানি কি মনে করিয়া তিনি আমাকে ক্রমান্বয়ে লিখিতে আরম্ভ করিলেন ১। "পুস্তক ক্ষুদ্র না হইলেই আনন্দের বিষয়" ২। "পুস্তক ছোট হইলে বড়ই দুঃখের হইবে" ৩। "আহা, দাদা, সংক্ষেপ করিতে যাইয়া একটি ডাইরীতে পরিণত করিতেছেন, প্রথম প্রথম পাঠককে যেরূপ ভাব সাগরে ডুবাইয়া রাখিতেছিলেন ক্রমে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। উপায়ও নাই! বোধ হয় সব কথা বলিতে হইলে এ পুস্তকের অন্ত পাওয়া যাইবে না। "অমিয় নিমাই চরিত" অপেক্ষাও বহু বহুগুণে বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়িবে।...যাহাতে আমাদের হৃদয় ভক্তিরসে কোমল হয়—পাষাণ গলিয়া যায়—সে সুর ধরিয়া সহসা তাহা বন্ধ হইলে বড়ই ফাঁক ফাঁক মনে হয়। আমার বলিবার নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। যদি শ্রীহরনাথ আপনার বাঁশীতে আবার এ সুর তুলেন, জগৎ ধন্য হইবে।" অবশ্য আমি নিজে জানি যে আমার কি ক্ষমতা এবং ইহাও জানি যে এই সমস্ত মন্তব্যের উপযুক্ত আমি নহি। তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হরনাথের তত্ত্ব-প্রচার, তাই আমাকে তিনি কিরূপ ভাবে উৎসাহিত করিয়া এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কোটেসন কয়েকটী দেওয়া হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'আমাকে যাহারা ভজন করে, আমি তাহাদিগকে নানারূপ দুরবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দেই। তাহাদের বন্ধু বান্ধব ধীরে ধীরে ছাড়িয়া যায়।

তখন ভক্তের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ হয়, অবশেষে ভক্তকে আমি কৃপা করি।' আমাদের বৈদ্যনাথ দাদারও ঠিক সেই অবস্থা। একে একে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার এখন একমাত্র সম্বন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে। দিবারাত্রি নিজের শরীর এবং অর্থ দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব জগতে বহুল পরিমাণে প্রচার করাই এখন তাঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে হরনাথ জগতে তাঁহার দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা আমার জানা নাই। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন দাদাও আমাকে এই গ্রন্থ লিখিবার জন্য অবিরত উৎসাহ দিতেছেন, পাণ্ডুলিপি সময়ে সময়ে সংশোধন করিয়া দিতেছেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে "প্রকাশকের নিবেদন" শীর্ষকের মধ্যে আমাকে নানারূপ ফুলাইয়া দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষও আমাকে সর্ব্বদাই ঐরূপে এবং তাঁহার নিজের লিখিত প্রবন্ধে ও সভার বার্ষিক রিপোর্টে আমার সম্বন্ধে নানারূপ লিখিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। এই তিনজন মহাজন (১। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাদা, ২। নারায়ণ দাদা ও ৩। দ্বিজেন দাদা) শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব প্রচার করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বদাই ঐ চিন্তা, ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান। শ্রীশ্রীঠাকুর জানিয়া শুনিয়াই যোগ্যতম ঐ তিন ব্যক্তিকে হরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক, সহকারী সভাপতি ও সভাপতি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যতদিন এই সভাটি থাকিবে ততদিন সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন থাকিবে এবং ঠাকুরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে ইহারা যেন জীবনের বাকী দিন কয়েকটী এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ঠাকুরের প্রিয় সভাটী বজায় রাখিতে পারেন। আমি তাঁহাদের চরণে বারংবার প্রণত হইতেছি। আবার যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ সেবায় জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন যথা।— শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষাল, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, উলুবেড়িয়া ও দেউলটীর ভক্তগণ, বঙ্গে ভ্রাতাগণ, মান্দ্রাজের রামুদাস, বীরভদ্র রাও প্রভৃতি, তাঁহাদের চরণেও আমি পুনঃ পুনঃ

প্রণত হইতেছি। আমার মনে হইতেছে আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না এবং বোধ হয় এই গ্রন্থই আমার শেষ গ্রন্থ। সুতরাং আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া যাইতেছি যে সেবা ও প্রচারের সৌষ্ঠব এবং অক্ষুণ্ণতার জন্য যে ভক্ত যেরূপ সেবার অধিকারী এবং যে ভাবে সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে যেন সেইরূপ সেবার কার্য্যেই চিরকাল বহাল রাখেন।

আমি এই গ্রন্থ লিখিতে পেন্সন প্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার রায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের উপদেশ এবং তাঁহার লিখিত "শ্রীনন্দ-লালা" গ্রন্থ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্য শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত "গল্পে ভাগবত" গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং কোন কোন স্থানে তাঁহাদের ভাষাও গ্রহণ করিয়াছি। আমি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নমো শ্রীকুসুম-হরনাথায় নমঃ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথ-পদাশ্রিত

বৈষ্ণব দাসানুদাস —
শ্রী অক্ষয় কুমার গুপ্ত।

আগরতলা,
ত্রিপুরা।
১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৪।



Sree Sree Thakur Haranath

"ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথ"

সম্বন্ধে

আমার অভিজ্ঞতা

চতুর্থ খণ্ড

—:*:—

"শ্রীগুরু চরণ পদ্ম [illegible]

বন্দ মুই [illegible]

যাহার প্রসাদে ভাই [illegible]

কৃষ্ণপ্রাপ্তি [illegible]

গুরুমুখপদ্ম বাক্য [illegible]

আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই

দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত

প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা [illegible] যাতে

বেদে গায় যাহার [illegible]

---

* যাহা হনে—যাহা হইতে। প্রাচীনকালে রাজসাহী এবং অন্য অন্য [illegible] "হইতে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "হনে" ব্যবহৃত হইত।



Sree Sree Thakur Haranath

"ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথ"

সম্বন্ধে

আমার অভিজ্ঞতা

চতুর্থ খণ্ড

—:*:—

"শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দ মুই সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥ *
গুরুমুখপদ্ম বাক্য হৃদি কর মহা শক্য
তার না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত॥

* যাহা হনে = যাহা হইতে। প্রাচীনকালে রাজসাহী এবং অন্য অন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে "হইতে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "হনে" ব্যবহৃত হইত।

শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু অধম জনের বন্ধু
(গুরুদেব) আমার জীবন।
হাহা, প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন॥”

“হাহা প্রভু হরনাথ! রাখ পাদ দ্বন্দ্বে॥
কৃপা দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তবে হও পূর্ণ কৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধা কৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাও রাত্রি দিনে।
(এ অধম) বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥”

“যার মনে লেগেছে যাঁরে সেই তারে ভজে গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর দুলাল গোরা গো॥
কহ না গৌর কথা গো সই কহনা গৌর কথা গো।
গৌর নাম অমিয় ধাম পীরিতি মূরতি গাঁথা গো॥
গৌর বিহনে না রহে পরাণ গৌর করেছি সার গো।
গৌর বলিয়ে পরাণ যাক্ কিছু না চাহি আর গো॥
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি গৌর মুখেরই হাসি গো।

গৌর গমন গৌর গঠন হৃদয়ে রহিল পশি গো।
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা গো॥
জীবনে গৌর মরণে গৌর (আমি) গৌর বই আর জানি না গো
যা করে গৌরাঙ্গ হরি—গৌর গলার হার গো॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ, যাঁহার হৃদয়ে জাগে গো।
(এ অধম) দাস অনুগত তাঁর চরণে শরণ মাগে গো॥"

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু হরনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার।
(এ অধম) হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥"

"রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ! মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুল চন্দ্র! গোপীজন বল্লভ!
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী-শিরোমণি।

হেম গৌরী শ্যাম-গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি ।
অধম দুর্গতি জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি ।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে ।
অঞ্জলি মস্তকে করি নরাধম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মন সাধে ॥"

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ সংসার নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করম পাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ
আপন আপনা স্থানে টানে ॥
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥

না লইনু সৎমত   অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
(অধম অক্ষয়) কয়,   দেখি শুনি লাগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥"

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের উপসংহারে লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, "দেখিতেছি অনেক কিছুই বাকী রহিয়া গেল—তাহাতে আরও একখণ্ড লিখা তো নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু এই তিন খণ্ড লিখিতে যে সুযোগ সুবিধা পাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহা আর পাইব কি না সন্দেহ * * *।" করুণাময় ঠাকুর আমার, করুণা পূর্ব্বক আমাকে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় তাঁহারই শ্রীচরণ স্মরণ করতঃ আজ আবার লেখনী ধারণ করিলাম। ভালমন্দ আমি কিছুই জানি না—ঠাকুর যাহা লিখাইবেন তাহাই লিখিব। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি ইহা দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ পান এবং উপকৃত হন তবেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইবে।

আমার এমন সুদিন কবে হবে, যেদিন করুণাসিন্ধু হরনাথের করুণায় মনে প্রাণে বুঝিতে পারিব যে, আমি এ জগতের কেহ নই, এ জগতের কাহারও নহি। ঠাকুর হরনাথই আমার নিত্য প্রভু এবং আমার প্রভুর প্রভু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার নিজ জন সকলেই আমার প্রভু এবং একমাত্র পরমাত্মীয়। আর, শ্রীহরনাথের সুখের জন্যই আমার কৃষ্ণ সেবা ও বৈষ্ণব সেবা এবং তাহার সম্বন্ধেই আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজ জনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আমি পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিনিতাম না, ঠাকুর হরনাথই তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরোনার্হতি যাতনাম্ ॥"
"জাতি কুল সদাচার ভ্রষ্ট পাপীজন।
ভক্তাশ্রয়ে শুদ্ধ তার দেহ মন।"

দয়াময় ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন, পত্রাবলীতেও বহুবার উল্লেখ আছে "তোমরা আমার, আমি তোমাদের" আবার বলিয়াছেন :—

"জনমে জনমে যেন আমি তোমাদের হই আর তোমরা আমার হও, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা"। (পঃ ৪।৪১)

"তোমরাই আমার দেহ, তোমরাই তাতে প্রাণ, এই জন্য তোমরা সুখে থাকিলেই আমি আনন্দে না থাকিয়া পারি না। তোমাদের সামান্য কষ্টে আমি এত কাতর হই যে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি কৃষ্ণ তোমাদিগকে সদা আনন্দেই রাখুন ইহাই তাঁর নিকট বিনীত প্রার্থনা।" (পঃ ৩।২২)

যাঁহারা এই পুস্তকের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, দয়াল ঠাকুর আমার মত সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিবেষ্টিত ও পাকা পুলিশের লোককে কিরূপে আকৃষ্ট করতঃ তাঁহার পদতলে টানিয়া নিয়া আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পরম দুর্দ্দৈব, তাই এরূপ কোটী চন্দ্র সুশীতল চরণ কমলে আশ্রয় পাইয়াও ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার অবস্থা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে,—

"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব কূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥"

যখন আমার অন্তিমকালে আমার তথাকথিত আত্মীয়গণ আমার এ দেহটীকে শ্মশানে নিয়া যাইবেন, যাহাকে আমি এখন প্রাণাধিক প

বলিয়া মনে করিতেছি—তিনিই যখন সর্ব্বপ্রথমে আমার মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবেন এবং সকলে মিলিয়া বংশখণ্ড দ্বারা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া আমার এই দেহটীকে পোড়াইয়া, আমাকে একাকী শ্মশানে ফেলিয়া চলিয়া আসিবেন, তখন তো আমার বড়ই ভয় করিবে। ঠাকুর! তখন তুমি দয়া করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইও। তোমার রাঙ্গা পা দু'খানি দর্শন করিতে পারিলে, আর আমার কোন ভয়ই থাকিবে না। তারপর—তারপর, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে আমাকে নিয়া যাইও—ইহাই তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা।

শাস্ত্রে ও সাধু বাক্যে বারংবার শ্রবণ করা সত্ত্বেও মনেপ্রাণে বুঝিয়া লইতে পারিতেছি না যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল জড়দেহ এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ তিনটী সূক্ষ্ম জড়দেহ হচ্ছে আমার উপাধি এবং আমি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; আমি চেতন, স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস এবং আমার একমাত্র কর্ত্তব্য কৃষ্ণের নিত্য সেবা করা। কিন্তু আমার সে স্মৃতি নাই। তাই কখনও নিজেকে দেহ কখনও মন ভাবিয়া পাগল হইয়া তথা-কথিত সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছি এবং আমার দেহ মনে অথবা তাহার সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুতেই প্রীতি দেখাইতেছি। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তার স্বরে গাহিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ দ্বারাই চিত্তের ক্লেশ ও মনের ময়লা দূরীভূত হয়।

আবার দেবহূতি নিজ পুত্র কপিলদেবের নিকট নিজ শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে কপিলদেব বলিয়াছিলেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণা দাশ্বপবর্গবর্ত্মনি—
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২২)

অর্থাৎ সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য সূচক হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা প্রীতির সহিত সেবা অর্থাৎ শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ স্বরূপ আমাতে প্রথম শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম ভক্তি উদিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অযাচিত কৃপায় তাঁহার সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য আমার যথেষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু "প্রণিপাত" "পরিপ্রশ্ন" ও "সেবাবৃত্তি" অভাবে প্রকৃষ্ট সঙ্গ না হওয়ার জন্যই আমার এই দুরবস্থা। সর্ব্বতোভাবে সাধুর ইচ্ছাধীন হইয়া চলাই প্রকৃত "প্রণিপাত"। তাঁহার নিকট শ্রুত কথার যাহা বুঝিতে পারা যায় না তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করার নামই "পরিপ্রশ্ন"। আর তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধনই তাঁহার "সেবা"। আমার কপাল মন্দ; তাই ইহার কিছুই আমার হয় নাই। ঠাকুরের কৃপার কথা আর কি বলিব? শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহার মর্ম্ম গৌড়ীয় মঠের শিষ্য জার্ম্মান প্রোফেসার Mr. E. G. Schalze গয়া বক্তৃতায় এক কথায় এই বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "It is the religion of love and devotion. There ought to be no bargaining with God. Devotion for the sake of devotion must be aimed at." (অর্থাৎ—এ ধর্ম্ম প্রেম ভক্তির। বিশুদ্ধ ভক্তিই ইহার উদ্দেশ্য। ভগবানের সহিত ব্যবসাদারী করিতে যাওয়া ঠিক নহে।)

আমাদের দয়ার ঠাকুর সেই বিশুদ্ধ প্রেম ধর্ম্ম নিজের জীবনে আচরণ করতঃ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়ার জন্য দয়াল ঠাকুর আমার বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে শ্রীপ্রহ্লাদচরিত, শ্রীরামচরিত, শ্রীকৃষ্ণচরিতের বিভিন্নাংশ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার প্রসাদে যে উপদেশ মালা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি আমাদের পরম মঙ্গলের

জন্য সেই উপদেশ মালা সেবোন্মুখ চিত্তে নিরন্তর কীর্ত্তন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। স্থানাভাবে ও সময়াভাবে ঐ অমূল্য উপদেশাবলী এই গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে লিপি করার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়া উঠে নাই। (৩য় খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠা)। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমেই ভক্ত পাঠকবর্গের সঙ্গে তাহা আস্বাদন করার লোভ হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া অনর্গল বলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তখন তাহা যথাযথ ভাবে নোট করিয়া রাখা আমার মত লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছিল। তবে সেই সময় হইতে ঐ লীলা সমূহ ধারাবাহিক ক্রমে দৈনন্দিন স্মরণ পথে আনিতে চেষ্টা করিতেছি এবং তাহারই সাহায্যে আজ রসজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। যদি কোন স্থানে কোনরূপ পরিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে (নিশ্চয়ই হইয়াছে) তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ভগবদ্দর্শনের জন্য অস্থির হইয়া পরব্যোম বৈকুণ্ঠাভিমুখে রওনা হইয়া যান। যোগমায়া বলে তাঁহারা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক, তৎপর বিরজা নদী এবং তৎপর ব্রহ্মলোক পার হইয়া বৈকুণ্ঠ ধামে পৌছেন এবং ক্রমান্বয়ে ছয়টি কক্ষ অতিক্রম করতঃ সপ্তম কক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহারা বয়সে বৃদ্ধ হইলেও দেখিতে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া কোন বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না, সর্ব্বত্রই নির্ভয় মনে ভ্রমণ করিতেন এবং কোথাও কেহ নিষেধ করিত না। কিন্তু সপ্তম কক্ষের দ্বার পাল জয়-বিজয় তাঁহাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া উপহাস পূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করতঃ ভগবানের সভায় যাইতে বাধা প্রদান করিলেন। মুনিগণ তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন—

"কি !! শ্রীভগবৎ পার্ষদ হইয়াও তোদের ভেদজ্ঞান দূর হয় নি ? তোরা এখানে থাকার যোগ্য নহিস্। তোরা শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করতঃ দৈত্য-কুলে অসুর ভাবে জন্মগ্রহণ কর।" তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মশাপ যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া

তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিগণের চরণে নিপতিত হইল। সকলেই শ্রীভগবানের চক্রান্ত, নতুবা বৈকুণ্ঠ পার্ষদের এইরূপ ভাব হওয়া এবং নিত্যকাল ভগবানের উপাসনাপরায়ণ পরম শান্ত মুনিগণের এইরূপ ভাবে ক্রুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তুল্যবলশালী পার্ষদ জয় বিজয়কে অবতরণ করাইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতঃ যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবেন; তাই এই লীলা।

সে যাহা হউক, ভগবান ঐ সময়েই জানিতে পারিলেন যে তাঁহার দুইজন ভৃত্য সাধুসন্নিধানে অপরাধী হইয়াছে; তাই তিনি মুনিগণের ক্রোধ শান্তির জন্য লক্ষ্মী দেবীর সহিত তথায় উপনীত হইলেন। মুনিগণ আপনাদের সমাধিলভ্য ফল স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ হইতে দেখিয়া অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন এবং মস্তক অবনত করতঃ নমস্কার করিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন, তৎপর তাঁহারা বৈকুণ্ঠের পার্ষদ জয় বিজয়কে অভিশাপ দিয়াছেন বলিয়া করজোড়ে আপনাদের দৈন্য জানাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান বলিলেন "ইহারা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করিয়াছে; এ বিষয়ে যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কোন অপরাধ নাই তথাপি আমার ভৃত্যেরা যে দোষ করিয়াছে তাহা আমারই করা হইয়াছে, তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি, অপরাধ লইও না। তোমরা আমার ভক্ত; এই দুই ব্যক্তির প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছ তাহা ঠিকই করিয়াছ এবং তাহা তাহাদের ভোগ করিতেই হইবে।"

এইজন্যই ঠাকুর তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্রকে লিখিয়াছিলেন,—

"তাই বলি বাবা, যাবার সময় আমি যেন good return······নিয়ে যেতে পারি। তোমরাই আমার এক একটী জীবন্ত রিপোর্ট; তাই চাই তোমরা পরম পবিত্র হয়ে থাক···বাবা। তোমরা আমার এক একটী অঙ্গ, সাবধানে থাকিও, তা' হ'লেই আমার উপর প্রভুর দয়া বেশী হবে আমিও উন্নত

প্রীতি-উপহার

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীহরনাথ-কৃপায় এবং ভক্তজনের আশীর্ব্বাদে "অভিজ্ঞতা" চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় এই চতুর্থ খণ্ডও সকলের নিকট সমাদৃত হইবে। এই গ্রন্থ যে কত জনকে কতভাবে আনন্দ ও উপকার দিতেছে তাহা যতই দিন যাইতেছে ততই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

এবারের লেখা, আদিতে মধুর রসে ভিয়ান করা। পড়িতে পড়িতে আমাদেরই হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়, চক্ষুতে জল আসে। যাঁহারা মধুর ভাবের অধিকারী,—না জানি তাঁহাদের আরও কতই ভাবাবেশ হইবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণের নিকট যখন রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন তখন আমাদের মনে হইত যেন কোন প্রতক্ষ্যদর্শীর মুখে সেই সকল বিবরণ শ্রবণ করিতেছি। ভক্তপ্রবর রায় সাহেবের এবারের লেখায় সেই সমস্ত বিবরণ যখন পাঠ করিলাম, মনে হইল আবার যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি ও উপদেশ এইরূপে ভক্ত হৃদয়ে সদা পরিস্ফুট রাখিয়া লেখক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। পুলিসের কর্ণধার স্বরূপ তিনি একদিকে যেমন দুষ্কৃতিগণের দমন করিতেছেন অপর দিকে আবার তেমনই মহাবৈষ্ণব ও মহাভক্তরূপে সজ্জনের রসপুষ্টি করিয়া ও বহু লোককে নাম লওয়াইয়া তাঁহাদের ভজন পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। সত্যই, লেখক শ্রীহরনাথের একটী living report,—সজীব বিবরণ! তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

রায় সাহেব লিখিতে বসিলে আর এ জগতের থাকেন না। কোন্ এক ভাবজগতে প্রবেশ করিয়া অনর্গল লিখিয়া যান; তাঁহাকে সংযত না করিলে

যথা সময়ে পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই তাঁহার ভাব নষ্ট করিয়া তাঁহাকে বক্তব্য শেষ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

আদিতে যে রসই অনুভূত হউক না কেন, এবারের গ্রন্থখানি বিয়োগান্তক। এবারের বক্তব্য (শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাব) একটী supreme tragedy ! জানি না কি কারণে কি হইল, শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সহসা মন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিলাম ভক্তগণের কাতর অনুরোধে তিনি আরও কিছুকাল এ দেহে থাকিবেন ; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না !

এবারের "অভিজ্ঞতায়" শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকট লীলার সমাপ্তি হইল। ভক্তগণ পরে আর তাঁহার অঙ্গসেবার সুযোগ ও আনন্দ পান নাই। বিশিষ্ট ভক্তগণও এখন একে একে তাঁহাদের নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইতেছেন। সুতরাং এবারের পুস্তকে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটী প্রচ্ছন্ন বিষাদের স্বর মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিয়াছে ; ইহা বিচিত্র নহে। রায় সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন, "ইহার পর আর কলম চলে কি ?" ইহাই "অভিজ্ঞতা"র শেষ সংখ্যা। তবে রায় সাহেবের ভাণ্ডারে এখনও অনেক রত্ন আছে এবং সে রত্নরাজি পাইবার প্রার্থীও অনেক আছে। শ্রীহরনাথ কৃপা করিলে সে ভাণ্ডার আবার উন্মুক্ত হইবে এবং আমাদের মধ্যে বিতরিত হইবে। রায় সাহেব লিখিয়াছেন তাঁহার মনে হয় না তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন। এ কথা বড়ই মর্ম্মান্তিক ! আমাদের বিশ্বাস, এ জগতে এখনও তাঁহার অনেক মহৎ মহৎ কর্ম্ম বাকী আছে। তাঁহার এখন যাওয়া হইতেই পারে না।

এবারেও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করায় ইহা প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণ করা সম্ভব হইল।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের শত কার্য্য সত্ত্বেও এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সযত্নে শেষ করিয়া যথাসময়ে ইহাকে প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল তাহার জন্য গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীহরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা
১৫, চূণাপুকুর লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।
১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৪।

বিনয়াবনত—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত।
সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ।

এই পুস্তক মধ্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির অর্থ

১।	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত	চৈঃ চঃ
২।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত	চৈঃ ভাঃ
৩।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	চৈঃ মঃ
৪।	ভক্তি রত্নাকর	ভঃ রঃ
৫।	শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের গ্রন্থাবলী	নঃ ঠাঃ
৬।	শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের পত্রাবলী	পঃ
৭।	শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিরত্নসার	বৃঃ ভঃ সাঃ
৮।	শ্রীশ্রীভাগবত	ভাঃ
৯।	ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা	অঃ
১০।	সাধক কণ্ঠহার	সাঃ কঃ

ভূমিকা

সবই দয়াময় ঠাকুরের ইচ্ছা। তৃতীয় খণ্ড লিখিয়া ভাবিতেও পারি নাই যে আবার চতুর্থ খণ্ড লিখিতে সময় ও সুযোগ পাইব। তাঁর ইচ্ছায়ই এই খণ্ডও লিখা হইল। সরকারী কাজ করিয়া সময় সুযোগ পাই না, তদুপরি আমার বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হওয়ায় ও অন্যান্য বিপর্য্যয় অবস্থার মধ্যে যে ভাবে এই খণ্ড লিখিতে হইয়াছে তাহাতে পুস্তকের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল ক্রটী বিচ্যুতির জন্য লেখককে ক্ষমা করিবেন।

"চৈতন্য—(এ স্থানে হরনাথ) কথার আদি অন্ত নাহি জানি,
যে যে মতে চৈতন্যের (এ স্থানে হরনাথ) যশ যে বাখানি॥
চৈতন্য (এ স্থানে হরনাথ) দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নাহুক আমার॥" (চৈঃ ভাঃ)

এই ভাবে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াও যদি কেহ লীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ কিছু আনন্দ লাভ করেন, কি অণুমাত্র উপকৃত হ'ন তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইলেও ঠাকুরের কৃপায়ই ঠাকুরের লীলা কীর্ত্তন করিতেছি, তাই আমার পূর্ব্ব লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকেই আনন্দ লাভ করতঃ আমাকে পত্র দ্বারা উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহাতে আমার যে কোন কৃতিত্ব নাই, কেবল মাত্র তাঁহার লীলা তিনিই আমার মত নগণ্য ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন তাহা নিজেও বেশ বুঝি এবং পাঠকবর্গও নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন। ধন্য ঠাকুর তোমার লীলা!! সেই আনন্দ-জ্ঞাপক লিপির কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। ঠাকুরকে কোন দিন দেখেন নাই এবং ঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না এমন

ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে আমাকে উৎসাহ-লিপি দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন, যথা—

(১) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নায়েব দেওয়ান মণিপুরী সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঠাকুর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন "* * * উহা (তৃতীয় খণ্ড) পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ও পরম উপকৃত হইয়াছি। ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের যোগ্যই বটে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহারা ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত আপনার এই অভিজ্ঞতা গ্রন্থরাজি পাঠ করিবেন তাঁহারা বিমল আনন্দ লাভ করিবেন এবং তৎসঙ্গে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। * * * এরূপ গ্রন্থরাজির বহুল প্রচার সমাজের কল্যাণকর বলিয়া মনে করি।"

(২) আমার বৈবাহিক বগুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাসগুপ্ত, তিনিও ঠাকুরের ভক্ত নহেন এবং কোন দিন ঠাকুরকে দেখেন নাই, তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা যেরূপ সরল ভাবে আপনি প্রচার করিয়াছেন এইরূপভাবে অন্যান্য মহাপুরুষদের বিষয় যদি সাধারণের মধ্যে প্রচার হয় তাহা হইলে দেশের বড়ই উপকার হইবে। সংসারের নানারূপ দুঃখ কষ্ট ও অশান্তিতে যখন মন একেবারে দমিয়া যায় তখন এই সব বই-ই একমাত্র শান্তি দিতে পারে। * * * যতই বেশী পড়া যায় ততই যেন পড়িতে ইচ্ছা হয়।"

(৩) আমি ১৯১৮ সাল হইতে পেন্সন প্রাপ্ত ইনস্পেক্টার শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত পরিচিত। তদবধি দীর্ঘকাল উভয়ে একত্র C. I. D. তে ইনস্পেক্টার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছি। সুতরাং তিনি আমার ঠাকুরের কৃপা পাওয়ার পূর্ব্বের অবস্থাও অবগত আছেন। তিনি তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"প্রিয় ভ্রাতঃ, * * * ঠাকুরের কৃপায় তোমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এবং অসীম ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।

মনে হয় এ যেন সম্পূর্ণ নূতন এক অক্ষয়কুমার—আমাদের সেই সহকর্ম্মী পুরাতন অক্ষয় কুমারের পক্ষে মহা দায়িত্বপূর্ণ একটী রাজ্যের পুলিশের কার্য্য-ভার শৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া এবং তাঁহার আরাধ্য দেব সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি বৎসর ভক্ত ও শিষ্যগণের নিকট পুস্তকাকারে স্থাপন করা সম্ভবপর হইত না। মহাপুরুষের কৃপায় সকলই সম্ভব হইয়াছে। অটল অচল ভক্তি এই জীবনেই তোমাকে মুক্তি দিয়াছে।”

(৪) আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রগণ সকলেরই ঠাকুরের উপর বেশ ভক্তি আছে। আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান শিশির কুমার গুপ্তের ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী তাঁহার পিত্রালয়ে খুবই অসুস্থ অবস্থায় তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট লিখিয়াছেন—“মা, এবার আমাদের ঠাকুরের বই খানা লিখা খুবই ভাল হইয়াছে। মাগো, আমাদের ঠাকুরের এমনই দয়া যে, ভাল না হইয়াই পারে না। * * * কোন চিন্তা করিবেন না এখন ঠাকুরই একমাত্র ভরসা।”

(৫) আমার ১০।১১ বৎসর বয়স্ক পৌত্র শ্রীমান্ গোরাচান্দ কলিকাতা হইতে আমার স্ত্রীকে লিখিয়াছে—“আমার কোন পড়া হইতেছে না, ভগবানকে জানাইও, আমি একটী বড় মানুষ হই আর সকলে আমাকে ভালবাসে।” (শ্রীমানের বিশ্বাস যে আমাদের ঠাকুরই ভগবান)।

দশ বৎসর হইল ঠাকুর অপ্রকট লীলা অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বহু লোক তাঁহার মহিমায় তাঁহার ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন।

আমার সহিত আজ পর্য্যন্ত কোন দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই এইরূপ ঢাকা জিলার বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারের জনৈক প্রবীণ ভদ্রলোক, “আমার অভিজ্ঞতা” কয়েক খণ্ড পড়িয়া আমাকে লিখিয়াছেন যে তিনি ঠাকুরের অপ্রকট লীলার অল্প কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করেন এবং পত্রে ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণে ঠাকুর দর্শনে যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ঠাকুর অপ্রকট হওয়ায় সাক্ষাতের

সুযোগ পান নাই। শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত এবং তুলসীর মালায় আস্থাহীন হওয়া সত্ত্বেও এখন তিনি ঠাকুরের অনুরক্ত হইয়া কি নাম করিবেন, কি ভাবে মালা জপ করিবেন, তাঁহার এখন কি কর্ত্তব্য এবং কি ভাবে অগ্রসর হইবেন ইত্যাদি বিষয়ে, কি জানি কি বুঝিয়া, হঠাৎ আমার পরামর্শ চাহিয়া আমাকে এক পত্র লিখিয়া বসিলেন। ঠাকুরই তাঁহাকে ইহা লিখাইয়াছেন মনে করিয়া ঠাকুরের কৃপা প্রার্থী হইয়া ও ঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি আমাকে দিয়া যাহা লিখাইয়া ছেন, উত্তরে তাহাই তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। ঠাকুরের কি মহিমা! তিনি তদুত্তরে আমার নিকট এক ছড়া মালা এবং জপের প্রণালী জানার জন্য লিখিলেন। তদনুসারে ঠাকুরের নাম স্মরণ করতঃ একছড়া মালা এবং জপের প্রণালী তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীশ্রীহরনাথ পদ ভরসা"

আজ আমার পুনর্জন্ম হইল। বৈদ্য জাতির দ্বিজন্ম, আমার আজ পরম-বৈষ্ণব স্পর্শিত শোধিত পূর্ণ ব্রহ্ম নাম সহ তুলসীর মালা পাইয়া তৃতীয় জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, এখন আপনার আশীর্ব্বাদে এ জন্ম সফল হইবে কিনা জানি না। গুরুকৃপা শিষ্যের উপর যে কত অসীম তাহার পার কুল নাই। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের অপার করুণার কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী হইয়া গৌড় দেশ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলের পথে চলিলেন তখন প্রভু কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর, কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সেই মুখে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেই স্থানে আসিয়া প্রভু যেন একটু চৈতন্য পাইলেন ও রজকের নিকট গমন করিতে লাগিলেন, সেখানে যাইয়া বলিতেছেন 'ওহে রজক একবার হরি বল'। রজক ভাবিল ভিক্ষা চায়, সেই জন্য বলিল 'ঠাকুর আমি অতি গরীব আমি কিছু দিতে পারিব না'। প্রভু বলিলেন 'রজক তোমাকে কিছু দিতে হবে না, তুমি একবার হরি বল'।

রজক। 'আমি কাপড় কাচিব না হরি বলিব'? প্রভু। 'তোমার কাপড় আমায় দেও আমি কাচিতেছি—তবুও তুমি একবার হরি বল'।

রজক তখন বিস্মিত হইয়া বলিল 'তোমাকে কাপড় কাচিতে হইবে না তুমি শীঘ্র বল আমাকে কি বলিতে হইবে'। প্রভু বলিলেন বল হরি বল তখন রজক হরি বোল বলিতে বলিতে একেবারে জ্ঞান হারা হইয়া পড়িল, প্রভু যে চলিয়া গিয়াছেন তাহার আর সে জ্ঞান নাই, সে তখন বাহ্য দৃষ্টি হারা হইয়া হৃদয়ে গৌর রূপ দেখিতেছে। আমারও সেই রজকের অবস্থা, কিছুতেই নামে তত বিশ্বাস ছিল না, আপনার উপদেশপূর্ণ পত্রাবলীতে নামের মহিমা অনুভব করিতে পারিয়াছি। আরও কৃপা করিয়া আপনি নাম করার সাজ সজ্জা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন এখন সেই সজ্জা মনোহর পুষ্প শয্যা করিতে পারিব কিনা জানি না। আপনাদের অপার কৃপা না থাকিলে কি পাতকী উদ্ধার হইত! মালার বাক্সটী খোলা মাত্রই আপনার কৃপা দেখিয়া চক্ষু হইতে কেন যেন ২।১ ফোটা অশ্রু বিন্দু পতিত হইল। প্রেমাশ্রু কথাটী শুনিয়াছি কিন্তু উপলব্ধি করি নাই আজ কতকটা উপলব্ধি হইল। এখন আপনার আদেশানুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টায় রহিলাম, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন আমার জনম যেন সফল করিতে পারি। আপনার পূর্ব্বের পত্র খানার নকল পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্রখানা আমি কয়েকজন ভক্ত লোকদিগকে পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তাঁহারা ঐ পত্র পড়িয়া এতই উন্মত্ত হইয়াছেন যে প্রত্যেকেই ঐ পত্র খানার নকল রাখিতেছেন, তাঁহাদের নকলের কার্য্য শেষ হইলে আমি নকল করিয়া আপনাকে পাঠাইব। আপনাদের শ্রীচরণ কুশলসহ পত্রোত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। আমি যেন সময় সময় আপনার উপদেশ পূর্ণ পত্র হইতে বঞ্চিত না হই। তৎপর আবার লিখিয়াছেন—

আপনার আজ্ঞা পালন করিতে গৌণ হইয়া গেল। পত্রখানা নকল করিয়া পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু পত্রখানা একটু বৃহৎ আকারের

এবং নানা উপদেশপূর্ণ। নিজ হাতে নকল করিতেই আদেশ ছিল, তাহাই করিলাম। নকলে ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। মালার গুরু আপনি। মালা জপের গুরু আপনি, মালা জপের প্রণালীও যেরূপ আদেশ দিয়াছেন তাহা আমি করিতে পারি নাই, কারণ আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী দুই জনই এক সঙ্গেই মারা গিয়াছেন তজ্জন্য অশুচি ইত্যাদি পালন করাতে ও মনের অশান্তি থাকায় কোন কাজই এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে করিতে পারি নাই। আশা করি বৎসরের প্রথম হইতে আপনার আদেশ পালন ও আমার উপর আপনার কৃপা ও দয়া থাকিলে জপের যে প্রণালী দিয়াছেন তাহা করিতে আরম্ভ করিব। জানি না ভগবান কি করেন; সকলই তাঁহার হাত!

* * * *

পত্রখানা অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

* * * *

নিষ্ঠাভাবে সময় স্থির করিয়া মালার জপের সংখ্যা পূর্ণ করা উচিত কিনা? এখানে দেখি বৈষ্ণবগণ সমস্ত সময়ই মালা হাতে ধারণ করিয়া জপ করিতেছেন। শুচি অশুচির দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন না। এবং নানারূপ কথাও বলেন জপ সমাপনও করেন—এই বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনীয়।

ভজন সম্বন্ধে আপনার কোন একটী স্থান আমার বোধগম্য হয় নাই। তাহাই নিম্নে লিখিতেছি। ভজন বিষয়ে আপনার পত্রে ও ভাগবত-শাস্ত্রে একই মত—'শ্রীবৃন্দাবনবিহারী যুগল কিশোর শ্রীরাধাগোবিন্দই একমাত্র আরাধ্য।' 'আর শ্রীব্রজকিশোরীগণের প্রতিষ্ঠিত মধুর রসাশ্রয়ে ভজন ব্যতীত ঐ যুগলের আরাধনা অন্যরূপ হইতে পারে না।' 'মধুর রসাশ্রয়ে ভজন ব্যতীত, কথাটীর তাৎপর্য্য মনে মনে বহু গবেষণা করিয়াও ইহার গভীর মাধুর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। তাই নিবেদন 'মধুর রসাশ্রয়ে ভজন' বিষয়টীর বিশেষরূপ

হবো। আর আমি যতই উন্নত হবো তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই হবে।" (পঃ ৪।১৬৭)

আবার ঠাকুর তাঁহার শেষ উপদেশ বাণীতে—যাহা তাঁহার অপ্রকটের পর গত ১৯২৭ সনের মেদিনীপুর জন্মোৎসবে প্রকাশিত হইয়াছিল,—আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—

"হে আমার আপন জন সকল, তোমরা প্রত্যেকেই আমার সম্বন্ধে যেন এক একটী সজীব বিবরণ;—তোমাদের জীবনেই আমি জীবিত—তোমাদের আচরণেই লোকে বুঝিবে আমি কেমন, সেইজন্য আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র জীবন যাপন করো।"

মুনিগণ চলিয়া গেলে ভগবান জয় বিজয়কে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "আমি ভক্ত-মুখবাণী ব্যর্থ করিতে পারি না, সেরূপ বাসনাও আমার হইতে পারে না। তোমরা যাও আমাকে শত্রুভাবে ভজন করিলে ক্রোধের আবেশে অতি শীঘ্রই (মুনিগণ কৃপা করিয়া যে বলিয়াছেন, সেই তিন জন্ম পরেই) আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

তাই দ্বারপালদ্বয় বৈকুণ্ঠ হইতে পতিত হইয়া প্রথম জন্মে দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে 'হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ' রূপে, দ্বিতীয় জন্মে নিকষার গর্ভে ও বিশ্বশ্রবাঃ মুনির ঔরসে 'রাবণ ও কুম্ভকর্ণ' রূপে এবং তৃতীয় জন্মে 'শিশুপাল ও দন্তবক্র' রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রতিজন্মেই ভগবানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রথম দুই জন্মে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবে ও শ্রীশ্রীরামচন্দ্রে বিষ্ণু বুদ্ধি স্থাপন করিতে না পারার দরুণ মুক্তি না পাইয়া তৃতীয় জন্মে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়াই শাপ-মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপু—হিরণ্যাক্ষ—
ধ্রুবচরিত্র ও
শ্রীশ্রীনৃসিংহ লীলা ॥

হিরণ্যাক্ষের অত্যাচারে দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠায় শ্রীভগবান বরাহ মূর্ত্তিতে তাহাকে বধ করেন। তাহাতে হিরণ্যকশিপুর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি মন্ত্রী ও অনুচরগণকে ডাকিয়া বিষ্ণুর দ্রোহ আচরণের উপায় স্থির করতঃ সনাতন ধর্ম্মেই বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দেশে যাহাতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না হইতে পারে তজ্জন্য চারিদিকে অনুচর পাঠাইলেন এবং তাহারা তদনুযায়ী প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে যজ্ঞভাগের অভাবে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করতঃ অলক্ষিতভাবে ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধুর গর্ভে তখন হিরণ্যকশিপু তপস্যা দ্বারা অজয়, অমর এবং অদ্বিতীয় অধিপতি হইবার বাসনায় রাজধানী হইতে রওয়ানা হইয়া যান। এই অবসরে দেবতাগণ দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এবং কয়াধুর গর্ভের সন্তানও নিশ্চয়ই বিষ্ণুবিরোধী—সুতরাং ঐ সন্তান প্রসব হওয়া মাত্র হত্যা করিবেন সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্র কয়াধুকে লইয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন। দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছা ক্রমে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গর্ভস্থ শিশু মহাভাগবত এবং তাহাকে বধ করা অসম্ভব বলিয়া ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিয়া কয়াধুকে ইন্দ্রের হস্ত হইতে উদ্ধার করতঃ যতদিন তাহার স্বামী ফিরিয়া না আসিবেন ততদিন পর্য্যন্ত কয়াধু নির্ভয়চিত্তে তাঁহার আশ্রমে থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে নিজের আশ্রমেই রাখিয়া দেন। কয়াধু স্বীয় গর্ভের মঙ্গলার্থ দেবর্ষির নিকট হইতে ইচ্ছা প্রসব (স্বামীর আগমনান্তর প্রসব) বর চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে প্রাণপণে সেবা করতঃ তাহার নিকট হইতে শ্রীভগবৎ তত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতে হৃষ্টচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি

প্রহ্লাদ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করতঃ দেবর্ষির কৃপায়, আজীবন স্মরণে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া মন্দার পর্ব্বতে যাইয়া এরূপ কঠোরভাবে তপস্যা আরম্ভ করেন যে, দেবগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। দেবগণের ভয়ের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে শান্ত করার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন "তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ, আমি বর দিতে আসিয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" হিরণ্যকশিপু তাহার নিজের বুদ্ধি অনুসারে যে যে বর পাইলে পরোক্ষে অমর হইতে পারেন সেইরূপ বর চাহিয়া লইলেন—অর্থাৎ দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কিম্বা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী তাহাকে বধ করিতে না পারে; দিনে বা রাত্রিতে অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা তাহার মৃত্যু না হয়; জলে কিম্বা স্থলে কিম্বা আকাশে যেন তাহাকে কেহ বধ করিতে না পারে, ইত্যাদি। হিরণ্যকশিপু তাহার প্রার্থিত সমস্ত বরই প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে তবে আর ভয় কি? পরোক্ষে অমর বরই তো পাইয়া গেলাম। তিনি আনন্দচিত্তে ব্রহ্মাকে প্রণাম করতঃ স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া কয়াধুকে দেবর্ষি নারদের আশ্রম হইতে লইয়া আসেন। কিছুকাল পরেই কয়াধুর গর্ভ হইতে প্রহ্লাদ মহারাজ আবির্ভাব লীলা প্রকট করেন। পিতামাতার আনন্দের আর সীমা নাই। কতকদিন পরে ফেরিওয়ালা যুগল মূর্ত্তি বিক্রয় করার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় প্রহ্লাদ উহা কিনিয়া দিবার জন্য মাকে জেদ করিয়া ধরেন এবং তাহার পিতা কিছুতেই টের না পান এমন ভাবে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় ভক্তিমতী মাতা তাহাকে ঐ মূর্ত্তি খরিদ করিয়া দিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় পরমানন্দ উপভোগ করতঃ সর্ব্বদা ভাবে বিভাবিত হইয়া দিনাতিপাত করিতে থাকিলেন।

শৈশবেই ক্রীড়া পরিত্যাগ করতঃ কখনও ভগবানকে দেখিয়া উৎকণ্ঠাবশে শব্দ করিতেন, কখনও বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কখনও ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। জাগতিক কোন ভোগ্য বিষয়েই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অপর দিকে, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐরূপ বর পাইয়া ভগবান, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন যে, দেবগণকে অবশেষে বাধ্য হইয়া অচ্যুতের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান দৈববাণী দ্বারা তাহাদিগকে জানাইলেন যে হিরণ্যকশিপু যখন তাহার পুত্র পরম ভাগবত প্রহ্লাদের উপর বিদ্বেষাচরণ করিতে আরম্ভ করিবে তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে তিনি সব সহ্য করিতে পারেন কিন্তু ভক্ত বিদ্বেষ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না।

প্রহ্লাদ মহারাজের বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে হিরণ্যকশিপু, শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্কের হস্তে প্রহ্লাদকে সমর্পণ করতঃ সাবধানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং হৃদয়ে যাহাতে কোন রকমেই বিষ্ণুভক্তি স্থান পাইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? মাতৃগর্ভে থাকিতেই দেবর্ষি নারদের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শৈশবেই ভগবানের সেবানন্দে বিভোর থাকিয়া প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন। তিনি দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ যথারীতি শ্রবণ ও অভ্যাস করিলেন বটে, কিন্তু ষণ্ডামর্কের বহু তর্জ্জন গর্জ্জন এবং বহুপ্রকার শাসনসত্ত্বেও সর্ব্বদাই তাহার বিষ্ণুস্তবেই রতি এবং ঐ রতি ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন ষণ্ডামর্ক দুই ভাই নিজ কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, প্রহ্লাদের সংসর্গ প্রভাবে তাঁহার সমপাঠী সমস্ত ছাত্রদের বুদ্ধি প্রহ্লাদের মত বিষ্ণুনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীলনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভাগবত ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রহ্লাদ

সমস্ত ছাত্রগণকে নিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে ভগবান বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন কি যণ্ডামর্কের স্ত্রীদ্বয়ও তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। তখন যণ্ডামর্ক নিরুপায় হইয়া হিরণ্যকশিপুর নিকট সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একবার হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নে প্রহ্লাদ উত্তর দিয়াছিলেন যে 'আমি' 'আমার' এই মিথ্যা অভিনিবেশই মানবের আত্মার অধোগতির প্রধান কারণ। সুতরাং শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। কুশিক্ষার জন্য পুত্রের এই অবস্থা হইয়াছে মনে করিয়া যাহাতে বিষ্ণুভক্তি আদৌ বালকের হৃদয়ে স্থান না পাইতে পারে তজ্জন্য আরও সাবধানতার সহিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আবার গুরু-গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবার গুরুগৃহে কি শিক্ষা করিয়াছেন পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রথমে বলিলেন 'যাহা শিক্ষা করিবার তাহাই শিক্ষা করিয়াছেন' তারপর বলিলেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই নববিধা কি ইহার যে কোন প্রকারের ভক্তি শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে পারিলেই অধ্যয়নের পূর্ণ সার্থকতা হয়। হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে তাঁহার আদেশে তাঁহার রাজ্যে কেহ বিষ্ণুর নামটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সাহস করে না; কিন্তু নিজের পুত্রকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ ভৈরব নিনাদে শূল দ্বারা প্রহ্লাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু "কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত", প্রহ্লাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই তিনি শ্রীভগবানের নামে এবং রূপধ্যানে ডুবিয়া আছেন। কাজেই সমস্ত প্রহার নিস্ফল হইয়া গেল। মত্ত হস্তী দ্বারা পদদলিত করাইয়া মারার জন্য প্রহ্লাদকে মত্ত হস্তীর নিকট প্রেরণ করা হইল। প্রহ্লাদ দূর হইতে দেখিলেন যে তাহার

"হরি" মত্ত হস্তীর মধ্যে বসিয়া তাহাকে অভয় দিতেছেন। হিরণ্যকশিপু দেখিয়া অবাক হইলেন যে, যে মত্তহস্তী যাহাকে পায় তাহাকেই বিনাশ করে কিন্তু পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাহার নিকট পৌছিবা মাত্র তাহাকে পরম আদরে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করতঃ নিজের পৃষ্ঠের উপর বসাইয়া রাখিলেন। প্রহ্লাদকে কারাগারে আবদ্ধ করতঃ নানারূপ অত্যাচার করিয়া পরে হলাহল মিশ্রিত মিষ্টান্ন দ্বারা হত্যা করার অভিপ্রায়ে মাতা কয়াধু দ্বারা তাহা প্রহ্লাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল, যেন প্রহ্লাদের মনে কোন মতে কোনরূপ সন্দেহ না আসিতে পারে। পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, তাই নিবেদন করার কালে ঐ বিষান্ন "বিষ্ণু বস্তু" হইয়া যাওয়ার দরুণ সেই প্রসাদ গ্রহণ করায় প্রহ্লাদের কোনই অনিষ্ট হইতে পারিল না। প্রহ্লাদকে পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ, মায়া গর্ত্তে আবদ্ধ, অগ্নি জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ, শৈল শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ প্রভৃতি নানা উপায় দারা প্রহ্লাদের প্রাণ বধ করিতে চেষ্টা করা হইল। হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে তাহার সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি প্রহ্লাদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে যে কেবলই "ভগবান" "ভগবান" করিতেছে এবং বলিতেছে যে হিরণ্যকশিপু ছাড়া ও অন্য এক জন ঈশ্বর আছেন তবে তাহার সেই ভগবান কোথায় আছেন? তখন প্রহ্লাদ বলিলেন যে "অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্" তাঁহাকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না? হিরণ্যকশিপু বলিলেন, যে কই, তিনি তো দেখিতে পাইতেছেন না। প্রহ্লাদ বলিলেন "তুমি যে আমাকে বধ করার জন্য এত চেষ্টা করিলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেনা কেন? আমি কি আমার নিজের শক্তির বলে রক্ষা পাইতে পারিয়াছি? দেখ নাই কি যে বধ্যভূমিতে "হরি", মত্ত হস্তীর মধ্যে "হরি", কারাগারে "হরি", হলাহলের মধ্যে "হরি", অগ্নিতে "হরি", জলে "হরি", পর্ব্বতে "হরি" বিরাজ করিতেছেন।"

শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় ঃ—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥"

চতুঃশ্লোকীয় চতুর্থ শ্লোকের ভাবও ঠিক তাহাই। যথা ঃ—

"ভক্ত আমায় বাঁধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে।" (চৈ-চঃ)

আর, আমার ঠাকুরের সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় "যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান—তাঁহাকে ভালবাসুন। যেমন, কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জলে স্থলে কুকুরের শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।" (পঃ ১।১৯)

তাই, হিরণ্যকশিপু যখন বলিলেন—"যদি তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকেন তবে এই স্তম্ভে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? আমি এখনই তোর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব, তোর হরি আসিয়া তোকে রক্ষা করুক।" তখনই প্রহ্লাদ স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঐ যে আমার "হরি" দেখা যাইতেছেন।" হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে স্তম্ভের নিকট যাইয়া মুষ্টির আঘাত করিলেন। ভক্ত-মুখবাণী ব্যর্থ হওয়ার যো নাই—তাই আমার ভক্তবৎসল হরি তৎক্ষণাৎ শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ স্তম্ভের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং অবশেষে হিরণ্যকশিপুর দেহ নিজের জানুর উপর স্থাপন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা তাহার বক্ষ বিদারণ করতঃ তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভুবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ভয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি স্বয়ং কমলা দেবীও তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে শ্রীমৎ ভগদ্ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও সাধ্য নাই যে শ্রীভগবানের কোপ শান্ত করিতে সমর্থ হইবেন। তাই, দেবাদিদেব ব্রহ্মা ভক্ত-শিরোমণি

প্রহ্লাদকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণতলে নিপতিত হইলেন এবং পাঁচ বৎসরের শিশু প্রহ্লাদ শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের করস্পর্শে অভূত-পূর্ব্ব শক্তি ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সেই ভুবন-বিখ্যাত স্তব করতঃ নৃসিংহদেবকে প্রসন্ন করিলেন। নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে তাঁহার নিজ অভিলষিত বর প্রদান করিতে চাহিলেও প্রহ্লাদ মহারাজ যাহাতে সাধারণ লোকের লোভ হয় সেইরূপ বৈষয়িক কোন বর না চাহিয়া এই বর চাহিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কৃষ্ণেতর কোন অভিলাষ না জন্মে এবং তাঁহার পিতা যেন দুরন্ত দুস্তর পাপরাশী হইতে মুক্ত হন। তত্রাপি শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মন্বন্তর পর্য্যন্ত তাঁহাকে দৈত্যদিগের অধীশ্বর করিয়া শ্রীভগবানে অর্পণ দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় সকল ভোগ করাইলেন।

শ্রীভগবানের নিকট কি চাহিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরের বহু উপদেশ আছে। তন্মধ্যে একটী উপদেশ এই স্থানে পাঠকবর্গের সঙ্গে আস্বাদন করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও, অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব। প্রার্থনা না করিতে তুমি ত আমাকে সকলি দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজী আছে আমি জানি না, সেইজন্য ভয় হয় পাছে মহারত্নের পরিবর্ত্তে এক টুক্‌রা কাচ লইয়া আসি। তাই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন, প্রভু চাহিব না—যে রত্নটী সত্যই মহারত্ন সেইটীই আমাদিগকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারী হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না বলে যেন মনে করিও না যে আমার অভাব নাই; আমার অভাব জানিয়া তাহাই তুমি পূরণ কর। যে দয়াময় অভাব জানিয়া জানিয়া পূরণ করেন সেই দাতাশিরোমণি কৃষ্ণকে কদাচ ভুলিবেন না।" (পঃ ২১৫ পৃষ্ঠা)

রাবণ ও কুম্ভকর্ণ চরিত ও শ্রীশ্রীরামলীলা।

লঙ্কাধিপতি মাল্যবান রাক্ষস শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে সমস্ত রাক্ষসগণ সহ পাতালে পলায়ন করায় স্বর্ণ লঙ্কা বহুদিন যাবৎ শূন্য ছিল। তখন বিশ্বশ্রবা মুনির আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনাধিপতি কুবেরের কোন বাসস্থান না থাকায় তিনি লঙ্কায় যাইয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন। লঙ্কা বিশ্বশ্রবার অধিকার হইয়াছে এবং কুবের তাহার পিতৃধন অধিকার করিয়াছে দেখিয়া রাক্ষসগণের মনে দ্বিগুণ খেদ হইল। ঐ লঙ্কা পুনরধিকার করার বাসনায় রাক্ষসরাজ মাল্যবানের আদেশে তাঁহার অপরূপ সুন্দরী কন্যা নিকষা বিশ্বশ্রবার নিকট যাইয়া বিবাহিতা হন এবং তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পণখা এবং বিভীষণ নামক তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরকে জিনিয়া মাতামহের নির্ম্মিত স্বর্ণ লঙ্কাপুরি অধিকার করার অভিপ্রায়ে তিন ভাই হিমাদ্রি শিখরে যাইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী অতি কঠোর তপস্যা করার পর ব্রহ্মা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ রাবণকে তাহার প্রার্থনা মতে এই বর দিলেন যে যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব অপ্সর, চরাচর খেচর, পিশাচ, বিষধর কেহ তাহাকে বধ করিতে পারিবে না, তাহাদের কাহারো বাণে তিনি মরিবেন না এবং তাহাদের সকলকেই তিনি পরাজিত করিতে পারিবেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় ফাঁক রহিল মাত্র নর ও বানর। কারণ তাহারা রাক্ষসদের ভক্ষ্য মধ্যে বলিয়া তাহাদের জন্য রাবণের কোন ভয় নাই। ব্রহ্মা আরও বর দিলেন যে রাবণের মুণ্ড কাটা গেলেও তাহা আসিয়া আবার তাহার স্কন্ধে জোড়া লাগিবে এবং তিনি তাঁহার নিজের সৃষ্ট ব্রহ্ম-বাণ অস্ত্র রাবণের হাতে দিয়া বলিলেন যে এই তাহার মৃত্যুবাণ এবং এই বাণ ছাড়া তাহাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। বিভীষণ বর চাহিয়া লইলেন যে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হউক। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই বর দিয়া আরও বর দিলেন যে তিনি অক্ষয় অমর হউন। কুম্ভকর্ণের যেমন চেহারা তেমন শক্তি। বিনা বরেই

দেবতাগণ তাহার ভয়ে অস্থির। ব্রহ্মা যখন তাহাকে বর দিতে উদ্যত হইলেন তখন দেবতারা "ত্রাহি" "ত্রাহি" বলিয়া সরস্বতী দেবীকে ডাকাইয়া আনিয়া কুম্ভকর্ণের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করাইলেন। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে তাহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলা মাত্র সরস্বতী তাহার কণ্ঠ হইতে বলিয়া উঠিলেন "আমি নিরন্তর নিদ্রা যাইব।" ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেই বর মঞ্জুর করিলেন, তাহাতে দশানন ব্রহ্মার চরণে পতিত হইয়া কাতরে প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা সদয় হইয়া এই বর দিলেন যে কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রা যাইবে তৎপর একদিন মাত্র তাহার জাগরণ থাকিবে এবং সেইদিন সে ইচ্ছা করিলে একাই ত্রিভুবন জয় করিতে পারিবে, কিন্তু কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলেই তাহাকে যমের ঘরে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাবণ ও বিভীষণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বিশ্বশ্রবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাবণ এইরূপ বর পাইয়াছে শুনিয়া ত্রিভুবন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। রাবণের মাতামহ সুমালী সেই কথা শুনিয়া হরষিত হইয়া পাতাল হইতে পরিজন সহ উঠিয়া আসিলেন এবং তাঁহার পরামর্শে রাবণ কুবেরের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত যাইয়া কুবেরকে বলিল যে স্বর্ণলঙ্কা রাবণের মাতামহের রাজ্য, সুতরাং রাবণের ন্যায্য অধিকার; কুবের এই রাজ্য রাবণকে ছাড়িয়া দিউন, নতুবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। কুবের তাঁহার পিতার নিকট যাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বশ্রবা বলিলেন—"আমি আর কি করিতে পারি? রাবণ দুরন্ত রাক্ষস; ব্রহ্মার বরে সে আমাকে তাহার পিতা কিম্বা তোমাকে তাহার জ্যেষ্ঠ (বৈমাত্রেয়) ভাই বলিয়া মানিবে না; তুমি লঙ্কা ছাড়িয়া যেখানে ভাগীরথী আছে সেই কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া বাস কর।" তদনুসারে কুবের লঙ্কা ছাড়িয়া কৈলাস পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন; রাবণ লঙ্কা অধিকার করিয়া তথাকার রাজা হইয়া বসিলেন। তৎপর তিন ভাইয়ের বিবাহ হয়। বিধাতার বরে বলীয়ান্ হইয়া রাবণ আর কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। দেবতাগণকে দানবগণকে ধরিয়া ধরিয়া আনিতে আরম্ভ

করিলেন। [illegible] ইন্দ্রের নন্দন বন উপাড়িয়া নিয়া আসিলেন, কাহারও সাধ্য নাই যে রাবণকে নিবারণ করিতে পারে। মুনি, ঋষি, দেবতাদিগের প্রতি ভয়ানক হিংসা আরম্ভ করিলেন। তাহার ভয়ে স্বয়ং যমও নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের এই সমস্ত দুষ্কর্মের কথা শুনিয়া তাহাকে বুঝাইয়া নিবারণ করার জন্য কুবের দূত পাঠাইলে ফল হইল এই যে রাবণ ঐ দূতকে বধ করিয়া কুবেরের সঙ্গেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ। কুবেরের সাধ্য কি যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে। কাজেই তাহাকে পরাজিত হইতে হইল। রাবণ একে একে পৃথিবীতে যত যত রাজা ছিলেন তাহাদিগকে বাহুবলে পরাস্ত করতঃ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অতি ভীষণ যুদ্ধ; একে একে দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী রাবণকে সেবা করার জন্য তাহাদের উপর দিবারাত্র এইরূপ হুকুম জারী করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেবতারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাবণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দেবতাগণকে আরও জব্দ করার জন্য তাহাদের প্রিয় বাসস্থান স্বর্গ, যে স্থানে মাত্র পুণ্যাত্মাগণই যাইতে পারেন, সেই স্বর্গে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন যেন, পাপী, তাপী, সকলেই তথায় যাইতে পারে। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা সীমা আছে, সীমা ছাড়াইয়া গেলে কখনই তাহার মঙ্গল হইতে পারে না। এজন্যই লোকে বলে "অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।"

তাই রাবণের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্যই শ্রীনারায়ণ "রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন" এই চারি অংশে অযোধ্যাধিপতি দশরথের ঔরসে এবং কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবীর গর্ভে আবির্ভাব লীলা প্রকট করেন। তৎক্ষণাৎ রাবণের সিংহাসন টলিয়া উঠিল, মাথার মুকুট খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। ধার্ম্মিক বিভীষণ রাবণকে বলিলেন যে তাহাকে যিনি বধ করিবেন তিনি ঐক্ষণে জন্মগ্রহণ করার জন্যই ঐরূপ কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। রাবণ কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তিত হইয়া আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

কিছুকাল পরে এক পুণ্য তিথি উপলক্ষে দশরথ চারি পুত্র সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। পথে শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কৃপা করতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

এদিকে মিথিলাতে নিশাচর মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণের ভীষণ অত্যাচারে মুনিগণ কিছুতেই যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া রাজর্ষি জনক সমস্ত মুনিগণকে আহ্বান করতঃ তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিশ্বামিত্র মুনি বলেন যে, দশরথ গৃহে অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া অন্য কেহ ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া তিনি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করার জন্য অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ পূর্ণার্থ রাক্ষস বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার সঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাক্ষসের নাম শুনিয়া দশরথ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। নানারূপ চক্রান্ত করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ব্রহ্ম শাপের ভয়ে অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে প্রেরণ করিতে দশরথ বাধ্য হইলেন। প্রথমতঃ যুদ্ধ বাঁধে, মারীচের মাতা মহাভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে। যাহাকে পায় তাহাকে তাড়াইয়া ধরিয়া খাইয়া ফেলে বলিয়া তাহার নাম "তাড়কা"। তাড়কাকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যে তপোবনে গৌতমের শাপে তাঁহার স্ত্রী অহল্যা পাষাণ হইয়া রহিয়াছিলেন সেই তপোবনে উপনীত হইলেন এবং সেই পাষাণের উপর শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পদ অর্পণ করিয়া অহল্যাকে উদ্ধার করেন। তৎপরে তিনি তিন কোটী রাক্ষস বধ করিয়া মুনিগণের যজ্ঞ সমাধা করাইলেন।

তখন বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন যে মিথিলাধিপতি জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার "হরধনু" ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহারই সঙ্গে তাঁহার কন্যা সীতার স্বয়ম্বর হইবে। শত শত ভূপতি আসিতেছেন আর অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি মনে করেন যে শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনু ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবেন। মুনির আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্র

াইয়া অনায়াসেই ধনুটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজর্ষি জনক অত্যন্ত হরষিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে জানকীর বিবাহের শুভক্ষণ নির্ণয় করার জন্য বিশ্বামিত্র মুনিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভাইকে রাজর্ষি জনকের দুই কন্যা বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীরামচন্দ্র বলেন তাহারা চারি ভাই একদিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের চারি ভাইকে যিনি চারিটী কন্যা দিবেন সেই তাঁরই তাহারা বিবাহ করিবেন; তদনুসারে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে জনকের দুই কন্যা এবং তাহার ভাই কুশধ্বজের দুই কন্যা এই চারি কন্যা চারি ভাইর নিকট বিবাহ দিবেন। বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের নিকট যাইয়া সেই প্রস্তাব করিলে তিনি রাণীদের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ সকলেই তাহা আনন্দে অনুমোদন করায় দশরথ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে লইয়া মিথলায় গমন করেন, এবং মহাসমারোহের সহিত রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে, জনক এবং কুশধ্বজের কন্যা শ্রীসীতাদেবী, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তির সঙ্গে বিবাহ দেন। বিবাহান্তে চারি ভ্রাতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। পিতামাতার আনন্দের আর সীমা নাই।

তৎপর দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা করিবেন স্থির করিয়া অভিষেকের আয়োজন করার জন্য পাত্র মিত্রগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে অধিবাস হইয়া গেল। রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাইয়া প্রজাগণ হরষিত অন্তরে দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। যিনি শুনেন তিনিই আনন্দিত, কিন্তু আনন্দিত হইতে পারিলেন না কৈকেয়ীর দাসী ভরতের ধাতৃমাতা মন্থরা। যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার ভরত রাজা না হইয়া রাম রাজা হইবেন তখন তাঁহার বুকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভরতকে কিরূপে রাজা করিবেন পরামর্শ করার জন্য মন্থরা তৎক্ষণাৎ কৈকেয়ী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে, ব্যঙ্গভাবে বলিলেন, "শুনেছ, রামের নাকি রাজ্যাভিষেক?"

কৈকেয়ী বলিলেন "তাই নাকি? এর চেয়ে আমার সুখের বিষয় আর কি হতে পারে?" এই বলিয়া যখন তিনি তাঁহার অঙ্গ হইতে একখানা মূল্যবান্ অলঙ্কার খুলিয়া মন্থরাকে উপহার দিলেন, তখন মন্থরা মনে মনে ভাবিলেন "বেশ ভাল লোকের সঙ্গেই তো পরামর্শ করতে এসেছি।" সে তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। কৈকেয়ী অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসায় মন্থরা বলিল, "রাম রাজা হবে শুনে তুমি যে আহ্লাদে আটখানা হয়েছ—তোমার ভরত রাজা না হয়ে রাম রাজা হ'লে তোমার কি লাভ হবে? কৈকেয়ী বলিলেন "ভরত কি করে রাজা হবে? রাম বয়োজ্যেষ্ঠ, বিধানানুযায়ী তিনি রাজা হবেন আর ভরত তার আদেশানুযায়ী কাজ করবে।" মন্থরা বলিল "তা কিছুতেই হতে পারে না—যেরূপেই হ'ক ভরতকে রাজা করতেই হবে।" কৈকেয়ী কিছুতেই রাজী হইতেছেন না; অথচ কৈকেয়ী রাজী না হইলে শ্রীভগবানের লীলাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাই শনিরাজ আসিয়া কৈকেয়ীর স্কন্ধে আরোহণ করিলেন, এবং কৈকেয়ী অবশেষে মন্থরার কথায় রাজী হইয়া তাহার পরামর্শানুসারে স্নানাহার পরিত্যাগ, পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে মলিন বসন পরিধান এবং অঙ্গের অলঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রকে ছত্রদণ্ডধর করার সময় প্রায় আগত, দশরথ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় মনে পড়িয়া গেল যে তাঁহার প্রিয় স্ত্রী কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া এবং তাঁহাকে না বলিয়া গেলে তিনি অনুযোগ করিবেন তজ্জন্য দশরথ কৈকেয়ীর অন্বেষণে ঘরে যাইয়া না পাইয়া অবশেষে এক ঘরে (যাহা এখন "কোপ ভবন" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে) যাইয়া দেখেন যে কৈকেয়ী সমস্ত অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মলিন বসন পরিধান করিয়া মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। দশরথ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, ধন জন যাহা চাহেন তাহা দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর কোপ আর কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছেন না।

"কৈকেয়ী যুবতী নারী,—দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় রাজার কৈকেয়ীর দুখে॥"

অবশেষে দশরথ বলিলেন যে কৈকেয়ী যাহা চাহেন তাহাই তাঁহাকে দিবেন। মন্থরার পরামর্শানুসারে তখন দশরথকে আবার সত্যে আবদ্ধ করাইয়া অষ্ট লোক-পাল, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি সাক্ষী করিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "মহারাজ মনে আছে কি,—আমি তোমাকে প্রাণপণে সেবা করার জন্য আমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলে এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে যখন চাহিব তখনই সেই বর দিবে? সেই বর'দুটী তোমার কাছে আমার এখনও পাওনা আছে। এক বরে চাই ভরতের রাজ্যাভিষেক আর দ্বিতীয় বরে চাই রামচন্দ্রের চতুদ্দশ বৎসর বনবাস।" শুনিয়া দশরথ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার বুকে যেন শেল আসিয়া বিদ্ধ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বল কি কৈকেয়ী তুমি আমাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করায় আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু আমার গুণনিধি রামচন্দ্রের কি অপরাধ যে আমি তাকে বনে পাঠাব? আমি কোন মুখে বল্‌ব রামচন্দ্র তুমি বনে যাও?" কৈকেয়ী বলিলেনা "তা আমি জানি না।" দশরথ তাহাকে কত বুঝাইলেন কত ধম্‌কাইলেন, কত খোসামদি করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য ছাড়িয়া গেলে তখনই তাঁহার (দশরথের) জীবন যাইবে বলিয়া কৈকেয়ীর চরণে ধরিয়া নিজ প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু সকলই অরণ্যে রোদন! কৈকেয়ীকে ফিরান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল। রাজা অভিমানে ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

"বহু পরিণয়—তরু বিষময়
ফলিল তাহার ফল।"

এদিকে অভিষেকের শুভক্ষণ উপস্থিত—সকলি প্রস্তুত কিন্তু রাজা আসিতেছেন না দেখিয়া পাত্র মিত্র সকলে পরামর্শ করিয়া সারথি সুমন্তকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। সুমন্ত্র যাইয়া রাজা ও কৈকেয়ীর অবস্থা দেখিয়া অবাক। অবশেষে রামের সঙ্গে যুক্তি করার জন্য রামকে ডাকিয়া আনিতে দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। কৈকেয়ীও রামকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনার জন্য সুমন্ত্রকে বলিয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তথায় যাইয়া দেখেন রাজা কৈকেয়ীর নিকটে ভূমিতে লুটাইতেছেন। কৈকেয়ীকে কারণ জিজ্ঞাসায়, তিনি বলিলেন, "রামচন্দ্র তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে তুমি তো জান যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপরাধে মহা রৌরবে পতিত হতে হয়! তোমার পিতার নিকট আমার দু'টী বর পাওয়ানা আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন যে, যখনই চাহিব তখনই সেই বর দুটী দিবেন। আজও আবার নূতন করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখন তুমি যদি তাঁহাকে রক্ষা কর তবেই তিনি রক্ষা পান। রাজা বলেন যে তিনি এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া তোমাকে কখনো বলতে পারবেন না।" বরের বিষয় শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন "মা তুমি সেইজন্য বাবাকে এইরূপ ভাবে মূৰ্চ্ছিত করে ফেলেছ? যে পিতার কৃপায় এই দেহ পেয়েছি তার জন্য এই প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত। পিতা কেন, তুমি মাতা তোমার আজ্ঞাও সকল হইতে মহত্তর তোমার আজ্ঞাই যথেষ্ট, আমি এখনই বনবাসে যাওয়ার আয়োজন কচ্ছি—তুমি অবিলম্বে ভরতকে দেশে আনিয়ে রাজা কর।"

শ্রীরামচন্দ্র, মাতা কৌশল্যা দেবীর নিকট যাইয়া অতিকষ্টে বনবাসের অনুমতি গ্রহণ করিলেন কিন্তু সীতা দেবীর হাত কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। (এইস্থানে ঠাকুর জোর দিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে লোকশিক্ষার জন্যই ভগবান নিজে শ্রীরামচন্দ্রের এবং সীতা দেবী জীবের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবানের প্রতি জীবের কি কর্ত্তব্য তাহা শিক্ষা করার জন্য সীতা দেবীর লীলাসমূহ আমাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।) সীতাদেবী বলিলেন "আমার নিত্যস্থান তোমার

বামে এবং তোমাকে সেবা করার জন্যই আমার জন্ম—তুমি যদি রাজধানীতে থেকে রাজা হও—আমি সিংহাসনে তোমার বামে থেকে তোমাকে সেবা করব। আর তুমি যদি বনে যাও তবে তোমাকে সেবা করার জন্য আমাকেও বনে যেতে হবে।" বন ভীষণ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে অনেক ভয় দেখাইলেন। সীতা বলিলেন—"আমি যাব আমার স্বামীর সেবা কর্ত্তে, হিংস্র জন্তু আমার কি করবে?" অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন "যেখানে রাম সেখানে লক্ষ্মণ। সীতা দেবী যদি বনে যান তবে তাকেই বা কে রক্ষা করবে? সুতরাং আমার যেতেই হবে।" কাজেই লক্ষ্মণকেও সঙ্গে নিতে হইল। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ রওয়ানা হইয়া গেলেন। দশরথ বিলাপ করিতে করিতে কতদূর তাহাদের সঙ্গে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া যে শয্যা গ্রহণ করিলেন আর সে শয্যা হইতে উঠিলেন না—অবিলম্বেই দেহরক্ষা করিলেন। যাইতে যাইতে শ্রীরামচন্দ্র সেই গুহক চণ্ডালের বাড়ী পৌছিয়া তাহাকে কৃপা করতঃ কোল দিয়া তাহার সঙ্গে আহার করতঃ এক রাত্রি তাহার বাড়ীতে অবস্থান করিলেন।

"ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।" (চৈঃ চঃ)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও যবন হরিদাসের এই সম্পর্কের লীলাও তো সকলেই জানেন। শুনিয়াছি যে আমাদের দয়াল ঠাকুরের নাম ও মাহাত্ম্য শুনিয়া উৎকলের একটি অতি প্রাচীন দরিদ্রা মুসলমান স্ত্রীলোক ঠাকুরকে খাওয়াইবার জন্য সামান্য কিছু পাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কতকদিনের পরে ঠাকুর হঠাৎ তাহার বাড়ীর নিকট পৌছিলে স্ত্রীলোকটী দৌড়াইয়া উহা আনিয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। ঠাকুর সানন্দে উহা খাইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যান। ঠাকুর বলিয়াছেন "বৈষ্ণবের চারি খুট ফাঁক"—

"কথায় বলে—'জাত হারালেই বৈষ্ণব'। জীবের জাতি, ধর্ম্ম, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ

এ সকল গুণ থাকে ততক্ষণ বৈষ্ণব হতে পারে না। যতক্ষণ জীব স্বজাতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ বৈষ্ণব হতে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তাই বলি সত্যই বৈষ্ণব হলে জীব বয়ে যায় কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যেদিকে জীব-সমুদ্রের গতি—সে সেদিকে যায় না—তার বিপরীত দিকে যায়—ইহারই নাম যমুনার উজান গতি। এই উজান গতিতে চলিতে থাকে এবং ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া গতি শূন্য হইয়া পড়ে। তখন তীর পায় ও নিশ্চিন্ত হয়।"

গুহক চণ্ডাল নদী পার করিয়া দিলে ভরত আসিয়া সহজে তাহাকে না ধরিতে পারেন তজ্জন্য রামচন্দ্র সুদূর বনাভিমুখে পদব্রজে রওনা হইলেন। রাজা হবার পরিবর্ত্তে যে বনবাসে যাইতেছেন তজ্জন্য কোন দুঃখ নাই; শুধু চিন্তা এই যে সীতা দেবী কিরূপে এই বনের কষ্ট সহ্য করিবেন এবং তিনি কিরূপে তাঁহাকে হিংস্র বন্য জন্তুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু সেদিকে সীতা দেবীর অণুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সেবা করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের কষ্ট দূর করিতে পারিবেন তজ্জন্য আনন্দেই পদব্রজে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছেন। নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শ্রীভগবানের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পন করিয়া চলিয়াছেন তখন ভগবান আর কি করেন? সীতা দেবীর কোনরূপ কষ্ট না হয় তজ্জন্যই তাঁর চিন্তা। এমন কি, সীতা দেবীর চরণে একটী কাঁটার আঁচড়ও না লাগিতে পারে তজ্জন্য সীতা দেবীর চরণের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। এদিকে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি (উপনিষদের শ্রুতি) গণ যখন শুনিলেন যে ভগবান রামচন্দ্র এইপথে আসিতেছেন তখন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রামচন্দ্র গেলেনও সেই পথ দিয়া। কিন্তু তাঁহাদের এমনি দুরদৃষ্ট যে তিনি তাঁহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীর চরণের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। সকলেই অবাক! তন্মধ্যে একজন প্রকাশ্যভাবেই বলিলেন "দেখেছ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিরূপ স্ত্রৈণ? আমরা এতদিন ধরে তাঁর তপস্যা করিতেছি কিন্তু আমাদের দিকে একবার ফিরিয়াও না চাহিয়া নিজের স্ত্রীর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।" প্রায় সকলেই বলিলেন—"তাই তো"! তখন শ্রীভগবান তাহাদের মধ্যের একজনের দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেওয়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমরা যে কেবলি বল্‌ছি 'ভগবান স্ত্রৈণ'—'ভগবান স্ত্রৈণ" —আমরা কি করেছি যার জন্য তিনি আমাদিগের দিকে চাহিবেন?" অন্যান্য সকলে বলিলেন—"কেন, আমরা যে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁর তপস্যা কচ্ছি"। তখন তিনি বলিলেন "তপস্যা কচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কি? নিজেদের স্বার্থ নয় কি? আমরা বার বার জননী জঠরে এবং জ্বালাময় সংসারে প্রবেশ করার জ্বালা সহ্য করতে পার্চ্ছি না, আমাদিগকে তোমার সঙ্গে মিশাইয়া নেও—এই তো?" সমুদ্রের সঙ্গে এক ফোঁটা জল মিশিয়া গেলে তাহাতে তাহার নিজেরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। তাতে সমুদ্রের কি আসে যায়? বরং আমরাই আত্মহত্যার পাপে অভিযুক্ত হইতেছি।" (ঠাকুর এইখানে বলিয়াছিলেন যে দণ্ডবিধি আইনানুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেও তাহাকে জেল খাটিতে হয়।)

তখন মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে "সীতার কিরূপ তপস্যা ছিল?" তিনি বলিলেন "সীতা কি রামের মত বাধ্য হইয়া বনে যাইতেছেন?" তাহারা উত্তর করিলেন "না"। তিনি বলিলেন তবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সীতা দেবী বনবাসের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে কেন যাইতেছেন? প্রতি মুহূর্তেই হিংস্র জন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে সেদিকে অণুমাত্র চিন্তা নাই। তিনি যে শ্রীভগবানকে সেবা দ্বারা তাঁহার বনগমনের কষ্ট লাঘব করিতে পারিবেন সেই জন্য—দেখছনা কেমন আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইতেছেন। এমন সীতা দেবীর দিকে চাহিবেন না—চাহিবেন কি আমাদের দিকে?" মুনিগণ তখন তাহা মনে প্রাণে বুঝিতে পারিয়া দ্বাপরে ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়া মনে প্রাণে শ্রীভগবানের সেবা করতঃ রাস পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ অজিত ভগবান

তাঁহাদের প্রেমে তাহাদের নিকট বিজিত হইয়াছিলেন, নিজকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

"শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপী ভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপী দেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাস ক্রীড়া কৈল॥" (চৈঃ চঃ)

দশবৎসর কাল নানা বন পরিভ্রমণান্তে শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবী ও লক্ষ্মণ সহ পঞ্চবটী বনে অবস্থান কালে, রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনে মোহিতা হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রের বনিতা হওয়ার অভিপ্রায়ে সেই মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী, নররূপ ধারণ করতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য নানারূপ ছল কৌশল আরম্ভ করিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র অবতারে প্রভু এক পত্নী-ধর। তখন দাস্য, বাৎসল্য ও গৌরব সখ্য, মাত্র এই আড়াই রসেই জীবসকল তাঁহাকে ভজন করিতে সমর্থ হইত। কাজেই প্রভু সূর্পণখার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রভুকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ রসেই ভজন করিয়া জীব-কুল ধন্য হইয়াছেন।

"বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ)

তাই, কৃষ্ণ অবতারে সূর্পণখা তাঁহার সুকৃতির বলে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রভুর প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে সূর্পণখাকে বলিলেন যে, সে তাহার জায়া হইলে সতিনী পাইবে, কিন্তু মনোহর বেশ লক্ষ্মণের ভার্য্যা হইলে তাহার জীবন সফল করিতে পারিবে। তখন সূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে ধরায় তিনি বলিলেন যে, তিনি শ্রীরামের দাস—সেবকের প্রতি তাহার কেন অভিলাষ? ত্রিভুবনের সার অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাণী হইতে

পারিলে সকলেই তাহার পূজা করিবে। সূর্পণখা লক্ষ্মণের সেই পরিহাসও বুঝিতে না পারিয়া আবার শ্রীরামচন্দ্রের পাছে লাগিয়া গেল এবং শ্রীসীতা দেবীকে গিলিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া যেদিকে সীতা যান সেই দিকেই তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন শ্রীরামচন্দ্রের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ এক বাণে সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া দিলেন। সূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতা খর-দূষণের নিকট যাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করতঃ বলিল যে, সে মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট যাওয়ায় তাহারা উহার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে। খর-দূষণ প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সৈন্যসহ উভয় ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ দৃষ্টে ভীতা হইয়া সূর্পণখা লঙ্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীরাম কর্ত্তৃক খর-দূষণাদির বধের বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া অবশেষে রাবণকে বলিল যে শ্রীরামচন্দ্রের বনিতা সীতা পরমা সুন্দরী যুবতী নারী, তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিতে না পারিলে রাবণের রাজত্বেও ধিক্ জীবনেও ধিক্! রামচন্দ্র রাক্ষসকুলকে যেরূপ সন্তাপ দিয়াছে তেমনি সীতার শোকানলে মরাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি। এইরূপে উত্তেজিত করায়, রাবণ সীতা দেবীকে হরণ করিয়া আনার অভিপ্রায়ে নিশাচর মারীচের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভার্য্যা, পুত্র ও স্বর্ণলঙ্কাপুরি পরিত্যাগ করতঃ তখন তপস্যায় রত ছিলেন, রাবণ তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া ও ভয় দেখাইয়া রাজী করতঃ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন যে সীতাদেবী মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হইতে পৃথক্ হইতেছেন না।

“যাঁহা কাম্ তাঁহা নাহি রাম,
যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।
দোনো এক নাহি মিলে,
রবি রজনী এক ঠাম॥” (তুলসীদাস)

জীব যতদিন শ্রীভগবানের নিকট বাস করে কিংবা শ্রীভগবন্মুখ থাকে ততদিন মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই রাবণ গাছের আড়ে থাকিয়া, ছলে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়ার জন্য মারীচকে পাঠাইলেন। মারীচ নয়নাভিরাম মায়ামৃগ-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ সীতার নয়ন পথে পতিত হইয়া এইরূপ ভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন যে সীতাদেবী তাহাতে আকৃষ্টা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আখটি (বায়না) ধরিলেন যে ঐ মৃগটী বধ করতঃ উহার চামড়া তাহাকে দিতে হইবে। তিনি ঐ চর্ম্ম দ্বারা বসিবার আসন প্রস্তুত করিবেন। উহা মায়ামৃগ, ধরিতে গেলে সীতার বিপদ হইবে ইত্যাদি বলিয়া—শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সীতাদেবী কিছুতেই তাহা মানিলেন না, এবং অবশেষে বলিলেন "আমি শ্রীরামচন্দ্রের ঘরণী আমার আবার বিপদ? তুমি কি আমাকে রক্ষা ক'রতে পারবে না?" তখন শ্রীরামচন্দ্র আর কি করেন? লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন যে সীতা দেবী মায়ামৃগটী বধ করিয়া আনার জন্য আখটি ধরিয়াছেন—তাই তিনি চলিলেন ঐ মৃগটি বধ করার জন্য, কিন্তু সাবধান! তিনি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত যেন লক্ষ্মণ সীতা দেবীর কাছ ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র না যান। এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ রহিয়া গেলেন। তিনিও তো অংশ অবতার, তাঁহাকেও না সরাইতে পারিলে তো সীতাদেবীর নিকট যাওয়া অসম্ভব। তাই মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের গলার স্বর অনুকরণ করতঃ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। "লক্ষ্মণ আমি বিপন্ন—আমার প্রাণ যায়, শীঘ্র এস।" সীতা দেবী লক্ষ্মণকে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু লক্ষণ বলিলেন যে, ও মায়ার খেলা, শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, তাঁহাকে বিপন্ন করে কার সাধ্য? লক্ষ্মণ কিছুতেই যাইতেছেন না দেখিয়া অবশেষে সীতা দেবী বলিলেন "কি, আমি কি তোমার দাদার গলার স্বর চিনি না? আমি স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে তোমার দাদার গলার স্বর, আর তুমি বল্‌ছ যে ও মায়ার খেলা। তোমার বুঝি উদ্দেশ্য তোমার দাদা মরুক, তুমি আমাকে উপভোগ কর?"

ক্ষ্মণ কর্ণে আঙ্গুল দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "জয় সীতা রাম"। ারে মনে মনে বলিলেন, "দাদা, মা আমাকে অযথা কর্কশ কথা বলছেন, পারলাম । তোমার আদেশ প্রতিপালন করতে—আমি চললাম।" এই বলিয়া তিনি মস্ত দেবতাগণকে সাক্ষী করতঃ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে গণ্ডি দ্বারা বেড়িয়া সীতা দবীকে বলিলেন "মা আমি যেমন তোমার আদেশ প্রতিপালন ক'রতে ল্লাম তোমাকেও আমার একটী আদেশ প্রতিপালন ক'রতে হবে। আমরা ই ভাই ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি এই গণ্ডির বাহিরে যেওনা—গেলেই তামার বিপদ হবে।" সীতা দেবী তাহাতে সম্মত হওয়ায় লক্ষ্মণচন্দ্র চলিয়া গলেন। কিছুকাল পরে স্বয়ং রাবণ তপস্বীর বেশে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সীতা দেবী আশ্রমের মধ্যে াকিয়াই ভিক্ষা দেওয়ার জন্য হাতবাড়াইলেন। ভগবানের দেওয়া গণ্ডির ধ্যেও প্রবেশ করার সাধ্য মায়ার নাই, তাই, ছদ্মবেশী রাবণ বলিলেন যে তনি আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাহাকে ভিক্ষা দিতে হইলে বাহির ইয়া আসিয়া ভিক্ষা দিতে হইবে। সীতা দেবী বলিলেন যে, আশ্রম থেকে াহির হইতে তাহার দেবর লক্ষ্মণের নিষেধ আছে এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন য বাহির হইলেই তাহার বিপদ হবে। কিন্তু আশ্রম হইতে বাহির করিতে া পারিলেও তো নয়। তখন রাবণ এমন একটী বিদ্রূপাত্মক হাসি (মায়ার াসি) হাসিলেন যে তাহার বেদনা সীতা দেবীর অন্তরে যাইয়া আঘাত করিল। তৎপর রাবণ বলিলেন, "তুমি তো খুব সতী সাধ্বী রমণী! আত্ম রক্ষার জন্য তোমার যথেষ্টই প্রচেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু তপস্বী রিক্ত হস্তে ফিরে গলে, আশ্রমস্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে যে অনন্তকাল নরকে বাস ক'রতে হবে সদিকে তো তোমার অণুমাত্র চিন্তা নাই।" তখন সীতা দেবী "তাই নাকি? তা হ'লে আমার যা হয় হবে" এই বলিয়া ভিক্ষা দেওয়ার জন্য গণ্ডি হইতে বাহির ওয়া মাত্র মায়ারূপী রাবণের করতলগত হইলেন। রাবণ তিলার্দ্ধকাল গৌণ া করিয়া সীতা দেবীকে তাহার রথে আরোহণ করাইয়া লঙ্কাভিমুখে রওয়ানা

হইলেন। পথে বিবেকরূপী জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম বাঁধে। কিন্তু মায়ারূপী রাবণের প্রবল শক্তির নিকট বিবেকরূপী জটায়ুকে পরাজিত হইতে হইল। রাবণ তাহার পাখা দু'টী কাটিয়া ফেলিয়া সীতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। জটায়ু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সাক্ষী দেওয়ার জন্য কষ্টে সৃষ্টে জীবনটী রক্ষা করেন। তৎপর শ্রীরামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে যখন তথায় উপস্থিত হন তখন জটায়ু তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন এবং তৎক্ষণাৎ দেহরক্ষা করতঃ স্বধামে চলিয়া যান। রাবণ সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া দেখেন যে সীতা দেবীর সর্ব্বদাই "রাম ধ্যান· রাম জ্ঞান", কিছুতেই তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তখন রাবণ সীতাকে অশোক কাননে আবদ্ধ করতঃ ছলে বলে কৌশলে যেরূপেই হউক রাবণের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য চেড়ীদিগকে নিযুক্ত করেন। তাহারা সীতা দেবীকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করে "সুখ চাও তো রাবণ ভজ, ঐশ্বর্য্য চাও তো রাবণ ভজ,—যশ চাও তো রাবণ ভজ ইত্যাদি।

জীবেরও ঠিক এমনি অবস্থা হয়। শ্রীভগবান বারংবার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও মায়ার প্রলোভনে ও চতুরতায় আমরা জীবসকল শ্রীভগবানের নিকট হইতে, এমন কি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য হইতেও বাহির হইয়া মায়ার হস্তে পতিত হই এবং অশোক কাননরূপ এই সংসারে প্রবেশ করতঃ আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু সসাংরে আসিলেও জীব যতক্ষণ ভগবন্মুখী থাকে ততক্ষণ মায়া তাহাকে অধিকার করিতে পারে না। তাই, মায়া আবার তাহার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ঐশ্বর্য্য যশঃ প্রভৃতি চেড়ীগণকে নিযুক্ত করেন। চেড়ীরূপে স্ত্রী বলেন "সুখ চাও আমাকে ভজ"; পুত্র বলেন "সুখ চাও আমাকে ভজ", ঐশ্বর্য্য বলেন "সুখ চাও আমাকে ভজ", যশ বলেন "সুখ চাও আমাকে ভজ"। জগতে সকল জীবই সুখের জন্য পাগল, কিন্তু আমরা প্রকৃত সুখের সন্ধান না পাইয়া মায়ার সৃষ্ট স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি তথাকথিত

সুখে মজিয়া মায়ার হস্তে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইয়া মরি। এবং চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণান্তে দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াও এইভাবে হেলায় নষ্ট করিয়া আবার চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকি।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড জন্যে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" (চৈঃ চঃ)

কিন্তু সীতা দেবী কেন ঐ চেড়ীদের প্রলোভনে পড়িবেন! তাঁহাকে কিছুতেই ভুলাইতে না পারিয়া চেড়ীগণ অবশেষে বলিল "তুমি যে কেবল রাম রাম করছ, তোমার রামচন্দ্র কি এখনো জীবিত আছেন? থাক্‌লে এতদিনেও তোমাকে উদ্ধার করতে আসতেন না?" তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে পাওয়ার জন্য সীতা দেবীর উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে গুরুরূপিণী সরমা দেবী আসিয়া বলেন "কে বলে মা, তোমার রামচন্দ্র নাই? তিনি তো আছেন। তবে তুমি তোমার বুদ্ধির দোষে প্রবল শক্তি মায়ার হস্তে পতিত হ'য়েছ, তোমার সাধ্য নাই যে তোমার নিজের ক্ষমতায় তুমি এই মায়ার সাগর পার হইতে পার।" তখন সীতা দেবী বলিলেন, "তবে উপায়?" সরমা বলিলেন, "তুমি অবিরত রাম নাম ক'রতে থাক, তাতেই রামচন্দ্রের কৃপা হবে এবং তিনি এসে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবেন।"

তদনুযায়ী সীতা দেবী এমন ভাবে নাম করিতে আরম্ভ করিলেন যে ভগবান রামচন্দ্রের আসন টলিয়া উঠিল। তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। সীতা দেবীকে উদ্ধার করিবার জন্য কপিকুলের সুগ্রীব হনুমানাদির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের সাহায্যে সমুদ্রে সেতুবন্ধ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। আর, ভক্ত-চূড়ামণি হনুমান শুধু "জয় সীতারাম, জয় সীতারাম" এই নামের সাহায্যেই

ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছিলেন। সীতাদেবী হনুমানকে বলিয়াছিলেন "এমন অনর্গল ভাবে আমার মুখ হইতে রাম নাম বাহির হইতেছে যে, আমার ভয় হয় যে, "রাম" "রাম" করতে করতে আমি আবার পাছে 'রাম' না হইয়া যাই।" হনুমান বলিলেন "তাতে আমার কি আস্‌বে যাবে? তুমি যেমন "রাম রাম" করিতেছ আমার প্রভু রামচন্দ্রও তো সেইরূপ "সীতা সীতা" করিতেছেন। তুমি যদি 'রাম' নাম করিতে করিতে "রামচন্দ্র" হইয়া যাও আমার প্রভুও তোমার নাম করিতে করিতে সীতা হইয়া যাইবেন। সুতরাং আমার নিকট যুগল যুগলই থাকিবে।"

বস্তুতঃ নামে রুচি জন্মিলে মুখ আর কিছুতেই নাম ছাড়িতে পারে না। তাই বিদগ্ধ মাধব গাহিয়াছেন ঃ—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

অর্থাৎ ঃ—কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিনা; দেখ, যখন নটীর ন্যায় তাহা মুখে নৃত্য করে তখন বহু মুখ পাইবার জন্য আসক্তি বর্দ্ধন করে যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রে অঙ্কুরিত হয় তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

"কাণের ভিতর বাসা করে আপনে তাহা সদাঙ্কুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।" (চৈঃ চঃ)

পাঠকগণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে সীতা দেবী একদা হনুমানকে একছড়া বহু মূল্যবান হার পুরস্কার দিয়াছিলেন তখন হনুমান ঐ হার ছিড়িয়া তাহার মধ্যে "রাম" নাম নাই দেখিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে

সীতা দেবীও অন্যান্য সকলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায় হনুমান তাহার বুক চিরিয়া চামড়ার নীচে রাম নাম লিখা আছে দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এইরূপ নামের মহিমার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই দেখা যাইতেছে।

"নারদের কোন তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সর্ব্বশেষে নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন! নামকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ও সদাই উন্মত্ত অবস্থাতে কাল কাটাইতেছেন।" (পঃ ১।৭)

আমার দয়াময় ঠাকুর আবার বলিয়াছেন--

"খাইতে, শুইতে, খেলিতে, নাচিতে, গাইতে নাম স্মরণ করিবে। এবং নিজ জনকে স্মরণ করাইবে। নামের উপর নির্ভর করিয়া বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া, যাঁহার নাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগ তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বর্ত্তমান, এই কারণেই ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই। জীবকে এই নির্ভুল পথটী দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট অবতার শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পথে জাতীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যোগের পথে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য? কিন্তু নামের পথে সকলেই একতা, সর্ব্বত্রই সমত। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই জাতীয় মালা লইয়া সেই দয়াময়ের নানা ভাষাতে নাম করিতেছে। তাই বলি এমন নিত্য, শুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত পথটী আর নাই; অতএব সকল ভুলিয়া মনের আনন্দে নামে মজিয়া থাক। তখন নিজেকে ও নিজ জনকে মহা আনন্দে রাখিতে পারিবে। মন দৃঢ় কর, সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, নিশ্চিন্ত হইবেই হইবে। নামের আর একটী প্রাধান্য এই যে, তপস্যা করিতে করিতে অনেক ঐশিক শক্তি আসিয়া পড়ে তাহাতে জীব মুগ্ধ হয় ও আত্মহারা হইয়া জীবনের জীবনকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়ে। নামে সে ভয় নাই। যত ক্ষমতা হইবে ততই প্রেম বৃদ্ধি করিয়া জীবকে নত ও শান্ত করিবে। তপস্যার ফল

অনৈসর্গিক, আর নামের ফল প্রেম, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে পরের সঙ্গে বিচার করিও না; বিচার করিতে হয় নিজের প্রাণের সঙ্গে আর নিজের প্রাণের মানুষের সঙ্গে করিও, বুঝিতে পারিবে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকলের নজরে আসে না, এই জন্য যা'-র তা'-র সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কহিলে আনন্দের স্থানে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্ত্তে ক্রোধ এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া অনেক দিনের অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনটী নিমেষেই হারাইতে হইবে। তাই বলি যতদিন সম্পূর্ণ রূপ বল না পাইতেছ ততদিন সঙ্কীর্ণ পথে ও সঙ্গোপনে চলিতে হইবে, পরে আর ভয় নাই। মৎস্য শিশুর মত প্রথম সামান্য স্থির জলে প্রতিপালন করিয়া মহা বিপৎসঙ্কুল ও নানা হিংস্র জীব পূর্ণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে এবং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু প্রথমেই যদি সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, সামান্য সামান্য জীবে তা'দিগকে অক্লেশে খাইয়া ফেলিবে তখন আর ফিরিয়া পাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বলি, প্রথমে একটু সাবধানে চলিতে হইবে।"

* * * *

"নাম করিবার সময় অন্য চিন্তা আসিলে কাতর হইও না, তাহাতে কোনই দোষ হয় না। কিন্তু নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গে লইয়া বসিবে, একবার সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্যে ব্রতী হইবার পর আর কোনপ্রকার অশৌচই স্পর্শ করিতে পারে না। তবে দেখিবে যেন বসিবার পূর্ব্বে কোন অশৌচ লাগিয়া না থাকে। আকুলতাকে ও তার আদরের ভগ্নী লালসাকে নিত্য সঙ্গিনী করিবে, ইহারাই আমার বৃন্দাবনের ললিতা বিশাখা, ইহারা কৃষ্ণ দিবার নিবার একমাত্র অধিকারী। এ দুজনের সঙ্গ কদাচ ছাড়িও না ইহারাই তোমার হাত ধরিয়া নিয়া রাধাকৃষ্ণের নিকট নিত্য সেবার জন্য নূতন দাসী করিয়া অর্পণ করিবে। কুমীর পোকার মত ইহারাই তোমাকে নিজেদের রং ধরাইবে। তাই বলি ইহাদিগকে ভুলিয়া থেকো না। যে আহার দিলে

হারা পরম পুষ্ট হইবে সযতনে তাহাই দিবে। ইহারা কি খাইলে ভাল থাকে পুষ্ট হয় যদি নিজে না জানিতে পার তাহা হইলে যাহাদের নিকট ইহারা হিয়াছেন তাহাদের নিকট যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে হাদিগকে রাখিও না মলিন হইয়া যাইবে। সদা নানা আভরণে আবৃত াকিও। দেখ নাই কি শরীর সর্ব্বদা জামাতে ঢাকা থাকে বলিয়া হাতের ও খের রং অপেক্ষা কত পরিষ্কার থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ অপেক্ষা শীত ধান দেশের লোক সুন্দর হইবার ইহাই কারণ। তাই বলি যতদিন না রং াকে ততদিন আবরণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও।" (পঃ ২।১৫)

"ঘোর কলিকালের যেমন শক্ত ব্যাধি, নিতাই গৌর তেমনই বিচক্ষণ। দেখে শুনে তেমনই অমোঘ "হরিনাম" মহৌষধির ব্যবস্থা করে গেছেন। দুঃখী াপী এ ঔষধের গন্ধ মাত্রেই পরমানন্দে ভাসে আর একবার খেলে সকল জ্বালা ড়ায়।" (পঃ ৪।৮৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবকে মানেন না এমন হিন্দু এ জগতে নাই লিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুখে যে যাহাই বলুন না কেন, তিনি যে কলি ত জীবের উদ্ধার জন্য নাম সঙ্কীর্ত্তন অবতারণ করিয়া গিয়াছেন, এমন হিন্দু ক আছেন যাঁহার ঘরে কোন না কোন রকমে সেই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে না? হন্নারদীয় বচনোক্ত—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই শ্লোকটীর উপর ভক্তদের মনোযোগ বিশেষরূপ আকর্ষণ করতঃ ্যাখ্যাচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"কলি কালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥

'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব' কার॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥" (চৈঃ চঃ)

আমার দয়াময় ঠাকুরেরও এমন কোন পত্র কি উপদেশ নাই যাহাতে তিনি 'শ্রীনাম' ব্যতীত যে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই এই কথার উপ জোর না দিয়াছেন। 'অভিজ্ঞতার' পাঠকগণের মনে আছে যে আমার উপ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বপ্রথম উপদেশ হইয়াছিল ঃ—

"তোমাদের আর কিছুই করতে হবে না, শয়নে স্বপনে জাগরণে নাম করবে কখনো ভাব্‌বে না যে নামে কি হবে ; নামে সব হবে, নামে সব কর্ত্তব্য ব'ে দেবে। নাম পুকুরে ডুবে থাক, নামকে পরমাশ্রয় কর।" (অঃ ১।২৫ পৃঃ)

শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় পৌছিয়া সীতা দেবীকে উদ্ধার করার জন্য রাবণে সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে রাবণের সমস্ত সেনাপতি নিহত হওয়ায় রাবণ কুম্ভকর্ণকে অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইতে বা হইয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসেই কুম্ভকর্ণকে নিহত করি

পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাবণকে আর কিছুতেই পরাভব করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তখন বিভীষণ বলিলেন যে ব্রহ্মার বরে অন্য কোন অস্ত্রই রাবণের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে না। ব্রহ্মা রাবণকে যে ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন মাত্র সেই অস্ত্রই রাবণের মর্ম্মে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বিনাশ করীতে পারিবে। ঐ অস্ত্র রাণী মন্দোদরীর নিকট আছে, কিন্তু তিনি কোথায় রাখিয়াছেন বিভীষণ তাহা জানেন না। প্রবাদ আছে যে মন্দোদরীর কক্ষে ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন প্রভৃতি দেবগণও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেন না। তখন পবন-নন্দন হনুমান বলিলেন যে ছলে, বলে, কৌশলে যেরূপেই হউক তিনি ঐ বাণ আনিয়া দিতে পারিবেন। শ্রীরামচন্দ্র আর কি করেন? ভক্ত প্রবর ব্রহ্মার বর লঙ্ঘন করিয়া অন্য অস্ত্র দ্বারা রাবণকে বধ করিলেও ভক্ত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আবার রাবণকে বধ করিতে না পারিলেও সীতা দেবীর উদ্ধার হয় না। তাই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভক্তশিরোমণি হনুমানের এই অসঙ্গত প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইল। হনুমান জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করতঃ ঘন ঘন রাবণের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মন্দোদরীর কক্ষে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি কৌশলের সহিত রাবণের মৃত্যুবাণ উপরোক্ত ব্রহ্মাস্ত্র মন্দোদরীর নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এক লাথিতে স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া বাণ লইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করতঃ এক লাফে প্রাচীরের উপর উঠিয়া আর এক লাফে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বাণটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র সেই বাণ দ্বারা রাবণকে হত্যা করতঃ সীতা দেবীর উদ্ধার সাধন করেন।

শিশুপাল-দন্তবক্র চরিত ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা।

বৈকুণ্ঠ দ্বারপাল জয়-বিজয় তৃতীয় বারে শ্রীকৃষ্ণাবতারে চেদিরাজ দম ঘোষের ঔরসে বসুদেব-ভগ্নী শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা দুইজন এবং কংসাদি কতিপয় গর্ব্বিত দৈত্য

রাজত্বের নাম দিয়া এত অনাচার এবং অধর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল যে পৃথিবী তাহাদের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া একটী গাভীর মূর্ত্তি ধারণ করতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ক্ষীরাসাগরের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু বাস করেন। তাই ব্রহ্মা, মহাদেবাদি দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া ক্ষীর সাগরের তীরে যাইয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। ভগবান তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণী করেন, কিন্তু তাহা শুনিতে পাইলেন একমাত্র ব্রহ্মা। তিনি অন্যান্য দেবতাগণকে বলিলেন যে তিনি ভগবানের আদেশ বাক্য শুনিয়াছেন। শ্রীভগবান পৃথিবীর দুঃখের কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন এবং তিনি শীঘ্রই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার আদেশ যে, তাঁহার লীলার সহায়তার জন্য দেবগণকে ও তাঁহাদের স্ত্রীগণকে যদুকুলে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহারা যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতেছে এই যে ভগবানের প্রকাশ কোথায় হইতে পারে? জাগতিক গুণ মিশ্রণের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার প্রকাশ কেবল রজঃ তম বিহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বেই। তাঁহাকে পাইতে হইলে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করার জন্য কারাগারে আবদ্ধ হইতে হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ ছয়টী পুত্রকে একে একে বিনাশ করিতে হয়, এই কার্য্যে কংস হেন ক্রূর জনের সাহায্য পাওয়া যায়। এই ছয়টী পুত্রের বধ হইলে "আমি" ও "আমার" এই ভাব অন্তর্হিত হইয়া মন আপনা আপনি অনন্তের দিকে উধাও হইয়া যায় এবং (সপ্তমে) অনন্তদেবের আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবৎ আদেশে শ্রীযোগমায়াদেবী অনন্তদেবকে আকর্ষণ করতঃ অন্যত্র স্থাপন (গোপন) করিলে আবার ঈশ বিমুখ জনের হস্তে প্রপীড়িত হইতে হয়, এমন কি শৃঙ্খলাবদ্ধও হইতে হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই শ্রীভগবান তাহাদের নিকট প্রকাশিত হন। তাই লীলাটী হইল এই যে:—

মথুরাধিপতি কংস (উগ্রসেন তনয়) তাহার ভগ্নী দেবকীকে

জাঁকজমকের সহিত বসুদেবের সঙ্গে বিবাহ দেন। কংস দেবকীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই বিবাহের পরদিন যখন বসুদেব দেবকীকে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে রওনা হন কংস নিজেই সেই রথের সারথি হন। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতে আকাশবাণী হইল "আরে নির্ব্বোধ কংস! যাহাকে আদর করিয়া রথ চালাইতেছ, জান না কি যে তাহারই অষ্টম গর্ভ তোমার বিনাশের কারণ হইবে?" কংস চমকিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবকীকে হত্যা করার জন্য খড়্গ লইয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন। বসুদেব কিছুতেই কংসকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবকীর যখন যে সন্তান হয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে কংসের নিকট উপস্থিত করিয়া দিবেন। বসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সুতরাং কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। কাজেই কংস বিশ্বাস করিয়া দেবকীকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবকীর প্রথম সন্তান (পুত্র) হওয়া মাত্রই বসুদেব তাহাকে কংসের নিকট উপস্থিত করিয়া দিলেন। কংস তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণী অনুযায়ী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহার বিনাশের কারণ হইবে বলিয়া বসুদেবকে ঐ সন্তান লইয়া বাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন। দেবর্ষি নারদ দেখিলেন যে কংস শান্তভাব ধারণ করিলে তো ভগবান শীঘ্র আবির্ভূত হইবেন না, আর ভগবানের দর্শন না পাইলে ভক্তগণই বা কি করিয়া জীবন ধারণ করে? বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার হইলেই ভগবানকে শীঘ্র আসিতে হইবে, তাই, নারদ কংসকে শুনাইয়া দিয়া আসিলেন যে তিনি ব্রহ্মার সভায় যাইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে সেই সভায় কংসের বিনাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আরও বলিয়া আসিলেন যে বসুদেব দেবকী এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সকলেই দেবতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা সকলেই কংসের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছেন। কংস তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদের প্রথম পুত্রটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐরূপভাবে দেবকীর ছয়টী পুত্র কংসের হস্তে বিনষ্ট হইল। সপ্তমে অনন্তদেব

দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। তিনি অনন্ত প্রকারে ভগবানের পরিচর্য্যা করেন বলিয়া তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, পাদুকা প্রভৃতি লইয়া চিরকাল ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের আসন পাতিয়া না দিলে তিনি বসিবেন কোথায়? তাই, অনন্তদেবের আবির্ভাব। সুতরাং শ্রীভগবানের আদেশে শ্রীযোগমায়াদেবী দেবকীর সপ্তম মাসের গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। রাত্রিকালে এই গর্ভ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন রোহিণী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন যেন তাঁহার উদরে গর্ভ আবির্ভূত হইয়াছে। এ সকলই কৃষ্ণলীলার সহায় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়ার কার্য্য। কেহ কেহ বলিল বুঝি ভয়েই দেবকীর গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল যে বুঝি কংসই ঔষধ দ্বারা গর্ভ নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কংসের মনে বসুদেব ও দেবকীর উপর ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কারাগারের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং তাঁহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা অটল অচল এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে আবিষ্ট। তখন ভক্তের অভয়-দাতা ভগবান শ্রীযোগমায়াদেবীকে ডাকিয়া যশোদা দেবীর গর্ভে প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়া তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত বসুদেবের মনে আবির্ভূত হন এবং বসুদেব আপন হৃদয়ের ধন শুদ্ধসত্ত্বা দেবকীর হৃদয়ে সঞ্চার করেন। তখনই তাঁহার গর্ভের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বসুদেব ও দেবকী উভয়েরই হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রাকৃত পুরুষ স্ত্রীর মিলনে যেরূপ মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, ভগবান সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন না। আবির্ভাব-লীলা প্রকট করেন মাত্র। তিনি অজ (জন্ম রহিত) ইহা দেখাইবার জন্যই এই লীলাটী। শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেবকী দেবী অতিশয় শোভন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহার শরীর হইতে অপূর্ব্ব তেজ বাহির হইয়া কারাগার আলোকিত করিয়া ফেলিল। কংস ভাবিলেন যে, দেবকীর এতগুলি সন্তান হইল কিন্তু আহার কি অন্য কোন গর্ভিণীর শরীর তো তিনি কোন দিন এরূপ

উজ্জ্বল প্রভাময় দেখেন নাই। নিশ্চয়ই এইবার তাঁহার কালান্তক যম দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কারাগারের দ্বারে ডবল তালা এবং ডবল পাহারার বন্দোবস্ত করতঃ এক প্রস্থ চাবি তাঁহার নিজের নিকটেই রাখিয়া দিলেন। কিন্তু ভয় আর কিছুতেই যায় না। "এইবার আমার যম আসিতেছে" বলিয়া স্বপ্নের মধ্যেও চমকিয়া উঠিতেন। যথাকালে গভীর নিশীথে কংসের কারাগারে দেবকী দেবীর গর্ভ হইতে শ্রীভগবান আবির্ভাব-লীলা প্রকট করিলেন। তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁহাকে ভগবান বোধে স্তব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীভগবদিচ্ছায় গোকুলে যশোদা দেবীর গর্ভ হইতে যোগমায়াদেবী আবির্ভাব-লীলা প্রকট করেন। প্রসব হওয়া মাত্র সূতিকাগারে উপস্থিত থাকা সকলেই যোগমায়ার প্রভাবে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। যশোদা দেবীও এই মাত্র অনুভব করিলেন যে তিনি একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়ায় জানিতে পারিলেন না যে কি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এদিকে পিতামাতা পুত্রের নিকট করযোড়ে স্তব করে দেখিয়া শ্রীভগবান সুখী হইতে পারিলেন না। "স্তব"—"স্তব"—কেবলই "স্তব"। স্তব স্তুতি তো জগতের বহু লোকই তাঁহাকে করেন, কিন্তু তিনি যে খাঁটি প্রেম-বস্তুর জন্য পাগল তাহা তাঁহাদের নিকট পাইলেন না। তাই তাঁহারই ইচ্ছায় দেবকী দেবী স্তবের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন "আপনার এই অলৌকিক রূপ লুকাইয়া রাখুন, হে মধুসূদন! আমার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে, পাপী কংস যেন ইহা না জানিতে পারে। তাহা হইলে সে আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।" শ্রীভগবান মাতাপিতার সমক্ষেই সামান্য শিশুরূপে পরিণত হইলেন এবং বলিলেন "তুমি ঠিকই বলিয়াছ যে আমাকে লুকাইয়া রাখা দরকার। গোকুলে যশোদা দেবী এই মাত্র একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন এবং তথায় সকলেই নিদ্রায় মগ্ন, আমাকে সেইখানে রাখিয়া সেই কন্যাটিকে এইখানে আনিয়া রাখ।" বসুদেব বলিলেন "কি করিয়া যাব? হাত পা যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।"

ভগবান বলিলেন—"যাঁহার কৃপায় লোকের ভববন্ধন ক্ষয় হয় তাঁহার ইচ্ছায় এই সামান্য লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না ?" বসুদেব লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করতঃ হস্ত পদ নাড়া দেওয়া মাত্র শৃঙ্খল টুটিয়া গেল। বুকে চাপা দেওয়া পাথর শোলার মত হাল্‌কা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বসুদেব ভগবানকে কোলে করিয়া কারাগারের ডবল তালাবদ্ধ লৌহ কপাটে হস্ত স্পর্শ করা মাত্র কপাট খুলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন প্রহরিগণ এতদূর গাঢ় নিদ্রাভিভূত যে তাহাদের নাক ডাকিতেছে। এমন কি যোগমায়ার প্রভাবে মথুরানগরীর সমস্ত লোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। যেন কেহই ভগবানের গতিবিধি দর্শন করিতে না পারে। ধর্ম্মের গ্লানিরূপ দুর্যোগের মধ্যেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। তাই, ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মেঘ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল আর সেবা বিগ্রহ শ্রীঅনন্তদেবও ফণা বিস্তার করতঃ জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বসুদেব কিংবা শিশুটীর শরীরে এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতে পারিল না; কিন্তু বসুদেব যমুনার তটে যাইয়া দেখেন যে, একে ঘোর কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী, দুই প্রহর রাত্রি, তাহার উপর আবার অবিরত ধারা বর্ষণে যমুনা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অগাধ জল, চঞ্চল তরঙ্গ, ভয়ানক আবর্ত্ত, কিরূপে পার হইবেন ভাবিয়াই বসুদেব অস্থির। ঐশ্বর্য্যময় জগৎ (মথুরা) হইতে প্রেমময় জগতে (গোকুলে) পৌঁছিতে তো প্রকৃতপক্ষেই এইরূপ একটী বিশাল তরঙ্গযুক্ত নদী পার হইতে হয়। কিন্তু তাহা পার হইবার জন্যও একটী সঙ্কীর্ণ পথ আছে, ইহা দেখাইবার জন্যই স্বয়ং পার্ব্বতী দেবী শিবারূপে হাটিয়া নদিটি পার হইয়া গেলেন। তখন বসুদেবও ভগবানকে কোলে করিয়া সেই পথের অনুসরণ করতঃ হাটিয়া চলিলেন। সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পর মথুরার সন্নিকটেই শ্রীযমুনাকে কৃপা করার জন্য ভগবান বসুদেবের কোল হইতে পিছলিয়া যমুনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। বসুদেব বহু তল্লাসের পর শিশুটীকে গোকুলের পারের নিকট যমুনার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় পাইয়া আনন্দে

অভিভূত হইয়া তীরে উঠিলেন। মথুরার মালিক ঐশ্বর্য্যশালী চতুর্ভুজ ভগবান প্রেমের জগৎ গোকুলে যাইতে পারেন না। তাই, গোকুলের মালিক দ্বিভুজ মুরলীধররূপে গোকুলে প্রবেশ করার জন্যই এই লীলার অবতারণা। বসুদেব গোকুলে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে যোগমায়া প্রভাবে মথুরার ন্যায় গোকুলের সমস্ত লোকও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত এবং সমস্ত গোকুল নগরীটি নীরব নিস্তব্ধ। শ্রীনন্দ মহারাজের বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া "সই" "সই" বলিয়া যশোদা দেবীকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কার ডাক কে শুনে? সূতিকাগারে যাইয়া দেখেন যে সেখানেও মা যশোদা প্রভৃতি সকলেই নিদ্রিত, কেবল তাঁহার কোলে সদ্যোজাত একটী অপ্রাকৃত কন্যা "কুং কুং" করিয়া চাহিতেছেন। বসুদেব ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুটীকে যশোদা দেবীর নিকট স্থাপন করতঃ কন্যাটিকে নিয়া চলিয়া আসিলেন। এই প্রকারেই অপ্রাকৃত বাৎসল্যের আবির্ভাব হয়।

কন্যাটিকে নিয়া কংস-কারাগারে পৌছিবা মাত্র বসুদেব পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন এবং কন্যাটি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করায় প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। একজন দৌড়াইয়া কংসের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল যে দেবকী সন্তান প্রসব করিয়াছে। কংস দৌড়াইয়া কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কপাটের তালার এক প্রস্থ চাবী তাঁহারই নিকট ছিল। তিনি কপাট খুলিয়া দেখিলেন যে কন্যা জন্মিয়াছে। এই কন্যা তাহাকে কি করিয়া বিনাশ করিবে? তিনি ভুল দৈববাণী শুনিয়া প্রাণাধিক ভগ্নী দেবকীর ছয় ছয়টী পুত্র বিনাশ করিয়াছেন ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাঁহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবকী অত্যন্ত বিলাপ সহকারে ঐ কন্যাকে রক্ষা করার জন্য কংসের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করায় কংসের মন আবার খারাপ হইয়া গেল। কি জানি যদি এই কন্যাটিই পাছে তাহার বধের কারণ হয়! এবং এতগুলি পুত্র যখন মারিয়াছেন, তখন আর ঐ কন্যাটিকে রাখিয়াই বা ফল কি ইত্যাদি ভাবিয়া কংস জোর করিয়া দেবকীর কোল হইতে

কন্যাটিকে কাড়িয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করা মাত্র তিনি তাহার হস্ত হইতে আকাশে উত্থিত হইয়া মনোহর অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ "রে দুর্ম্মতে, আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে? তোকে যিনি বধ করিবেন তিনি পূর্ব্বেই কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে আর বধ করিস না" এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। কংস বিস্মিত হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার কৃত কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ চলিয়া গেলেন।

প্রত্যূষে রোহিণী দেবী গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে যশোদা দেবী একটী অপ্রাকৃত পুত্র প্রসব করিয়া ঘুমাইয়া আছেন। পুত্রটীর অপরূপ রূপ দেখিয়া রোহিণী দেবী আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ যশোদা দেবীকে এবং পুরস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া উঠাইলেন। সমস্ত গোপ গোপীগণ নিমন্ত্রিত হইলেন এবং সমস্ত-দিন ব্যাপী একটী উৎসব হইল। তাহার নাম হ'চ্ছে—নন্দোৎসব। যাঁহারা নন্দের নিজ জন এবং কিঙ্কর তাঁহারাই এই উৎসব দেখিতে পান আর বিশ্বস্ত কিঙ্কর হইলে গোপালকে কোলেও নিতে পারেন। উক্ত সূতিকাগারে এখন একখানা দোলা টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে। যাত্রিগণ তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্রজবাসী পাণ্ডা হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে ঐ দোলা দুলাইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার উপদেশ মত যাত্রিগণ উহার অনুকরণ করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যান।

এদিকে কংস ঘুম হইতে উঠিয়া অনুচরগণকে ডাকিয়া সভা করতঃ পূর্ব্ব রাত্রের যোগমায়ার কথাগুলি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে মথুরা এবং ব্রজে গত দশ দিনের মধ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কংসের শত্রুও নিহত হইবে।

পূতনা-মোক্ষণ

তদনুযায়ী পূতনা রাক্ষসী অপরাপর অনেক শিশু বধ করিয়া একটী পাখীর মূর্ত্তিতে 'উড়িয়া নন্দ মহারাজের গৃহের নিকট নামিল। তৎপর একটী সুন্দর রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মা যশোদাকে "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করতঃ শিশুটীর বিছানার নিকট যাইয়া মাতার ন্যায় বাৎসল্য দেখাইয়া শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইল। যশোদা এবং রোহিণী দেবী একটী অপরিচিতা রমণীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। কিন্তু গোপাল তো সবই দেখিতেছেন—সবই বুঝিতেছেন! পাছে তাঁহার কোন কার্য্যে যশোদা দেবীর অপ্রাকৃত বাৎসল্য ভাব কোন মতে শিথিল হইয়া যায় তজ্জন্য তিনি শান্ত-শিষ্ট শিশুটীর মত চুপ করিয়া রহিলেন। রাক্ষসী গোপালের মুখে বিষ মাখা স্তন দিল। ছয় দিনের বালক এমনভাবে স্তন্য শোষণ আরম্ভ করিলেন যে পূতনার প্রাণান্ত উপস্থিত। "ওরে ছাড়-ছাড়" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে শিশুর মুখ নিজ স্তন হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় ঘরের বাহিরে আসিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভূমিতে নিপতিত হইল এবং তাহার শরীরের চাপে তথাকার সমস্ত বৃক্ষও চুরমার হইয়া গেল। গোপাল কিন্তু তাহার বুকের উপরই বসিয়া আছেন, মা যশোদা তৎক্ষণাৎ গোপালকে টানিয়া নামাইয়া আনিয়া তাহার রক্ষা-বন্ধন রচনা করিয়া দিলেন। গোপালের ঐশ্বর্য্যের দিকে তাঁহার অণুমাত্র দৃষ্টি পড়িতে পারিল না। অপ্রাকৃত বাৎসল্যের এমনই প্রভাব। আবার দেখুন—পূতনা মাতার বেশ অনুকরণ করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও পুত্রের মত তাহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই অপার করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় এইরূপ দুষ্টস্বভাবা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া আসিয়া বিষ মাখা স্তন মুখে তুলিয়া দিয়াও মায়ের গতি লাভ করতঃ শ্রীভগবানের নিজের ধামে স্থান পাইয়াছিলেন। সুতরাং ভালবাসিয়া ভাল জিনিস তাঁহার মুখে দিতে পারিলে যে তাহার ভাগ্যে কি লাভ হয় তদ্বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

শকটাসুর বধ

বালক কৃষ্ণের তিন মাস বয়স অতিক্রম করার পর একদিন তাঁহার জন্ম নক্ষত্র যোগ উপস্থিত হওয়ায় তদুপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। নন্দের বাড়ী লোকে লোকাকীর্ণ। লালার (মা যশোদা গোপালকে প্রায়ই "লালা" বলিয়া ডাকিতেন) নিদ্রাবেশ হইয়াছে। তাঁহাকে গৃহ মধ্যে শয়ন করাইলে গোলমালে তাঁহার নিদ্রা হইবে না আশঙ্কায় মা যশোদা তাঁহাকে প্রাঙ্গণে ঝুলান একটী সুবৃহৎ শকটের নিম্নে চতুর্দ্দোলার মধ্যে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন। সকলে যখন উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত তখন কংস-প্রেরিত একটা অসুর গোপালকে গাড়ীর সহিত চাপিয়া হত্যা করার অভিপ্রায়ে ঐ শকটের উপর আসিয়া চাপিয়া বসিল। অসুরের ভারে গাড়ীর চাকা মাটীর মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন গোপাল এমনভাবে পদ আস্ফালন করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে সেই সুকোমল চরণের আস্ফালনে শকটখানি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উল্টিয়া পড়িয়া গেল। শকটাসুর লোকের অগোচরে আসিয়া শকটের নীচে চাপা পড়িয়া নিজেই লোকের অগোচরে মরিয়া গেল।

নাম-করণ লীলা

নন্দ-নন্দন রাম-কৃষ্ণের নাম-করণের সময় উপস্থিত হওয়ায় উপরোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই বসুদেব কুলপুরোহিত গর্গ মুনিকে ডাকিয়া পুত্র পরিবর্ত্তনের কথা অকপটে খুলিয়া বলিলেন ও তাঁহাকে ব্রজে যাইয়া উভয় পুত্রের নাম-করণ করার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তদনুযায়ী গর্গ মুনি নন্দ মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনিও প্রকাশ করিলেন যে মুনিবর দ্বারাই রাম-কৃষ্ণের নাম-করণ হওয়া তাঁহার একান্ত অভিলাষ। কিন্তু যদু-কুলের পুরোহিত গর্গ মুনি প্রকাশ্যভাবে নন্দ-নন্দনের সংস্কার করিলে লোকে

নানারূপ ভাবিবে এবং কংসও নানারূপ অত্যাচার করিতে পারে এই আশঙ্কায় নন্দ মহারাজ ও গর্গ মুনি উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে কাজটী গোপনে করিলেই ভাল হয়। তাই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবানের নাম-করণ হইল গোপনে গোয়ালা বাড়ীর গোয়াল ঘরে।

"কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।"

যে কৃষ্ণ নাম মানুষ মাত্রকেই উদ্ধার করিতে সক্ষম সেই কৃষ্ণ নামের জন্ম হইল কিনা গোপনে গোয়ালার গোয়াল ঘরে! কেন? এই চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডলে আর কি কোন স্থান ছিল না? বলিহারি যাই তোমার প্রেম বশ্যতা!

তৃণাবর্ত্ত বধ

গোপালের বয়স এক বৎসর হইয়াছে। জন্মতিথি উপলক্ষে বাড়ী ভরা লোক। মা যশোদা গোপালকে কোলে লইয়া আদর করিতেছেন। এমন সময় কংস প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া গোপালকে ঝড়ের মধ্যে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া যাইবার মতলব আটিয়া একটী ঘূর্ণীবায়ুর মত হইয়া অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া আসিল। প্রবল ঝড়ে ধূলি উড়াইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল, এবং অন্ধকারের মধ্যে গোপালকে ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল। কিছুকাল পরে ঝড় থামিয়া গেল—অন্ধকার দূর হইয়া গেল কিন্তু গোপাল নাই। সকলেই "হায়" "হায়" করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি উচ্চ স্থান হইতে ফেলিয়া দিলেই গোপাল নিশ্চয়ই মারা যাইবেন মনে করিয়া তৃণাবর্ত্ত তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিল। গোপালও যেন নীচে পড়িয়া যাইবার ভয়েই তৃণাবর্ত্তের গলা এমন জোরের সহিত জড়াইয়া ধরিলেন এবং পাথরের মত এমন ভারী হইয়া উঠিলেন যে শ্বাসরোধ হইয়া আকাশেই অসুরের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তাহার বিশাল দেহ গোকুলের প্রাঙ্গণে পতিত হইল। গোপাল কিন্তু অসুরের বুকের উপর বসিয়া নিঃসঙ্কোচেই খেলা করিতেছিলেন। মা যশোদা বরাবরই ভাবিতেছেন যে তাঁহার কাত্যায়নীই গোপালকে রক্ষা

করিতেছেন এবং তজ্জন্যই মা যশোদা কর্তৃক কাত্যায়নী পূজা, তাঁহার নির্ম্মাল্য গোপালের শিরে দেওয়া, ভগবানের বিশেষ বিশেষ নামে গোপালের শরীরে সেই সেই দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করা প্রভৃতি, ইতিপূর্ব্বে পূতনা-মোক্ষণ এবং শকটাসুর বধের সময় যেরূপ হইয়াছিল এইবারেও ঠিক সেইরূপই হইল। বাৎসল্যে বুক ভরা মা যশোদা কখন ভাবিতে পারেন নাই যে এই সব কার্য্যে তাঁহার দুধের ছেলের বিন্দু মাত্রও হাত থাকিতে পারে!

মৃদ্ভক্ষণ লীলা

মা যশোদা দধি মন্থন করিতেছেন; বলরাম শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ খেলার সময় অনেক মাটী খাইয়া ফেলিয়াছে। মা যশোদা মনে মনে ভাবিলেন "সর্ব্বনাশ, মাটী খাইলে হাতী পর্য্যন্ত পাগল হইয়া যায়, এখন উপায়!" তিনি দৌড়াইয়া যাইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি মাটী খাইয়াছ?" শান্তশিষ্ট ছেলেটীর মত তিনি উত্তর করিলেন "না মা, আমি তো মাটী খাই নাই।" মা যশোদার কি সাধ্য আছে যে তিনি তাঁহার লালার কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন? তাই, বলরাম প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমরা আমার লালার নামে মিথ্যা কথা বলিতেছ?" কৃষ্ণ সুবিধা পাইয়া বলিতে লাগিলেন "মা, এরা সর্ব্বদাই আমার নামে এই রকম মিথ্যা কথা বলে। আচ্ছা মা! মাটী খাইলে আমার মুখে কি মাটীর একটু চিহ্নও থাকিবে না?" যশোদা মা বলিলেন, "আচ্ছা, হাঁ কর দেখি।" গোপাল তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করায় মা যশোদা তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর মুখ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে তাহার মুখ-গহ্বরে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, পর্ব্বত, সাগর, পৃথিবী, মথুরামণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ব্রজগোকুল প্রভৃতি এবং পুত্রের হাত ধরিয়া যশোদা দেবী স্বয়ং তথায় বিরাজিত। মা যশোদা বাৎসল্য প্রেমের অভিনব তরঙ্গে বলিয়া

উঠিলেন "একি! আমার গোপালের মুখে কি দেখিতেছি? বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম তোরা কে কোথায় আছিস্ শীগ্‌গির আয়—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাক্—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্।" সকলেই জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসম সখা অর্জ্জুনকে "বিশ্বরূপ" দেখাইলে তিনি ভীত হইয়া কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"সম্বর—সম্বর তোমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়া কি অপরাধই করিয়াছি তোমাকে আমার রথের সারথি করিয়াছি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।" যশোদা-মার নিকট কিন্তু সর্ব্বদা গোপাল "গোপাল"ই রহিয়াছেন। কোনরূপ ঐশ্বর্য্যেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

এই মৃদ্ভক্ষণ স্থানটী এখন "ব্রহ্মাণ্ড ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং এখনও এখানে "মাখন-মাটী" পাওয়া যায়। তথা হইতে একাধিক বার ঐ মাটী আনিয়া অঙ্গে ধারণ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। সেই 'ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে' স্নান করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে তাঁহারাই বলিতে পারেন।

দাম বন্ধন-লীলা

শ্রীকৃষ্ণের বয়স তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস। যশোদা মা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর হইতে নামিয়া যশোদা মা তাঁহার লালার মাখন প্রস্তুত জন্য দধি মন্থন কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন। বাড়ীতে সহস্র সহস্র দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতেই গোপালের খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। অতি নিকটে হইলে মন্থন শব্দে লালার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, আবার অতিদূরে হইলেও লালা জাগিয়া যদি ক্রন্দন করে তবে তাহা তিনি শুনিতে পাইবেন না। এই আশঙ্কায় অনতিদূরেই মন্থনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। দধি মন্থন করিতে করিতে মা যশোদা গুণ গুণ রবে কৃষ্ণলীলা গান করিতেছিলেন। স্থূলকায়া, তাই শরীর হইতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। দধি হইতে আজ বড়

চমৎকার মাখন বাহির হইতেছে, গোপাল এই মাখন খাইয়া যে কি আনন্দ পাইবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে মায়ের স্নেহধারা ক্ষীরধারা রূপে পরিণত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ গোপালের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মাকে বিছানায় না পাইয়া মা যে গুণ গুণ রবে কৃষ্ণলীলা গান করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া মার নিকট যাইয়াই মন্থন দণ্ডটী চাপিয়া ধরিলেন। তখন আর উপায় কি, মন্থন কার্য্য বন্ধ রাখিয়া মা গোপালকে কোলে তুলিয়া লইলেন আর গোপাল আনন্দের সহিত মাতৃস্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দ মহারাজের নব লক্ষ ধেনু থাকা স্বত্ত্বেও যে কয়েকটী পদ্মগন্ধা গাভী ছিল মাত্র তাহাদের দুগ্ধ দ্বারাই গোপালের খাবার প্রস্তুত হইত। ঐ দুগ্ধ চুল্লির উপর জ্বাল দেওয়া হইতেছিল। উহা উথলিত হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করায় মা বলিলেন "লালা, তুমি কোল হইতে নাম; আমি উনানের উপর থেকে দুগ্ধ নামাইয়া আসিয়া আবার তোমাকে স্তন দিব"। গোপাল তাহার পেট ভরে নাই বলিয়া কিছুতেই কোল ছাড়িতে চাহিলেন না, প্রাতঃকালের ক্ষুধা কি না! "তুই কিছুই বুঝিস্ না—ঐ দুধ নষ্ট হইয়া গেলে আমি তোকে কি খাওয়াব" ইত্যাদি বলিয়া মা গোপালকে জোর করিয়া কোল হইতে নামাইয়া দিয়া দুগ্ধ রক্ষা করার জন্য চলিয়া গেলেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী—অন্তর্য্যামী ভগবান আজ যশোদা মার বাৎসল্যের নিকট অবোধ অজ্ঞ শিশুরূপে পরিণত। 'আমা হইতেও দুধের উপর মায়ের টান বেশী ভাবিয়া গোপাল চটিয়া গেলেন এবং স্থির করিলেন যে মাকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই তিনি মা'র অতি প্রিয় দধি ভাণ্ডের নিম্ন ভাগে একটী পাথরের টুকরা দ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছিদ্রপথে ঘোল গড়াইয়া সমস্ত আঙ্গিনা ভাসাইয়া দিল। গোপাল ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ কি করিয়াছি? আজ মা'র হাতে আর রক্ষা নাই।" তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ীর শেষ প্রান্তের নবনীত গৃহে প্রবেশ করতঃ দরজা ভেজাইয়া দিলেন। গোপাল পেট ভরিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে পারেন নাই। তাই

ঐ ঘরের দেওয়ালে বহু শিকায় নবনীত পূর্ণ ভাণ্ড এবং একটী বানর ঐ ভাণ্ডের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়াই তাঁহার মজ্জাগত চৌর্য্যবৃত্তিটী জাগ্রত হইয়া উঠিল।

[তাহা না হইবেই বা কেন? তাঁহার জন্মই একটা বৃহৎ চুরি! কোথায় আবির্ভাব; আর কোথায় কার ঘরে আসিয়া পুত্রত্বের ষোল আনা অধিকার! তিনি ব্রজদেবীদের ঘরে ননী চুরি করিয়াছেন—তাহাদের মন চুরি করিয়াছেন—সহস্র সহস্র জীবের মন চুরি করিতেছেন। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন তিনি 'চোর জার শিখামণি।" কিন্তু আমার কিছু চুরি করিতে পারেন নাই। আমার মন আমি কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতিতে চিরস্থায়ী মৌরুসী পাট্টা করিয়া দিয়া পাকা পোক্ত হইয়া বসিয়া আছি।]

ঘরের মধ্যে একটী উদূখল উল্টা ভাবে রহিয়াছিল। গোপাল তাহার উপর দাঁড়াইয়া একটী ভাণ্ড শিকা হইতে নামাইয়া একবার নিজ মুখে আর একবার গবাক্ষ দিয়া বানরের মুখে নবনীত দিতে আরম্ভ করিলেন, আর মা'র নিকট ধরা পড়িবার ভয়ে মধ্যে মধ্যে পিছনের (দরজার) দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

মা দুগ্ধ রক্ষা করতঃ ফিরিয়া আসিয়া দধিভাণ্ড এবং আঙ্গিনার অবস্থা দেখিয়া আমাদের ন্যায় মানুষের মত হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন না। এই কর্ম্ম নিশ্চয়ই গোপালের কিন্তু আমার গোপালের তো বুদ্ধি আছে! মন্থন ভাণ্ডের উপরিভাগ স্থুল ও দৃঢ় সেখানে আঘাত করিলে হয় তো ভাণ্ড ভাঙ্গিবে না এবং বেশী শব্দ হইবে বলিয়া আমার কাণেও পৌছিতে পারে তজ্জন্যই গোপাল ভাণ্ডের নীচের পাতলা অংশে আঘাত দিয়া ভাঙ্গিয়াছে এই সমস্ত ভাবিয়া প্রথমে মা একটু হাসিলেন, তৎপর ভাবিলেন যে গোপাল যে অন্যায় কাজ করিয়াছে তজ্জন্য তো তাহাকে শাসন করা চাই! যশোদ মা তৎক্ষণাৎ গোপালের খেলার রঙ্গীন বস্ত্র নির্ম্মিত এক হাত পরিমাণ একখানা যষ্ঠি হস্তে লইয়া নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে ঘোল মাখান পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে

করিতে ঐ গৃহের দরজায় উপস্থিত হওয়া মাত্র মাতার হস্তস্থিত সেই বস্ত্র নির্ম্মিত লাঠিটুকুর ভয়েই ভীত হইয়া গোপাল লাফ দিয়া মাটীতে পড়িয়া মায়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া দৌড়াইয়া বহির্ব্বাটীতে পৌছিয়া একটু থামিলেন। ভাবিলেন যে সেখানে পুরুষগণ থাকেন কাজেই মা সেখানে যাইতে পারিবেন না, কিন্তু সেখানে তখন লোকজন বেশী ছিল না। প্রায় সকলেই অন্যত্র গিয়াছিলেন। গোপালকে তো ধরাই চাই। তাই মা পাছে পাছে ছুটিয়া বহির্বাটীতে যাইয়াই গোপালকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা গোপালের হাত ধরিয়া ডান হাতে লাঠি লইয়া গোপালকে শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল আবার ভীত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কত কি কৈফিয়ত দিলেন—তিনি দধির ভাণ্ড ভাঙ্গেন নাই—তাড়াতাড়ি যাইতে মায়ের পায়ে লাগিয়াই উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বানরগুলি চুরি করিয়া খাইবার জন্য ঘরে প্রবেশ করায় তিনি উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন এবং মায়ের ভয়েই তিনি পলাইবার জন্য দৌড় দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। গোপাল অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন দেখিয়া বাৎসল্যময়ী জননীর প্রাণ অমনি গলিয়া গেল, লাঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং স্থির করিলেন যে আর এরূপ কার্য্য না করে তজ্জন্য গোপালকে বাঁধিয়া রাখিবেন। তিনি নিজের খোপার 'ডোরী' লইলেন তাহাতে কুলাইল না। গোলমালে অনেক ব্রজ-মা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের খোপার ডোরী লইলেন তাহাতেও কুলাইল না। বাছুরের গলার রেশমী দড়ি লইলেন কিন্তু প্রত্যেক বারই দুই আঙ্গুল করিয়া ডোরী কম পড়িয়া গেল। গোপালকে বাঁধা কি সোজা কথা? অবশেষে মা যখন নিতান্তই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখনই সেই বিশ্বপতির কৃপা হইল এবং তিনি মায়ের হস্তে বাঁধা পড়িলেন। দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে "দামোদর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানে একবার নয়, দুইবার নয়, চারি চারি বার শ্রীকৃষ্ণ যশোদা-মা'র ভয়ে **"ভীত"** হইয়াছেন এই শব্দটী উল্লেখ করিয়াছেন। ভীত হইয়াছেন কে ?

"যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিঃ মৃত্যুর্ধাবতি যদ্ভয়াৎ॥"

একটু ভাবিবার বিষয়ই বটে! ধরুন, আমি ব্রাহ্মণ, আমি আমার একটী বৈদ্য ও একটী কায়স্থ বন্ধু লইয়া অপর এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। অপর কোন লোক নিমন্ত্রিত হয় নাই। তত্রাপি, আমি যদি যাইয়া দেখি যে তিন বন্ধুর খাইবার জন্য আসন একস্থানে দিয়াছেন তখন আমি কি বলি না যে, আমার আসনটা একটু পৃথক করিয়া দিলেই হইত? কেন? আমার গলায় যে সূতা আছে,—ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান আছে। অপ্রকাশ্যভাবে বন্ধুর বাড়ীতেই বা ছোট হইতে যাইব কেন? আর অত বড় ভগবান সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ কিনা একটী ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্র জীবের (যশোদা দেবীর) ভয়ে **ভীত** হইয়া এবং বাঁধা পড়িয়া ব্রজের শত শত নারীর সমক্ষে এইরূপ ছোট হইয়া গেলেন। আর শ্রীল শুকদেব গোস্বামীই কি শ্রীল পরিক্ষিত মহারাজের নিকট সহস্র সহস্র মুনি ঋষি-পরিবৃত এত বড় একটা বিরাট সভার মধ্যে তাঁহার নিজের ইষ্টদেবকে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ ছোট করিয়াছেন?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোধ হয় বুঝিতে পারা যায় যে এই দাম-বন্ধন লীলাটী শ্রীভগবানের ভক্ত-বশ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এবং এই লীলাটী জীবকে স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিতেছেন যে ভগবান মোটেই অলভ্য নহেন বরং সুখ-লভ্য। তিনি ধরা দেন—তিনি বাঁধা পড়েন—নিজেকে ভুলিয়া যান এবং সর্ব্বভয়ের ভয় হইয়াও ক্ষুদ্র জীবের নিকট **ভীত** হন। সুতরাং আমাদের হতাশ হওয়ার কোনই কারণ নাই। জ্ঞান, কর্ম্ম কি যোগের পথের বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং ঐ সব কোন পথে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমার জানা নাই।

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন

একদা কুবের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব বারাঙ্গনাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মদ্যপান করতঃ মাতাল হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় কৈলাসের নিকটবর্ত্তী মন্দাকিনীর জলে আনন্দ করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ ঐ পথে আসিতেছেন দেখিয়া বারাঙ্গনাগণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় পরিল, কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব বেহেড্ মাতাল হইয়া পড়ায় তাঁহারা মহর্ষিকে গ্রাহ্য করিলেন না। উলঙ্গ অবস্থাতেই নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহর্ষি তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন যে তাহারা যেমন তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া গাছের মতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষ-জন্ম যাপন করিতে হইবে। অবশেষে ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া উহাদের উপর কৃপাবশ হইয়া বলিলেন যে তাহারা দুইজন একত্র শ্রীধাম গোকুল বৃন্দাবনে অর্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া থাকিবে; শ্রীকৃষ্ণ যখন তথায় অবতীর্ণ হইবেন তখন তাঁহার চরণ স্পর্শে তাহাদের মুক্তি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মায়ের হাতে বাঁধা পড়িলেন তখন মাতা বন্ধন দড়ির সঙ্গে লম্বা একটী রজ্জু দিয়া একটী ভারী উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। অদূরেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষ অবস্থিত ছিল। ঐ বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র তাহাদের পূর্ব্ব কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদিত হইল। তাই তিনি উদূখল টানিতে টানিতে ঐ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেই উদূখলটী বাঁকা হইয়া বৃক্ষ দুইটির সঙ্গে আটকাইয়া গেল। একটু টানিতেই গাছ দুইটি মড়মড় শব্দে পড়িয়া গেল এবং উহাদের মধ্য হইতে সুন্দর মূর্ত্তি দুই পুরুষ (নলকুবর ও মণিগ্রীব) বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানারূপ স্তব করতঃ মুক্ত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী বালকগণ যদিও বলিয়াছিল যে গোপালই গাছ দুইটিকে টানিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু নন্দ-যশোদা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে তাহাদের দুধের বালক দ্বারা এইরূপ একটী কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে।

নন্দ মহারাজ তাড়াতাড়ি বন্ধন খুলিয়া দিয়া দুলালকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন। মা যশোদা তাঁহার এই কার্য্যের জন্য একটু লজ্জিতা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রীতির টানে কিছু কালের মধ্যেই সব ঠিক হইয়া গেল।

গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ

ইন্দ্র দেবতাগণের রাজা। তাই নন্দ মহারাজ প্রতি বৎসর ইন্দ্র পূজা করিতেন। যথা সময়ে ইন্দ্র পূজার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। গোপাল তাঁহার পিতা এবং পিতৃব্যগণকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ইন্দ্র আধিকারিক দেবতা, প্রাক্তন খণ্ডন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের চারিদিকে তাহাদের গরুগণ চরিয়া বেড়ায়—তাঁহারই গায়ের ঘাস খাইয়া, তাঁহারই গায়ের ঝরণার জল পান করিয়া এবং তাঁহারই গহ্বরে বিশ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করে। সুতরাং গিরি গোবর্দ্ধন পূজা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কি জানি গোপালের কি কুহকে পড়িয়া সকলেই একমত হইয়া ইন্দ্র পূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন পূজা করতঃ মহাসমারোহে অন্নকূট দিয়াছিলেন এবং সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন যে, গিরিরাজ হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারই আদেশে ব্রজে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল? ব্রজবাসিগণ প্রমাদ গণিলেন এবং তাঁহাদের একমাত্র সম্বল শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ তিনি গিরিরাজকে অনায়াসে বাম হস্তে ধারণ করতঃ তাহার নীচে ব্রজবাসি-গণকে সাতদিন পর্য্যন্ত নিরাপদে রক্ষা করার পর বৃষ্টি কমিয়া গেল। গিরিরাজকে দুইদিন হাতে রাখার পর যশোদা-মা কৃষ্ণের সখাগণকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার দুধের ছেলে এত বড় একটা পাহাড়কে হাতে ধরিয়া আছে সে কি পাহাড়ের চাপে পড়িয়া মরিয়া যাইবে? তোমরা শীগ্‌গির যাইয়া তাহার সাহায্য কর।" সখাগণ তৎক্ষণাৎ যাইয়া নিজ নিজ পাচনি দ্বারা পাহাড় ঠেলিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের ভাই

কানাই-এর সাহায্য করিতেছেন এবং যশোদা মাও ভাবিলেন যে এখন আর তাঁহার গোপালের কোন ভয় নাই।

কথিত আছে যে গোপাল যখন গোচারণে যাইতেন তখন বনে তাঁহার কোন অমঙ্গল না হয় তজ্জন্য মা যশোদা কাত্যায়নী দেবীর নির্ম্মাল্য দ্বারা গোপালকে ভূষিত করিয়া দিতেন। গোপালকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখার জন্য সখাগণকে বিশেষরূপ বলিয়া দিতেন এবং রক্ষা কবচাদি বন্ধন করিয়া দিতেন। অবশেষ নিজের পদধূলি গোপালের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া বলিয়া দিতেন. "তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাতৃস্নেহ লেপন করিয়া দিলাম, দেখি কংস কেন স্বয়ং ভগবানই বা কিরূপে এই মাতৃস্নেহ ভেদ করিয়া তোমার অমঙ্গল করিতে পারেন।" কিন্তু মন আর কিছুতেই সুস্থ হইতে চায় না। তাই গোপাল গোচারণে রওয়ানা হইয়া যাওয়া হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাঁহার মন থাকিত গোপালের প্রতি, যেন কোন মতে তাহার কোন অমঙ্গল না হয়। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় প্রার্থনা করিতেন "এখন গোপালকে একটু ছায়ায় রাখিও, তাহার তাপ শীতল করার জন্য একটু হাওয়া দিও, পিপাসা পাইলে তাহাকে সুশীতল বারি দিও, ইত্যাদি।" আবার গোচারণ হইতে ফিরিয়া আসার বহু পূর্ব্ব হইতেই মঙ্গল আরাত্রিকের সমস্ত জিনিষ পত্র আয়োজন করিয়া নিজেই বাড়ীর সিংহদরজায় বসিয়া থাকিতেন। গোপাল গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র বনে কোন অসুরের সংস্পর্শ কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহার কোন অমঙ্গল না হইতে পারে তজ্জন্য গোপালকে আরাত্রিকাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করতঃ তৎপর তাহাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়া যাইতেন। নন্দগ্রামে নন্দ মহারাজের বাড়ীর পিছনে পাবন সরোবর অবস্থিত। মা যশোদা রাম-কৃষ্ণকে স্নান করাইয়া তীরে রাখিয়া তাহারা অন্যত্র না যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দিয়া নিজে স্নান করার জন্য জলে নামিয়াও ডুব দিতে পারিতেন না, পাছে সেই অবসরে রাম-কৃষ্ণ অন্যত্র যাইয়া কি জলে ডুবিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এই হ'চ্ছে বাৎসল্য ভাব।

শ্রীল পরিক্ষিত মহারাজ শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা দেবী এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহারা এইরূপ ভাবে স্বয়ং ভগবানের পিতামাতা হইয়া বসিয়াছিলেন এবং ভগবান যশোদা দেবীর স্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। গোস্বামীজি তাহাতে বলিয়াছিলেন যে মহারাজের প্রশ্নটী ঠিক হয় নাই। প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল এই যে ভগবান এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি যশোদা ও নন্দের মত অপ্রাকৃত বাৎসল্যে-বুক ভরা মাতা পিতা পাইয়াছিলেন। শ্রীবসুদেব ও দেবকী তাঁহাদের সদ্যোজাত শিশুর হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখিয়াই ভগবৎ বোধে তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার বাৎসল্য বিশ্রম্ভ বাৎসল্য। অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণই বাৎসল্য রস তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রাম করেন। তাই গোপালের এত ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও ক্ষণেকের তরে তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেম শিথিল হয় নাই।

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি **না হই অধীন**॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি **তাহার অধীন**॥

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥"

ব্রজ-সখা

শ্রীদাম, সুদাম, দাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি এই শুদ্ধ সখ্য রসের অধিকারী। রামকৃষ্ণ গোচারণে যাইয়া সর্ব্বদাই সখাগণের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকিতেন। কেহ গান গাইতেন, কেহ বাজাইতেন, কেহ নৃত্য করিতেন। কখনও ছুটাছুটি, কখনও চোখ বাঁধা, কখনও বুড়ি ছোঁয়া খেলা হইত। কখনও সখাগণ দুই ভাগ হইয়া যাইতেন। এক ভাগের রাজা হইতেন বলরাম আর এক ভাগের রাজা স্বয়ং কৃষ্ণ। খেলায় যাঁহারা পরাজিত হইতেন তাঁহাদের অপর দলের এক এক জনকে কাঁধে করিয়া কতকদূর পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। সুতরাং কৃষ্ণেরও রক্ষা ছিল না। জিতিলে কান্ধে চড়িতেন, আবার হারিলে কান্ধে চড়াইতে হইত। তখন যে সখা কৃষ্ণের কান্ধে চড়িতেন তিনি কি করিতেন? কান্ধের উপর হইতে তিনি পড়িয়া না যান তজ্জন্য কৃষ্ণের শরীরের সঙ্গে নিজের পা খুব জোরে চাপিয়া ধরিতেন। আবার দ্রুত না চলিলে ঘোড়ায় চড়ার মত কৃষ্ণের বক্ষের উপর জোরে পদাঘাত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ, গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি বহু অসাধারণ কার্য্য দেখিয়াও তাঁহাদের সখ্য ভাব অণুমাত্র শিথিল হয় নাই। অর্জ্জুনের গৌরব-সখ্য ভাব, তাই তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই চমকিত হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজের সখার বিশ্রম্ভ-সখ্য ভাব, তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে "ভাই কানাই" "রাখাল রাজা ভাই" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতেন। আবার কোন সখা বনে একটী ফল পাইয়া একটু খাইয়াই যদি দেখিতেন যে খুব মিষ্টি তখন তিনি ফলের বাকী সমস্তটুকু রাখিয়া দিতেন ভাই কানাই-এর জন্য। এমন মিষ্টি ফল, তাঁহাকে না খাওয়াইয়া তিনি একা খাইবেন কি করিয়া? তখন আবার অন্যান্য সখাগণ তাহা দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যের অন্ততঃ ৩।৪ জন ঐ ফল একটু একটু চাখিয়া যদি সকলেই সাব্যস্ত করিতেন যে, হাঁ মিষ্টিই বটে; ভাই কানাইকে দেওয়ার উপযুক্ত, তখন বাকীটুকু রাখিয়া দিতেন ভাই কানাই-এর

জন্য ; এবং ভাই কানাই সেই অবশিষ্টাংশ খাইয়া যে কি অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহা একমাত্র তিনিই বুঝিতে সমর্থ। সখাগণ নিজেরা না চাখিয়া কোন জিনিষই ভাই কানাইকে দিতেন না, পাছে কোন খারাপ জিনিষ খাইয়া তিনি কোন আনন্দ না পান কি তাঁহার কোন অনিষ্ট হয়? আছে কি আমাদের সেইরূপ বুকের পাটা? পারি কি আমরা সেইরূপ করিতে? আমরা করি কি! চাখিয়া দেখা ত দূরের কথা, বাজার হইতে ঠাকুরের ভোগের জন্য কোন জিনিষ খরিদ করিয়া আনিলে কিংবা ঘরে কোন ভাল জিনিষ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে যদি ঘরের কোন অবোধ শিশু তাহার এককণাও স্পর্শ করিয়া ফেলে তখন আর আমরা কিছুতেই উহা ঠাকুরের ভোগে দিতে পারি না।

এ হেন সখাদিগকে এবং প্রাণপ্রিয় গাভীগণকেও আক্রমণ করিয়াছিল কালিয় নাগরূপ অভিমান। কালিয় দমন লীলা সকলেই জানেন। যমুনার এক অংশে কালিয় হ্রদ অবস্থিত। তথায় কালিয় নাগ বাস করিতেন। হ্রদের জল এতদূর বিযাক্ত হইয়া গিয়াছিল যে ৩০।৪০ হাত উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলেও বিষের জ্বালায় মরিয়া যাইত। সখারা ও গাভীগণ একদা পিপাসার্ত্ত হইয়া ঐ হ্রদের জল পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাদের উপর শুভ দৃষ্টিপাত করামাত্র সকলেই চেতনা পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া হ্রদের মধ্যে পড়িয়া কালিয়ের ফণায় ফণায় নাচিয়া তাহার গর্ব্ব বিনাশ করতঃ সে এই প্রেমের রাজ্য ব্রজের মধ্যে আর থাকিতে পারিবে না এই কথা বলিয়া তাহাকে রমণক দ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া জীবকে শিক্ষা দিলেন যে ভগবান কাহারও গর্ব্ব সহিতে পারেন না। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের কালিয়ের স্বভাব আছে যদি আমরা তাঁহার শরণাগত হইতে পারি তবে তিনি এইরূপ করিয়াই আমাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দেন।

গোচারণে যাওয়ার সময় প্রত্যেকেরই দুই প্রহরের আহারের জিনিষ সঙ্গে

যাইত। একদিন এক সখার বাড়ী নিমন্ত্রণ হওয়ায় কেহই খাবার জিনিস সঙ্গে লন নাই। বনে সেই সখার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া বলিলেন, "তোমার বাড়ী আমরা কেহই খাব না।" বিশুদ্ধ সখ্য ভাব কি না? তাই, সেই সখাও বলিয়া উঠিলেন "না খাও তো বয়ে যাবে!" বেলা দুই প্রহর অতীত, সকলেই ক্ষুধায় কাতর। নিকটেই বেদ-বাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনা করিয়া দেবযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুযায়ী গোপগণ ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-গণের নিকট কৃষ্ণ-বলরাম এবং তাহাদের জন্য অন্ন যাচ্‌ঞা করিতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। সামান্য স্বর্গাদিতে আশা করিয়া তাঁহারা ঐরূপ ক্লেশকর কর্ম্মই করিতেন এবং আপনাদিগকে বৃথা জ্ঞান-বৃদ্ধ বলিয়াই জানিতেন। তাই, গোপগণকে হাঁ, না, কোনই উত্তর দিলেন না। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া যাইয়া যথাযথ বর্ণন করিলেন। তখন তিনি বলিলেন "যদি অন্ন পাইতে চাও তবে যাঁহারা রাঁধেন সেই দ্বিজপত্নীগণের নিকট যাও।" দ্বিজপত্নীগণের সহজ সরল বিশ্বাস! এই বালকটিই যে স্বয়ং ভগবান্ এই বিশ্বাসে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মন তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়া আছে। গোপগণের নিকট তাঁহার কথা শ্রবণ করা মাত্রই দ্বিজপত্নীগণ স্বামীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করতঃ খাবারের জিনিস পত্র কাঁধে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া কৃষ্ণ বলরাম ও সখাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!" যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর এবং "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার" এই জ্ঞানও তাঁহাদের জন্মে নাই। কাজেই তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীগণ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, গুরুকুলে বাস করেন নাই এবং তপস্যাও করেন নাই। আবার ইঁহাদের শৌচ নাই, সন্ধ্যা বন্দনাদি নাই। তথাপি সহজ সরল বিশ্বাসে এবং দৃঢ়াভক্তি যোগে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া মনের সাধে সেবা করতঃ মানব জন্মের সফলতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই

লীলাটী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ও দৃষ্টান্ত। দ্বিজপত্নীগণ রাম কৃষ্ণ ও তাঁহাদের সখাগনকে এইরূপভাবে আহার করাইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অচল অটল ভাবে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাই সেই স্থানের নাম হইয়াছে "অটল বন" অপর নাম "অন্নস্থালী।"

[কাম্য বনে একটী পাহাড়ের উপর সখাগণসহ গোচারণে যাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র সুমধুর বংশী ধ্বনি করায় পাহাড়ের ঐ অংশ গলিয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য তথায় যে তাঁহাদের পদচিহ্ন হইয়াছিল সেই পদচিহ্ন এবং একস্থানে হাটু গাড়িয়া বসার মত একটী গভীর চিহ্ন এই লীলার সাক্ষী স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদবধি ঐ স্থান "চরণ পাহড়ি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে]।

ব্রজেশ্বরী ও ব্রজদেবীগণ

ভজন দুই প্রকার বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। বিধিমার্গের ভজন ঐশ্বর্য্যময় অথবা ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত মাধুর্য্যময় এবং তাহাদের সম্বন্ধ বৈকুণ্ঠ দ্বারকা প্রভৃতি ধামের সঙ্গে। রাগমার্গের ভজন শুদ্ধ মাধুর্য্যময় এবং তাহাদের সম্বন্ধ ব্রজের সঙ্গে। সর্ব্বৈশ্বর্য্য এবং সর্ব্বমাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইতে হইলে রাগমার্গে ভজন করিতে হইবে।

"রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ দাস্য সখ্য বাৎসল্য বা মধুর এই চারি ভাবের যে কোন ভাবে ভজন করা যায় সেই ভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহু ত আছয়॥

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তার-তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাঢ়ে প্রতি-রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ চঃ)

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী ভাবের অর্থাৎ রসের মধ্যে শান্ত রসে সম্বন্ধ জ্ঞান নাই। কেবল রূপ দেখিয়া গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া। যেমন "পূর্ণচন্দ্র দেখিতে বেশ, এবং তাহার সুশীতল কিরণ বেশ; কিন্তু "আমার চন্দ্র" একথা বলিতে কেহ সাহস পান না এবং অবোধ শিশু ব্যতীত কেহ তাহাকে ধরিতেও যান না। তাই, শান্ত রসের পৃথক্ অস্তিত্ব ব্রজে নাই। সুতরাং ব্রজ জন দাস্য সখ্য বাৎসল্য কি মধুর, যাঁহার যে রসে অধিকার তিনি সেই রসেই ডুবিয়া আছেন। সেইরূপ ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই হইল। যিনি ডুবিয়া যান তাঁহার পক্ষে তিন হাত, পাঁচ হাত কি দশ হাত জলের নীচে ডুবা একই কথা। কিন্তু "তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তার তম"। রক্তক পত্রক প্রভৃতি বহু দাস ভক্ত আছেন। প্রভুর সেবা এবং আজ্ঞা পালনই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব এবং তাঁহার অনুগ্রহ, চরণধূলি, মহাপ্রসাদ ইত্যাদিই তাঁহাদের এই ভাবটীকে সজীব করিয়া রাখে। সখ্য এবং বাৎসল্য রস ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন মধুর রসের কথা। শ্রীচৈতন্য

চরিতামৃতের উপরোক্ত পয়ার দৃষ্টে দাস্যের গুণ সখ্যে আছে। দাস্য সখ্যের গুণ বাৎসল্যে আছে এবং দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে আছে। সুতরাং এই মধুর রসটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস বা ভাব। আর ইহার মালিকা একমাত্র ব্রজ গোপীগণ এবং স্থান একমাত্র "ব্রজ"।

"গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে কহি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম লোকধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

* * * * *

সহজ গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া—সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য গোপী ভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যাজি সে কৃষ্ণ ভজয়॥

রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগ মার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
অঙ্ঘ্রি-পদ্ম-সুধা কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥
অতএব গোপী ভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ-দেহ চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।
সখী ভাবে—পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥" (চৈঃ চঃ)

এই পথের পথিক হইতে হইলে আপনাকে ব্রজে অবস্থিত একটী পর সুন্দরী কিশোরী বয়স্কা গোপ কুমারী রূপে চিন্তা করিয়া রাগময়ী শ্রীললিতা সখী এবং শ্রীরূপ মঞ্জুরী আদি মঞ্জুরীগণের অনুগত হইয়া শ্রীগুরু রূপা সখ বাম পার্শ্বে অবস্থান করতঃ ভজন করিতে হইবে। আত্মেন্দ্রিয়-সুখ তাৎপ মোটেই থাকিবে না, থাকিবে কেবল কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য। সুতরাং ইন্দ্রিয় জ রিপু জয় না করিতে পারিলে এবং কামের গন্ধ মাত্র থাকিলেও এই প প্রবেশ করারই অধিকার হয় না; তাই বুঝি শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সমক্ষে এ রসের বিষয় খুব বিস্তার করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার নিকট বিভি সময়ে এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহার ভাব এই যে:—

শ্রেষ্ঠা গোপী অর্থাৎ মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী বৃষভানু আবির্ভাব লীলা প্রকট করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ ন

দ্রিত করিয়া ছিলেন। বৃষভানু রাজার কন্যা হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দখার জন্য মা যশোদা তাঁহার গোপালকে নিয়া তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর রাধা নয়ন উন্মীলন করেন নাই। তৎপর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের নাম শুনিয়াই অস্থির হইলেন।

"সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে, কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥" (চঃ দাঃ)

তৎপরে চিত্রপট দর্শন।ঃ—

"কৃষ্ণের মূরতি চিত্র পটেতে লিখিয়া।
দেখাইলা যবে সখী বিশাখা আনিয়া ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া ॥" (ভঃ মাঃ)

তৎপরে স্বপ্ন দর্শন। ঃ—

"আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ নিছনি।
কিশোর বয়েস একজন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে পুনঃ লালসা জন্ময়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায়॥" (ভঃ মাঃ)

তৎপরে সাক্ষাৎ দর্শন। ঃ—

"যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥
যমুনার তীরে সখি কাহারে দেখিনু।
প্রাণ মন দেহ মুই সঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি তারে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুল শীল সব নাশ যায়॥" (ভঃ মাঃ)

তৎপরে—

"দোঁহার গুণেতে দোঁহার হৃদয়
ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে।
দোঁহার গুণেতে দোঁহার হৃদয়ে
সদা আকর্ষণ করয়ে॥
দোঁহার পিরীতে দোঁহে মাতিয়াছে
একত্রেতে হৈয়া চিত।
দোঁহার মাধুরী দোঁহে পান করি
ভুলিয়াছে লোক রীত॥

দোঁহার মরম দোঁহে সে জানয়ে
অন্যে নাহি কেহ বুঝে।
দোঁহার তুলনা দোঁহ বিনু আর
নাহিক ভুবন মাঝে॥
কিশোর কিশোরী রসের মাধুরী
তুলনা দিবার নাই।
কোটি কোটি সুধা. নিছনি যাউক
কৃষ্ণ দাস গুণ গাই॥" (ভঃ মাঃ)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দরশনের তরে যমুনার কূলে কদম্বের তলে আসিয়া থানা বসাইলেন। কাজেই শ্রীরাধার ঘরে আর মন টিকে না, মন কেবল যমুনা আর কদম্বের প্রতি—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
* * *
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥" (চঃ দাস)

তাই, নানা অছিলায় রাই ঘন ঘন যমুনায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সর্ব্বদাই পাহারাদার কুটিলা আছেন। রাই আর কি করেন? যমুনায় কলসী পূর্ণ করিয়া তীরে উঠিয়াই পা পিছলানর ছল করিয়া কাঁকালের কলস মাটীতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেন। সধবা স্ত্রীলোক কলসী নিয়া জল আনিতে যাইয়া শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়া যাওয়া ভয়ানক দোষ। তাই, কুটিলা রাধিকাকে তথায় রাখিয়া আর একটী কলস আনিতে বাড়ী যাইতেন, আর সেই অবসরে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কদম তলায় যাইয়া কৃতার্থ হইতেন। আবার কোন দিন যমুনার কূলে নিজের গলার হার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ননদিনী কুটিলা সহ মালা কুড়াইবার ছলে অদূরে কদম্বের তলে শ্যাম দরশন করতঃ নয়ন চরিতার্থ

করিতেন। শ্রীরাধার আহার নিদ্রা একরূপ বন্ধ। শ্যামের বিরহে কোন সময়ে বিরলে বসিয়া কাঁদিতেন। আবার ময়ূর পুচ্ছ কি মেঘ দেখিলে তাহাতে শ্যামের বরণ দেখিয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন।

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়,
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী, তোমার বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডিদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি ॥" (চঃ দাঃ)

অনুক্ষণ দুরজন গুরু জটিলা কুটিলার গঞ্জনা সহ্য করিয়া এবং তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া শ্যাম দর্শনার্থ স্নান করা, জল আনয়ন করা ইত্যাদির অছিলায় যমুনায় যাওয়া, সূর্য্য পূজার অছিলায় গিরি গোবর্দ্ধনে যাওয়া এবং গভীর

রাত্রিতে অভিসারে যাওয়ার মাত্রা যখন শ্রীরাধিকার ক্রমান্বয়ে বাড়িতেই আরম্ভ করিল এবং শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জনার্থ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর যখন বেদিয়ার বেশে, গোকুলে ইন্দ্র পূজোপলক্ষে পসারীর বেশে, চিকিৎসকের বেশে, দেয়াসিনীর বেশে, রনিকিনীর বেশে, মালিনীর বেশে, নাপিতানীর বেশে আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন ব্রজে শ্রীরাধার বড়ই দুর্নাম রটিয়া গেল এবং নাম হইল 'কলঙ্কিনী রাধা'। কিন্তু শ্রীরাধার তাহাতে কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই।

"বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন ॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি ॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কূলে।
এতদিনে বিধি মোরে হৈল অনুকূলে ॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥"

শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়া এবং তাঁহার সেবা করিতে যাইয়া যদি 'কলঙ্কিনী' নাম ধারণ করিতে হয় তবে শ্রীভগবানের তরফেও ত কিছু করণীয় আছে! তিনি ত আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না! তাই, নন্দ-যশোদার দুলাল

এবং ব্রজের জীবন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র "শিরঃ পীড়া" লীলা অভিনয় করিলেন। মাথায় ভয়ানক বেদনা, বহু চিকিৎসক দেখান সত্ত্বেও কোন ফল হইতেছে না, সকলেই অস্থির। তখন একজন ওঝা আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন যে যমুনা হইতে একটি সহস্র-ছিদ্র-কলসী পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া দিতে পারিলেই তিনি ঐ ব্যাধি অতি অনায়াসেই আরোগ্য করিয়া দিতে পারিবেন। মা যশোদা বলিলেন যে তিনি সহস্র-ছিদ্র কলসী কোথায় পাইবেন? ওঝা বলিলেন ঐরূপ কলসী তাহার নিকটেই আছে। মা যশোদা বলিলেন থাক্‌লেই বা কি? যমুনা ত কম দূরে নয়! এত ছিদ্রযুক্ত কলসী পূর্ণ করিয়া কে জল আনিতে পারিবে? ওঝা কহিলেন, "তুমি ত মা, তোমার হস্তের ঔষধ অমৃত হইয়া যাইবে তাহাতে কোনই ফল হইবে না, তুমি ছাড়া ব্রজে আর কোন সতী থাকিলে তিনি এই কার্য্যে সমর্থা হইবেন। তৎক্ষণাৎ জটিলা কুটিলার ডাক পড়িল, তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে মা যশোদা সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় জটিলা বলিলেন "এ আবার বেশী কি কথা? কুটিলা! তুমি শীঘ্র এই কলসী পূর্ণ করিয়া যমুনা হইতে জল নিয়া আইস।" কুটিলা কলসী লইয়া যমুনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মা, ঝি, দু'জনেই—ব্যবহারিক জগতে সতী বলিয়া পরিচিতা থাকিলেও তাঁহারা জগৎ-স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া মানেন না এবং অভিমান নামে তাঁহাদের আর একটী স্বামী আছে। তাই, সেই অভিমান ভরে কুটিলা যখন সচ্ছিদ্র কুম্ভটি ভরিয়া জল নিয়া রওয়ানা হইলেন তৎক্ষণাৎ ঝর ঝর করিয়া কলসী হইতে সমস্ত জল পড়িয়া গেল। কুটিলা বিষণ্ণ মনে শূন্য কলসী হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। জটিলা ক্রুদ্ধা হইয়া কুটিলাকে বলিলেন "তুই বুঝি মনে মনে কোন দিন কুভাব (স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের চিন্তা) পোষণ করেছিলি! দে, আমাকে কলসী দে।" জটিলাও দম্ভভরেই কলসী নিয়া জল আনিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহারও ঠিক কুটিলার মত অবস্থাই হইল। তিনি রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে শূন্য কলসীটি মাটীতে ফেলিয়া দিয়া "যে কলসীতে এত ছিদ্র থাকে তা ভরিয়া জল আনা কি মানুষের কাজ?" এই বলিয়া কন্যাকে নিয়া

চলিয়া গেলেন। মা যশোদা বলিলেন "আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কি সম্ভব ?" ওঝা বলিলেন "মা, যিনি প্রকৃত সতী তিনি ইহা হইতে বেশী ছিদ্র থাকিলেও তাহা পূর্ণ করিয়া আনিতে পারেন। উঁহারা যখন পারিলেন না তখন আমি উঁহাদিগকে সতী বলিতে পারি না। আচ্ছা, আমি গণনা করিয়া দেখি যে, তোমার এই ব্রজে প্রকৃত কোন সতী আছে কিনা।" গণনা করিয়া কিছুকাল পরে বলিলেন "তোমার ব্রজে "রাধা" নামে কোন স্ত্রীলোক আছেন ? মা বলিলেন "আছে"। তখন ওঝা বলিলেন "আমি গণনায় পাইয়াছি যে তিনি পরমা সতী—তুমি তাঁহাকে ডাকাইয়া আন, তিনি এই কলসী পূর্ণ করিয়া আনিতে পারিবেন।" মা বলিলেন "তুমি বেশ ভাল সতী বাছিয়া বাহির করিয়াছ! জটিলা কুটিলা, যাহারা এই ব্রজে আদর্শ সতী বলিয়া পরিচিতা তাহারাই পারিল না আর রাধা, যাহার কলঙ্ক ব্রজের ঘরে ঘরে ছাইয়া পড়িয়াছে সে পারিবে ?" ওঝা বলিলেন "লোকে না বুঝিয়া যাহা বলে বলুক কিন্তু তুমি বলিবে কেন ? তুমি তাহাকে আনিয়াই দেখ না কেন? তিনি নিশ্চয়ই পারিবেন।" তৎক্ষণাৎ রাধাকে ডাকিয়া আনিয়া ঐ কলসী পূর্ণ করিয়া জল আনিতে বলা হইল। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া জটিলা কুটিলার মত অভিমান ভরে তৎক্ষণাৎ রওনা না হইয়া তাঁহার প্রাণ-কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিলেন, "স্বামিন্! এ আবার তোমার কোন্ লীলা ? এও কি সম্ভব ? আমার তো নিজের বলিয়া কিছুই রাখি নাই। দেহ মন প্রাণ সকলই তো তোমাকে দিয়াছি। এখন যদি আমি কৃতকার্য্য হই তোমারই কৃতিত্ব আর অকৃতকার্য্য হইলে তোমারই দুর্নাম।" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার উপর ষোল আনা নির্ভর করতঃ কলসীটি যমুনার জলে পূর্ণ করিয়া ফিরিলেন। এইরূপ শ্রীভগবানে ষোল আনা নির্ভর করিতে পারিলে তিনি কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন ? তিনি অলক্ষ্যে আসিয়া আপন হাত দিয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া রাখিলেন। কাজেই কলসী হইতে এক ফোঁটা জলও পড়িতে পারিল না। শ্রীরাধা পূর্ণকলস নিয়া পৌছিলে ওঝা ঐ জল

শ্রীকৃষ্ণের শিরে ছিটাইয়া দেওয়া মাত্র শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। উপস্থিত সকলে শ্রীরাধাকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন "ইহাতে আমার কোনই কৃতিত্ব নাই ; বাহ্‌বা দিতে হইলে বাস্তবিক যাঁহার কৃতিত্ব এবং যাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে তাঁহাকে দাও।" এই লীলাটি জীবকে পরিষ্কার শিক্ষা দিতেছেন যে এইরূপ সহস্র সহস্র ছিদ্র অর্থাৎ দোষ থাকিলেও শ্রীভগবানের উপর এইরূপ ষোল আনা নির্ভর করিতে পারিলে তিনি তাহার সমস্ত ছিদ্র (দোষ) এইরূপ বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ইহা শুনিয়া জটিলা কুটিলার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা হিংসায় জ্বলিতে থাকিলেন। কিছুদিন পরে যখন কুটিলা দেখিতে পাইলেন যে রাধা একাকিনী কুঞ্জে যাইয়া কৃষ্ণের ভজন (পদসেবা) করিতেছেন তখন তিনি রাধার সতীত্বটা কিরূপ তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আহ্লাদে গদ গদ হইয়া দৌড়াইয়া দাদা অভিমন্যুকে (শ্রীরাধার তথাকথিত স্বামী, যিনি ক্লীব এবং যিনি প্রকৃত শ্রীরাধার ছায়াও কোনদিন স্পর্শ করিতে পারেন নাই) ডাকিয়া আনিয়া উহা দেখাইলেন। শ্রীরাধার মন সম্পূর্ণরূপে সেবায় নিবিষ্ট, বাহিরের কোন দিকে খেয়াল নাই এবং থাকিতেও পারে না। এ অবস্থায় ভগবান কি করেন? তিনি এমন একটী অপ্রাকৃত লীলা দেখাইলেন যে, কুটিলা দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণকে, আর আয়ান (অভিমন্যু) দেখিতেছেন যে তাঁর নিজের ইষ্ট দেবী কালী মাকেই শ্রীরাধা পূজা করিতেছেন। তখন অভিমন্যু কুটিলাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। অদ্যাবধি সেই "কৃষ্ণ-কালী" শ্রীধাম বৃন্দাবনে পূজিত হইতেছেন। এই লীলাটি কি জীবকে শিক্ষা দিতেছেন না যে কেহ অনন্য মনে কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহিলে অপর কেহ তাহার বাধা জন্মাইতে পারে না এবং বাধা প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি নিজেই এই রূপে জব্দ হইয়া আসেন?

"শ্রীশ্রীশ্যাম কুণ্ড ও রাধা কুণ্ড"

একদা কংসের প্রেরিত একটা অসুর শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে সুন্দর একটী বাছুরের মূর্ত্তি ধারণ করতঃ রামকৃষ্ণ যে স্থানে বৎস-চারণ করিতেছিলেন সেই স্থানে যাইয়া বৎসপালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ টের পাইয়া উহার পিছনের দুটী পা ধরিয়া এরূপ জোরে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন যে সে চীৎকার করিতে করিতে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মরিয়া গেল। শ্রীরাধা ঐ চীৎকার শুনিয়া সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া বলিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় বৎসাসুর বধ করায় তাহাকে গো হত্যা জনিত মহাপাপ স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত তীর্থে স্নান না করিলে তিনি আর তাঁহাদের স্পর্শ-যোগ্য হইতে পারিবেন না। তাই বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মুরলীর প্রান্তভাগ দ্বারা একটা কুণ্ড খনন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থিত গঙ্গাদি যাবতীয় তীর্থগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ঐ কুণ্ডে স্থাপন করতঃ তথায় স্নান করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তীর্থগণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ যোড় হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া শ্রীরাধার ইচ্ছা হইল যে তিনিও ঐ কুণ্ডের পার্শ্বেই আর একটী কুণ্ড খনন করিয়া কৃষ্ণের কুণ্ডের জল সেচিয়া তাঁহার কুণ্ড পূর্ণ করতঃ তীর্থগণকেও সেই কুণ্ডে স্থাপন করিবেন। তদভিপ্রায়ে শ্রীরাধা ও সখীগণ কেহ শুখ্না লাকড়ী খণ্ড, কেহ শিলা খণ্ড, কেহ খড়ি যিনি যাহা হাতের নিকট পাইয়াছেন তাহা লইয়াই মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটী কুণ্ডের মতই হইল বটে কিন্তু তাহাতে না হইল জল আর না আসিলেন তীর্থগণ। সকলেই লজ্জিতা হইলেন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আবার নূতন একটী ফন্দি আঁটিলেন এবং ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভঙ্গি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি এই কুণ্ডটী খনন করিলে এবং তীর্থগণকে আনয়ন করিলে, না আমাদিগকে কুহক করিয়া ভুলাইলে. আর তোমার পাপ গেল

কিনা তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি যদি তীর্থগণকে তোমার কুণ্ড হইতে আমাদের কুণ্ডে আনয়ন করতঃ স্নান করিতে পার তবেই আমাদের প্রতীতি হইবে যে প্রকৃতপক্ষেই তোমার পাপ দূর হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাহাদের আদেশানুসারে সমস্ত তীর্থগণকে শ্রীরাধার কুণ্ডে আনয়ন করতঃ স্নান এবং শ্রীরাধা ও সখীগণসহ জলকেলি করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিলেন। কুণ্ডদ্বয়ের নাম হইল—"শ্রীশ্যাম কুণ্ড" ও "শ্রীরাধা কুণ্ড"। "শ্রীকুণ্ড" বলিলে এই "শ্রীরাধা কুণ্ড"কেই বুঝায়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা কেবল মাত্র রাত্রিকালেই হয়, কিন্তু গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে দিবালোকে লীলা হয় বলিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। আবার শ্রীশ্যাম কুণ্ডে স্নানে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রীতা হন এবং শ্রীরাধা কুণ্ডে স্নানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিক্রীত হইয়া যান বলিয়া "শ্রীশ্যাম কুণ্ড-রাধাকুণ্ড" শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ।

"শ্যাম কুণ্ড স্নানে শ্রীরাধিকা প্রীত হন ॥'
রাধা কুণ্ড স্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত হন ॥" (ভঃ মাঃ)

[এই কুণ্ডদ্বয় পরে কি রূপে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণন করা হইয়াছে। এই কুণ্ড দর্শনে আমার মত নরাধমেরও হৃদয় বিগলিত হইতে চাহে। তথায় ছোট ছোট ছেলেরা "শ্যাম-কুণ্ড রাধা-কুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন, মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন" বলিয়া নাচিতে নাচিতে যে সুমধুর কীর্ত্তন করেন তাহা শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ছেলেদের ভাব দেখিয়া চক্ষের জল না আসিয়াই পারে না। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ একদিন এই কুণ্ড দ্বয়ের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া একেবারে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সেই দিনের চেহারাটি এখনও আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীরাধা কুণ্ডে স্নান করার অর্থ শ্রীরাধার ভাব সাগরে ডুবিয়া যাওয়া।

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥" (চঃ দাঃ)

এইরূপ ভাবের মধ্যে ডুবিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিতে পারিলে অথবা ঐ কুণ্ডে স্নান করা মাত্র ঐরূপ ভাব উদয়ের সৌভাগ্য কাহারও হইলেই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রকৃত স্নান করা হয়।

আমার ঠাকুর এই কুণ্ড সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

"ভাই ভগবান! রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে যে পরিবর্ত্তন হয়, তার আর কথা কি? সামান্য পরিবর্ত্তন নয়; অনন্ত তপস্যাতেও যাহা না হইতে পারে একবার মাত্র রাধা কুণ্ড স্নানে তাহাই সংঘটিত হয়! মনে নাই কি ভাই! তোমাদের সেই নটবর কেমন কাল? তিনি একদিন রাধা বিরহে আকুল হইয়া রাধা কুণ্ডে ঝাঁপ দেন, অনেক ক্ষণ পরে কুণ্ডের উপর আসিয়া দেখেন তাঁর সেই মহা-কাল-রূপ সোণার মত হইয়া গিয়াছে; তাই বিদেশিনী হইয়া শ্রীমতীর নিকটে যান।"

* * * *

যে রাধাকুণ্ডের স্মরণে প্রাণ মন আকুল হয় ও প্রেম-কদম্বে শরীর পূর্ণ হয়, তাহাতে স্নানের ফল যে কি, তাহা কে জানিবে ভাই?" (পঃ ১।৩৫ নং)

আর শ্রীরাধারাণী সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

"প্রেমময়ী রাধা-রূপ তাই এত ভাল লাগে। কামের পক্কাবস্থার নাম প্রেম, আর সেই প্রেম-স্বরূপিণী আমার রাধা, এখানে কাম গন্ধ পর্য্যন্তও নাই; এই জন্যই রাধাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ "মদন মোহন" নাম পাইয়াছেন। রাধা

না থাকিলে তাঁর নাম কেবল "মদন"। এই জন্যই শারী রাধাকে উদ্দে করিয়া শুকের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল ঃ—

"যদা সঙ্গে রাধা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ॥"

প্রেমময়ীর আশ্রয় লইয়াছি, এখন তাঁর দয়া হইলেই কৃতার্থ হই। আশীর্ব্বা করুন যেন দয়াময়ীর দয়া পাই।" (পঃ ১।১৬

বস্ত্রহরণ লীলা

তারপর ব্রজদেবীগণের কথা। যে মধুর রসের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল সবই আছে, সেই রসে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করতঃ তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিবা আশায় তাঁহারা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদ হইতে কাত্যায়নীর অর্চ্চন রূপ ব্র আরম্ভ করিলেন। আবার শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশে তাঁহাদের ব্রতের ম হইল "নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।" তাঁহারা যখন দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইতে থাকিলেন, তখন ভগবানের দিকে সাড়া পড়ি গেল। তিনি ভাবিলেন যে ইতি পূর্ব্বে কেহই তো তাঁহাকে নিজেদের দে পর্য্যন্ত দান করিয়া ভজন করিতে অগ্রসর কি সাহসী হয় নাই। ভগবা প্রেম-ভুখা। যাঁর নিকটে যতটুকু প্রেম পাইবেন, তাঁর নিকট তিনি ঠি সেই পরিমাণেই ধরা পড়িবেন। তাঁহাকে প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতেই হইবে তাই কুমারীগণের প্রেম পরীক্ষার জন্য মাসান্তে ব্রত সমাপ্তির দিন পূর্ব্ব পূ দিবসের মত পরিধেয় কাপড়গুলি তীরে রাখিয়া কুমারীগণ যখন যমুনায় স্না করিতে নামিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কয়েকজন সখা সহ তথায় উপস্থি হইয়া অতি সন্তর্পণে কাপড়গুলি লইয়া কদম্ব গাছের উপর উঠিয়া খিল-খি করিয়া হাসিতেছেন। কুমারীগণ চাহিয়া দেখেন যে তাঁহাদের সমস্ত কাপ গুলিই ঐ গাছের ডালে ঝুলিতেছে। তাঁহারা সেই কাপড়গুলি ফিরাই দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন "আমার কি ঠেকা

আমি গাছ হইতে নামিয়া তোমাদিগকে কাপড় দিতে যাইব ? তোমাদের গরজ থাকে তো তোমরা উঠিয়া আসিয়া কাপড় নিয়া যাও।" তাঁহারা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু ফল হইল না ; অবশেষে কুমারীগণকে বাধ্য হইয়া দুই হস্ত দ্বারা লজ্জা-স্থান আবরণ করতঃ তীরে উঠিয়া কাপড় ফেরত চাহিতে হইল। কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন যে লজ্জা এখনও ষোল আনা যায় নাই। তাই আরও পরীক্ষা করার জন্য তিনি বলিলেন, "তোমরা ব্রত আচরণ করিতে যাইয়া উলঙ্গ হইয়া জলে স্নান করিয়া দেবতাকে অবহেলা করিয়াছ। সুতরাং এই পাপ দূর করার জন্য মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তৎপরে বস্ত্র গ্রহণ কর।" "আমাদের দেহ মন প্রাণ সবই তো তোমাকে দিয়াছি তোমার জিনিষ তুমি দেখিবে তাহাতে আমাদের কি ?" এই ভাবিতে ভাবিতে কুমারীগণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ নমস্কার করিলেন। তাঁহারা পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,, "তোমরা ব্রজে গমন কর, তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ—তোমাদের মনের আশা পূর্ণ হইবে। আগামিনী যামিনী তোমরা সকলে আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।"

শ্রীরাস লীলা

তদবধি পূর্ব্বরাগবতী ব্রজ সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার আশায় দিন গণিতেছিলেন। শরৎকাল, পূর্ণিমার নির্ম্মল চন্দ্র দেখিয়া ব্রজ-সুন্দরীদিগকে ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে মিলন আনন্দ প্রদানের অভিলাষে যোগমায়া-প্রভাবে তাঁহার মন নাচিয়া উঠিল। আপন ভোলা ভগবান ধীরে ধীরে বাঁশী হস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া বংশী বটে পৌছিয়া বাঁশীতে ফুক দিলেন। সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া আর কি ব্রজসুন্দরীগণ ঠিক থাকিতে পারেন ? সকলেই নিজ নিজ গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন—সেই

সেই কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখিয়া দিয়া গুরুজনের নিষেধ এবং শাসন সত্ত্বেও ধাইয়া চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের মন নিবদ্ধ তাঁহারা যখন বংশীধারীর বংশীধ্বনি শুনিতে পান তখন কি সংসার বা সংসারের লোক তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে? তাঁহাদের আর সবুর সয় না। তাই, এক অঙ্গের অলঙ্কার অপর অঙ্গে পরিয়া কোন দিকে কোন রূপ লক্ষ্য না রাখিয়াই তাঁহারা তীরের মত ছুটিয়া চলিলেন। গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ রসের ভারে হেলিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া গোপাঙ্গনাদের মনোহারী মধুর বংশী গীত আরম্ভ করিয়াছেন। বাজাইবার সময় বাঁশীর ছিদ্রের দিকে চাহিতে হয়, তাই চাহনিও বাঁকা (তেরেছ নয়নে তেরেছ চাহনি) এবং তজ্জন্য মাথার চূড়াটীও বাঁকা। সেই মদন-মোহন রূপ দেখিয়া কেই বা স্থির থাকিতে পারেন? কাজেই দূর হইতে আপন-হারা পাগল-পারা মহা প্রেম স্বরূপিণী গোপাঙ্গনাগণ যখন সেই ত্রিভুবন-মনোহর রূপ দর্শন করিলেন তখন তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া চতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু বেশ করিয়া বাজাইয়া নিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর নানারূপ প্রশ্ন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। "সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি" সুতরাং দুই পক্ষে বেশ বাক্‌যুদ্ধ চলিল। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কেন আসিয়াছেন" আর গোপীগণ উত্তর দিলেন যে "তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন"। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "রাত্রে হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে আবার কুলস্ত্রীগণের পরপুরুষের সংসর্গে আসা মহা অখ্যাতি এবং পরিণামে নরকে যাইতে হয়। তাঁহাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও পতিগণ (গোপীদের মধ্যে কতক ছিলেন বিবাহিতা আর কতক অবিবাহিতা) তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং অবিলম্বে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাদের সেবার কার্য্যে নিযুক্তা হওয়া উহাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য। উহাঁদের পক্ষে এই ভাবে আসা কিছুতেই ঠিক হয় নাই।" গোপীগণ বলিলেন যে "তাঁহারা কি

করিবেন ? ঐ সর্ব্বনেশে বাঁশীর স্বর শুনিয়া তাঁহারা তো কিছুতেই ঘরে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, বেশ কথা, দর্শন তো হইয়াছে এখন তাঁহারা ঘরে যাইয়া তাঁহার ধ্যানাদি করুন তাহাতেই তাঁহাদের কাজ হবে। গোপীগণ উত্তর দিলেন 'গোপী নয় যোগীশ্বর, চরণ ধেয়ান করি পাইবে সন্তোষ।" তাঁহারা চান সাক্ষাৎ সেবা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে তাঁহারা এইরূপ করিতে থাকিলে তো তাঁহাদের জাতি কুল মান কিছুই থাকিবে না। গোপীগণ বলিলেন "জাতি কুল মানের দিকে চাহিলে কি কৃষ্ণ দর্শন করা যায় ?" শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক ভয় দেখাইলেন, প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের ঘৃণা জন্মে সেইরূপ কথা বলিতেও ত্রুটী করিলেন না। গোপীগণ তখন যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব এই—

"আলিঙ্গন দাও কি বা দলহ চরণে।
বিরহে মরম পীড়া দাও অদর্শনে ॥
যেই তব ইচ্ছা হয় সে বিধান কর।
মুঁই প্রাণনাথ বিনা না জানি অপর ॥"

ভক্তের ব্যাকুলতা পরীক্ষা করা ভগবানের স্বভাব। তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ না হইলে তিনি কখনই বশীভূত হন না। কথায় বলে 'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—তিন থাক্‌তে নয়।' অর্থাৎ এই তিনটী সঙ্কোচের ভাব থাকা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে গোপীগণ বস্ত্র হরণ লীলায় পরিচয় দিয়াছেন যে তাঁহার নিকট তাঁহাদের কোন লজ্জা (কপটতা) নাই। গুরুজনের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার নিকট এইরূপভাবে আসিয়া পরিচয় দিয়াছেন যে তাঁহাদের ভয় বা সঙ্কোচ নাই এবং তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে তিনি কোনরূপ অপমানসূচক কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারেন না, তাঁহারা একান্তভাবেই তাঁহার শরণাগত এবং তাঁহারা চান শুধু প্রেম সেবা (প্রেমের অনির্ব্বচনীয়

বিকাররূপ কামকলাময় সেবা)। তখন শ্রীকৃষ্ণ কি আর প্রেম-পাগলিনীদের এহেন ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাদের নিকট নিজকে বিলাইয়া না দিয়া থাকিতে পারেন ? তাই তিনি তাঁহাদের প্রেম-সেবা গ্রহণের নিমিত্ত অপ্রাকৃত নবীন কাম রূপে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়া সেই গোপী-কাম-ক্রীড়ার পরিপাটী বিস্তারের জন্যই মোহন, আকর্ষণ, স্তম্ভন, দ্রাবণ ও বশীকরণ, এই পঞ্চ পুষ্প-বাণ নিজ প্রিয় গোপীদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। (কাম-গায়ত্রী জপকারিগণ সকলেই বোধ হয় জানেন যে এই স্থান হইতেই সেই মন্ত্রের জন্ম)। গোপীর ভাব দর্পণের মত। এক একটী গোপী এক একটী ভাবের দর্পণ। শ্রীকৃষ্ণের এক এক ভাব এবং মাধুর্য্যের প্রতিবিম্ব উহাদের উপর পড়িয়া উহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক বলিয়াই প্রতিভাত হইতে থাকিলেন। একটী কোঠার চারিদিকের দেওয়ালে আয়না টাঙ্গান থাকিলে কচি শিশুগণ যেমন এক এক আয়নায় তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গীর বিভিন্ন প্রতিবিম্ব দেখিয়া প্রত্যেক আয়নাকেই ধরিতে যায় শ্রীকৃষ্ণও ঠিক তেমনি এক একজন গোপীকাকে ধরিতে যাইতেছেন, নয়নের বাণ হানিয়া, হাস্য, পরিহাস, বাহু প্রসারণ ও আলিঙ্গন দিয়া গোপীদের সঙ্গে নানারূপ খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপীকাগণও মণ্ডলী করতঃ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য সহকারে কীর্ত্তন করিতে থকিলেন। শ্রীকৃষ্ণও 'যত গোপী তত কৃষ্ণ' সাজিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। ইহারই নাম 'রাস'। শ্রীভগবান ইতিপূর্ব্বে এইরূপভাবে কাহারও নিকট নিজকে বিলাইয়া দেন নাই। তাই, এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া গোলকে দুন্দুভি ধ্বনি আরম্ভ হইল এবং এই রাসলীলা দর্শনের জন্য সমুৎসুক হইয়া দেব দেবীগণ আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া মনের আনন্দে রাসমণ্ডলীর উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত সখীগণ শ্রেষ্ঠা সখী শ্রীরাধার অত্যন্ত অনুগতা। রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ভাবিলেন যে রাসে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ ব্যবহার পাইয়া তাঁহাদের সেই ভাবটী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহারা আপন সৌভাগ্যে বেশ

গর্ব্বিত হইয়াছেন। তিনি অভিমান ভরে তৎক্ষণাৎ রাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং রাসবিহারী শ্রীরাধারমণও সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণের মাথা ঘুরিয়া গেল। বিলাপ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বনে বনে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। তাই সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। বৃক্ষের পর বৃক্ষকে লতার পর লতাকে, পুষ্পকে, পশুপক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন যে তাঁহাদের প্রাণকৃষ্ণ কোথায়? তাঁহারা উন্মত্তবৎ ছুটিয়া চলিলেন। নিষ্কপট ঐকান্তিক প্রেম এম্‌নিভাবেই প্রেমিককে উন্মত্ত করে। পরিশেষে অন্বেষণে কাতর হইয়া নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা, পূতনা রাক্ষসী, গোপ সখা প্রভৃতি সাজিয়া পূতনা রাক্ষসী বধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর যাইতে যাইতে মাটীর উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রাণকৃষ্ণ ঐ পথেই গিয়াছেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখেন যে ঐ সকল চরণ চিহ্নে রমণীর চরণ চিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাঁহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এই রমণী আর কেহ নহে, তাঁহাদের যূথেশ্বরী শ্রীরাধা। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এক স্থলে কেবল কৃষ্ণপদচিহ্ন এবং তাহাও অত্যন্ত দাবান (গভীর) দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে প্রিয়তম এই স্থানে তাঁহাকে বুকে করিয়া বহন করিয়া নিয়া গিয়াছেন। আরও কতদূর যাইয়া দেখেন যে শ্রীরাধা প্রিয়বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। শ্রীরাধার মুখে মাধবের নিকট হইতে তাঁহার মান লাভ এবং নিজের অভিমান হেতু পরে অবমাননা প্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। শ্রীরাধা বলিলেন যে অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে ভ্রমণ করিলেন তখন তিনি নিজের সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "আমি আর চলিতে পারি না। যেই স্থানে ইচ্ছা করি তুমি আমাকে সেই স্থানে বহন করিয়া নিয়া

চল।” শ্রীকৃষ্ণের কথায় অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া তিনি যখন তাঁহার স্কন্ধে চড়িতে যাইতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া বনে বনে খুঁজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বিলাপ করিতে করিতে যমুনা পুলিনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় পাইবার আশায় তাঁহার গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গৃহ কাহারই মনে পড়িল না। এমন সময় সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই গোবিন্দ-বিরহে আত্মহারা পাগলিনী গোপ-বামাদের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনার বিষয় নহে. অনুভূতির বিষয়। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। সম্পূর্ণ নিরভিমানী না হইতে পারিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ইহা জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই লীলাটি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এইভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার জন্য ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “কে ভালবাসিলে ভালবাসে, কে ভালবাসার অপেক্ষা না করিয়াই ভালবাসে, কে ভালবাসিলেও ভালবাসে না, আর কেই বা না ভালবাসিলে ভালবাসে না?” চতুরশিরোমণি নাগর অমনি বুঝিয়া ফেলিলেন যে তাঁহার ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রশ্ন চারিটা হইয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে “ভালবাসিলে যাহারা ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসায় ষোল আনা স্বার্থ। কিন্তু পিতামাতার ভালবাসায় কোনরূপ স্বার্থের গন্ধ নাই, আর যাহারা কিছুতেই ভালবাসে না তাহারা বাহিরের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহারা হিংসুক কি অকৃতজ্ঞ! অবশেষে তিনি তাহাদের মনের ব্যথা দূর করার জন্য তাঁহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে যাইয়া তাঁহাদের মত নিজের গৃহ, আত্মীয়স্বজন, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কিছুই ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা তো তাঁহাদের সেই সব এবং

এমন কি দেহ মন প্রাণ সবই তাঁহাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট ঋণী এবং তাঁহাদের সেই প্রেম—কোন দিন কোন মতে শিথিল হইয়া পড়িতে না পারে তজ্জন্যই বিরহের তাপ দিয়া আরও ঘন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দোষ দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। সেই উত্তর শুনিয়া বিরহিণীগণের বিরহের সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া গেল। পরমানন্দে আবার মহারাস আরম্ভ হইল। সেই দৃশ্য দেখিয়া পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এই অভূতপুর্ব্ব আনন্দোৎসবে যোগদান করার জন্য বংশীবটের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর কাহারও (অর্থাৎ যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিয়াছেন সেইরূপ পুরুষাভিমানীর) রাধা-গোবিন্দের প্রেম-কুঞ্জে প্রবেশ করার অধিকার নাই বলিয়া দ্বারী শ্রীবৃন্দা-দেবী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু যেভাবেই হউক এ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার যোগদান করিতেই হইবে। তাই তিনি অস্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়া যমুনা দেবীর আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে তাঁহার একটী নীল পদ্ম হস্তে লইয়া স্ত্রীলোকের বেশে যখন পুনরায় কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাদেবী হাসিতে হাসিতে দরজা ছাড়িয়া দিলেন। ভোলানাথ কুঞ্জে প্রবেশ করতঃ পরম ভাগ্যবতী গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিব ঠাকুরের এই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন যে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে 'গোপীশ্বর শিব' নামে অভিহিত হইয়া সকলের দ্বারা পূজিত হইবেন এবং তাঁহাকে পূজা না করিলে কাহারও ধাম দর্শনের ফল হইবে না। তদবধি বংশীবটের নিকট "গোপীশ্বর শিব" স্থাপিত হইয়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরম আদরে পূজিত হইতেছেন। এবং স্ত্রীবেশে দেবাদিদেব মহাদেব বংশীবটে বিরাজ করিতেছেন।

সেই মহাভাব স্বরূপিণী গোপাঙ্গনাগণের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে

করিতে তাঁহাদের হাতে হাত ধরিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং প্রেমভিখারী শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য চলিতে থাকিল। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে গাহিয়াছেন যে, সেই মধুর লীলা দর্শনে চাঁদ আকাশে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাসরজনীরও শেষ নাই—রাসলীলারও শেষ নাই। চাঁদ আর অস্ত গেল না। সারা রাত্রি রাসমণ্ডলের উপর আলোক দিল। রাস, রসময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের নিত্যকালীয় লীলা। তাই সাধক নিজের জীবনে উপলব্ধি করতঃ তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"এখনো তেমনি বহে সে যমুনা,
উঠে তার তীরে মুরলীর তান।
যে জানে সে জানে যে মানে সে মানে,
যে শুনে সে শুনে মজেরে প্রাণ॥
এখনো গোপীকা ধায় অভিসারে,
বিজন বিপিনে নিবিড় আঁধারে।
বেণু রবে ঘরে রহিতে না পারে,
কিসের সেথা লাজ অপমান॥
অনাদি কালের বারতা বহিয়া,
বাজিছে বাঁশরী কান্দিয়া কান্দিয়া।
ডাকিছে সকলে আস গো বলিয়া,
সে শুনে যাহার আছে সে কান॥
আসিবে বলিয়া সে প্রাণ রমণ
কত না অর্ঘ্য করে বিতরণ।
কত না কুসুম করে সে চয়ন,
করিতে তাঁহার চরণে দান॥
হৃদয়ে হৃদয়ে কান্দে বিরহিণী,
সে রাধার শ্যাম প্রেম বিলাসিনী।

আশা পথ চেয়ে দিবস যামিনী,
অশ্রু সলিলে ভাসে বয়ান।"

"রসো বৈ সঃ।" রাসের মহিমাতেই রসের মহিমা। রাসেই প্রাণ, আবার পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ রস। রসের তরঙ্গে রাসের নৃত্য, আবার রাসে মহারস। মহারসে মহারাস। বাঁশীর গানে রসের টান, আর রসের টানে রাসের গান। "ঐশ্বর্য্য ভজনে নিজেরই সুখের সন্ধান ষোল আনা। তাহাতে আছে কেবল "দাও" "দাও"। আর মধুর ভজনে তাহার কিছুই নাই আছে কেবল "নেও" "নেও"। আমার নিকট হইতে কিছু নেও। তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এখন আমি কি দিতে পারি? আমার নিজের তো কিছুই নাই। আবার দিলে ত যাহা তোমার নিকট সকলের চেয়ে প্রিয় তাহাই দিতে ইচ্ছা করে। তবে তুমি যখন রসময় বিগ্রহ—তখন রসই ত তোমার নিকট সকলের চেয়ে প্রিয় জিনিষ। আবার সে রসও রহিয়া গিয়াছে তোমার ভিতরে। ইক্ষুর রস পাইতে হইলে কেবল মাত্র একখণ্ড ইক্ষুদণ্ড পাইলে বা তাহা চাটিলেই তাহার রস পাওয়া যায় কি? তাহাকে মন্থন করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ প্রেমের ভজনে শ্রীভগবানকে মন্থন করতঃ তাঁহার মধ্য হইতে রস বাহির করিয়া তাঁহাকেই আস্বাদন করাইয়া ভজনকারিগণ নিজেরা কৃতকৃতার্থ হন। কাম গন্ধ শূন্য ব্রজসুন্দরীগণ যে লীলাদ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর রস শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে মন্থন করতঃ বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাকে আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখেন তাহারই নাম শ্রীরাস লীলা। এই রাস আনন্দময় ভগবানের নিত্য লীলা; তাঁহার আর কোন খেলা নাই। ইহার ভিতরে যে মধুর আস্বাদ আছে তাহাই লাভ করিবার জন্য তিনি আপ্ত-কাম হইয়াও রস-লোলুপ এবং স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি রূপিণী ব্রজরামাগণকে লইয়া এই রাস-ক্রীড়া করতঃ কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করেন।

একটী গল্প আছে যে একজন সাধক প্রতিদিন শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করতঃ নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সাধন ভজন করিতেন, আর একজন চোর

রাত্রিতে চুরি করিয়া চুরি করাকালীন তাহার শরীরে যে ময়লাদি লাগিত তাহা ধৌত করার জন্য শেষ রাত্রে ঐ পুষ্করিণীর অপর পাড়ে স্নান করিত। সাধক চোরকে ঐ সময় স্নান করিতে দেখিয়া ভাবিলেন যে ঐ লোকটা তার চেয়েও বড় সাধক। আর চোর ভাবিল যে ঐ লোকটা তার চেয়েও বড় চোর। সে মনে করিল যে ঐ লোকটিকে দলে আনিতে পারিলে তাহার চুরির ব্যবসায়ের খুবই উন্নতি হইবে। তাই, সে আর সেই লোভ সামলাইতে না পারিয়া সাধকের নিকট যাইয়া তাহার মনোভাব প্রকাশ করিল। সাধক অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরের উপকারের জন্যই তাহারা আসেন, তাই তিনি চোরের উপর দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং সাধু সঙ্গের ফলে চোরটা পরিণামে সাধু হইয়া গেলেন।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, তাই আমরা ইন্দ্রিয়বশ ও রিপুবশ। কামনা বাসনার বীজগুলি আমাদের মধ্যে কিল বিল করিতেছে। আমরা কি করিয়া বুঝিব যে ইহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তিনি নিজেও যেমন সচ্চিদানন্দময়, ব্রজসুন্দরীগণও ঠিক সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়ী এবং তাহাদের এই রাস বিহারে কামের গন্ধ মাত্রও থাকিতে পারে না? ইহা অবিমিশ্রিত নির্ম্মল প্রেম, ইহার এক কণা মাত্র পাইলেও ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃতার্থ হন এবং নিখিল জগৎ পরমানন্দ সাগরে ডুবিয়া যায়। চক্ষুর উপর দেখিতেছি যে মহা মহা পণ্ডিত মহা মহা সাধুগণ অদ্যাপি কত শ্রদ্ধা সহকারে এই রাসলীলা কীর্ত্তন করতঃ নিজেকে পবিত্রাদপি পবিত্র জ্ঞান করিতেছেন। যোগী ঋষি মুনিরাও পবিত্র হইবার উদ্দেশ্যে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ এই রাসলীলা কীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা নিজের কন্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। কেহ কি পবিত্র হইবার জন্য তাহা কোন দিন কীর্ত্তন করিয়াছেন? কেহ রাসলীলাটিকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, কেহ শক্তি ও শক্তিমানের খেলা এরূপ এক এক ভাবে ডুবিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা কিন্তু "বস্ত্র হরণ" একটী ভয়ানক অশ্লীল ব্যাপার এবং রাসলীলা আমাদের এই জগতের নায়ক-নায়িকা, নট-নটীর অভিনয় বলিয়া দাঁত নাক সিটকাইয়া থাকি। আমরা ভাবি না যে এই জগতের পরপুরুষাভিলাষিনী রমণীগণের পক্ষে এইরূপ পূর্ণিমার রাত্রে এক অঙ্গের অলঙ্কার অন্য অঙ্গে পরিয়া স্বামীর চক্ষুর সম্মুখে এবং তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া পর-পুরুষের সহিত মিলিত হইতে যাওয়া সম্ভব কিনা এবং সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের একমাত্র পুরুষের প্রতি আসক্তি থাকিতে পারে কি না। আমরা ইহাও ভাবিনা, যে শুকমুনি মায়ার হস্তে পতিত না হইতে হয় তজ্জন্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সংসার ছাড়িয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তিনিই এই লীলা রহস্য বর্ণনা করিয়াছেন। আর বর্ণনা করিয়াছেন কাহার নিকট? না, যে পরীক্ষিত মহারাজকে মাতৃগর্ভে থাকার সময় স্বয়ং ভগবান সেই গর্ভে প্রবেশ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরম ধাম্মিক পরীক্ষিতের নিকট। কি উদ্দেশ্যে? না, সাত দিন পরে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিত মহারাজের ব্রহ্মশাপানুযায়ী মৃত্যু হইবে তাই তাহার পরম মঙ্গলের জন্য। কোন্ স্থানে কীর্ত্তন হইয়াছিল? না, পবিত্র সলিলা ভাগীরথীতীরে। কাহার সমক্ষে? না, বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পিতা ভাগবত রচয়িতা পরব্যোমেশ্বর নারায়ণাবতার ব্যাসদেব প্রভৃতি বহু মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র প্রভৃতির সমক্ষে। সুতরাং কোন অশ্লীল কি অন্যায় বিষয় ঐরূপ সভাতে আদৌ উত্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি বেদের সার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠাংশ দশম স্কন্ধ এবং তাহার মধ্যেও শ্রীরাসলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি আমরা বলি যে শ্রীমদ্ভাগবতের এই সব কথা আমরা বিশ্বাস করি না তাহা হইলে আমাদের ইহাই বলা হয় যে শ্রীকৃষ্ণলীলা মিথ্যা, কৃষ্ণপূজা মিথ্যা, কালীপূজা মিথ্যা, শিবপূজা মিথ্যা, সমস্ত দেব দেবীর পূজাই মিথ্যা। কারণ আমরা কেহই তো এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইতেছি না। শাস্ত্রের কথা কি প্রত্যক্ষদর্শী

মহাজনের কথাতে বিশ্বাস না হইলে সবই মিথ্যা হইয়া যায়। ভাগ্যবান্ জনগণ কিন্তু মনে করেন যে এই রাসলীলাটী বাহিরে দেখিতে প্রাকৃত কাম ক্রীড়ার মত দেখাইলেও ইহা বাস্তব সত্য জিনিস এবং ইহার শ্রবণ, মনন ও কথন দ্বারা কামনা বাসনার দিক হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীভগবৎ বিষয়ে লাগাইয়া দেওয়া যায়।

মথুরা ও দ্বারকালীলা

শ্রীকৃষ্ণের বয়স দ্বাদশ বৎসর। পাণ্ডব সখা এবং আত্মীয় যাদবগণ বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন। দেবতাগণও কংস প্রভৃতি অসুরপ্রকৃতি রাজগণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত ; অবিলম্বেই তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। সুতরাং শ্রীধাম বৃন্দাবনের রস-লীলা আস্বাদনের আর সময় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট যাইয়া বলিয়া আসিলেন যে, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভজাত সন্তান এবং তাহারা দুজনেই কংসের প্রেরিত সমস্ত অনুচরদিগকে বধ করিয়াছেন। তাই, ধনুর্যাগ করিয়া তদুপলক্ষে রাম-কৃষ্ণ উভয়কে মথুরায় আনাইয়া মল্লযুদ্ধে বধ করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে কংস তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য পরম ভক্ত অক্রূরকে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর গোকুলে যাইয়া দুইভাইকে নিয়া রথে মথুরা রওয়ানা হইলেন। রথ যমুনার তীরে পৌছিলে রাম-কৃষ্ণ উভয়ে যমুনায় স্নান করতঃ আবার রথে উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে অক্রূর জপ করিতে করিতে যমুনায় ডুব দিয়া দেখেন যে জলের নীচে নীল-পীত বসন পরিহিত রাম-কৃষ্ণ রহিয়াছেন, তাড়াতাড়ি জল হইতে মাথা উচু করিয়া দেখেন যে, দুই ভাই রথের উপরেই আছেন, আবার ডুব দিয়া দেখেন যে তাহারা দুই ভাই জলের মধ্যেও আছেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে লইয়া যাইবার সময় যমুনার মধ্যে যে দৃশ্য হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। লীলা অনুভবানন্দ বৈষ্ণবগণ বলেন যে, সেই সময়ে মথুরার কৃষ্ণ (বাসুদেব) মথুরায় রহিয়া গেলেন এবং গোকুলের

কৃষ্ণ গোকুলে গেলেন। আবার এই সময়ে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই রহিয়া গেলেন। আর মথুরার কৃষ্ণ (বাসুদেব) মথুরায় গেলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"স্বয়ং রূপের গোপবেশ, গোপ অভিমান।

বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ—আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিতেও দেখা যায় "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" সেবাপরায়ণ কৃষ্ণদাসগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ বনে (সেবাকুঞ্জে) শ্রীকৃষ্ণ সতত বিরাজ করেন এবং প্রতি রাত্রে গোপীগণসহ রাস করেন। তজ্জন্য রাত্রে কোন লোক তথায় থাকিলে তাহা দেখিয়া মরিয়া যান। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কুঞ্জের সমস্ত পশু পক্ষী আপনা আপনি কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সেবাইত ব্রাহ্মণ আসনে পুষ্প শয্যা রচনা করতঃ রাত্রের আরতি অন্তে সিংহ দরজা তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। অবিশ্বাসিগণ পরীক্ষা করিতে যাইয়া রাত্রিতে ঐ কুঞ্জে থাকিয়া উহা দেখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অতি উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসী এবং শিব উপাসক শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি মহারাজের "বেদ বাণী" গ্রন্থে বিস্তারিত বিবৃত আছে। কেহ বৈকালে ঐ কুঞ্জে যাইয়া আরতি পর্য্যন্ত থাকিয়া সেবাইতের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া আবার তৎপরদিন প্রত্যুযে সেবাইতের সঙ্গে ঐ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া আসনের পুষ্প শয্যাদির অবস্থা দেখিলে তাঁহার এ বিষয়ে কতকটা প্রতীতি হইতে পারে। শ্রীরাধা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অবস্থায় আসীন এবং শ্রীরাধা তাঁহার সমস্ত শরীর শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণ ধরিতে গেলে 'তাঁহার কি আসে যায়?' এইভাবের শ্রীরাধার পট পূজিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করতঃ ধনুর্যাগের ধনুটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং কংসের যোদ্ধা চানুর মুষ্টিকাদিকে বধ করিলেন। অবশেষে কংশ শ্রীকৃষ্ণের চক্রধর মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে মল্লযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত

হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা বসুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন। ত্রিবক্রা কুব্জার কুজ সোজা করিয়া দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন এবং উগ্রসেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া রাজা করিলেন। কংস নিহত হইয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুর মগধের রাজা প্রবল পরাক্রমশালী জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিতে যাইয়া যুদ্ধে উপর্য্যুপরি ১৭ বার শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পরাজিত হন। শিশুপাল দন্তবক্র তাহারই পক্ষাশ্রিত লোক। তাহাদের এবং অন্যান্য বীরগণের সাহায্যে জরাসন্ধ দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া যখন যুদ্ধের জন্য আবার প্রস্তুত হইলেন, তখন অযথা লোকক্ষয় নিবারণ জন্য শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে একটী দুর্গ প্রস্তুত করতঃ আত্মীয়গণ সহ তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানের নামই 'দ্বারকা'। তথায় শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি যোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপণে সেবা করিতে থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ব্রজ রামাদের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। এমন কি, মধ্যে মধ্যে স্বপ্নের ভিতরও তাঁহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। মহিষীগণ বৈধ-পত্নী এবং তাঁহারা প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতেছেন, তত্রাপি তাঁহাদের নিকট শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখেন অবৈধ-পত্নী (তাঁহারা ব্রজ রামাদের স্বরূপ জানিতেন না) গোয়ালিনীদিগকে। তাঁহাদের বড়ই হিংসা হইল।

তজ্জন্য এ সম্বন্ধে মহিষীদের সঙ্গে দেবর্ষি নারদের নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকিল। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি একই সময়ে ষোল সহস্র রমণীর গৃহে থাকিয়া সকলকে সমানভাবে আনন্দ প্রদান করিতে পারেন, তিনি তো সবই দেখিতেছেন—সবই শুনিতেছেন। তাই ব্রজ দেবীগণ কি জিনিষ তাহা নারদ ও মহিষীগণকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য 'শিরঃপীড়া' লীলার অভিনয় করিলেন। বহু চিকিৎসক আনিয়া দেখান হইল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। দশ বার দিন পরে মহিষীগণ নারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কি করিলে এই পীড়া আরোগ্য হয় জিজ্ঞাসা করার জন্য দেবর্ষিকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহার মাননীয়া নারী ব্যতীত অপর কোন নারীর চরণ ধূলি আনিয়া তাঁহার শিরে দিলেই ঐ পীড়া আরোগ্য হইবে। দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ একখানা রেকাব নিয়া রুক্মিণী দেবীর নিকট তাহার পদধূলি চাহিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার পদধূলি তাঁহার পতি শ্রীকৃষ্ণের মাথায় দিতে হইবে তখন তিনি মহর্ষিকে বলিলেন যে, তাঁহার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? তিনি স্ত্রী হইয়া তাঁহার পদধূলি তাঁহার স্বামীর মাথায় দিলে তাঁহার কি নরক হইতে উদ্ধার আছে? নারদ বলিলেন যে, "তবে তো শ্রীকৃষ্ণের শিরঃপীড়া কিছুতেই আরোগ্য হইবে না, এইরূপ ভাবেই তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইবে।" রুক্মিণী দেবী বলিলেন যে, তিনি তাহার কি করিবেন; তখন দেবর্ষি আর কি করেন? তিনি রেকাবখানা লইয়া তথা হইতে ক্রমান্বয়ে সমস্ত মহিষীদের নিকট গেলেন; তৎপরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণের শিরে দেওয়ার জন্য পদধূলি দিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে গেলেন "গোয়ালিনী পাড়া।" (মহিষীগণ এবং তজ্জন্য দেবর্ষি স্বয়ংও ব্রজ-রামাগণকে গোয়ালিনী বলিতেন)। শ্রীকৃষ্ণের পীড়া আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক দেখাইয়া ১০।১২ দিন কষ্ট দিয়াছেন শুনিয়া ব্রজরামাগণ ব্যথিতচিত্তে মহর্ষিকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্যারাম হইয়াছে এবং তাঁহার ইচ্ছা না হইলে এই ব্যারাম যাইবে না; সুতরাং সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে এতদিন কষ্ট দেওয়া তাঁহাদের উচিত হয় নাই।" তখন নারদ বলিলেন যে অবশেষে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; কিন্তু কোন রমণীই তাঁহাকে পায়ের ধূলি দিতে স্বীকার করে নাই। তাহা শুনিয়া সমস্ত ব্রজরামাগণই পদধূলি দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলেন। নারদ তো অবাক্! তিনি বলিলেন, "তোমাদের কি নরকের ভয় নাই? তোমাদের চরণ ধূলি শ্রীকৃষ্ণের মাথায় দিলে তোমাদের কি আর উদ্ধার আছে?" তখন ব্রজরামাগণ হাসিয়া উঠিলেন এবং দেবর্ষিকে বলিলেন, "তুমি তোমার ঠাকুরকে বলিও যে, তাঁহার সৃষ্ট যত নরক আছে এবং আর যত নরক সৃষ্টি

করা তাঁহার সাধ্যে আছে তাহা করিয়া অনন্ত কালের জন্য তিনি আমাদিগকে 'সেই সমস্ত নরকের মধ্যে রাখুন, কিন্তু দোহাই ঠাকুরের, তাঁর যেন আর কোন দিন ব্যারাম না হয়।"

রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া সবিস্তারে সেই "ব্রজলীলা" শ্রবণ করার জন্য একদিন রোহিণী মা কে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া পড়িলেন।

[ব্রজলীলা যেখানে এবং যতদূরেই কীর্ত্তন হউক না কেন, রামকৃষ্ণ সেখানে না যাইয়াই পারেন না এবং তাহাদের সম্মুখে "মা" হইয়া কিরূপে তাহাদের প্রেমের লীলা কীর্ত্তন করিবেন, তাই দুই ভাই যখন বাহির বাটীতে দরবারের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন সুভদ্রাকে সিংহদরজায় প্রহরী রাখিয়া রোহিণী মা তাঁহাদের নিকট ব্রজলীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। আর কি রাম-কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ দরবারের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তঃপুরের দিকে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু 'মা'র আদেশ জানাইয়া সুভদ্রা দেবী তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। মাতৃ আজ্ঞা, কাজেই তাঁহারা দুই ভাই দরজায় সুভদ্রা দেবীর দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্রজলীলা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বিরহের লীলা কীর্ত্তিত হইতেছিল তখন তাঁহাদের তিন জনের হস্ত পদাদি দেহের ভিতর প্রবেশ করিল। এবং প্রত্যেকেরই চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মিলনের সংবাদ শুনিয়া আবার হস্তপদাদি বাহির হইয়া আসিল। জগৎ জীবের পরম বান্ধব দেবর্ষি নারদ ঐ মনোহর রূপ দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, জগৎবাসী ঐ রূপ দেখিয়া ধন্য হউক। ওদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকটও ঠাকুর অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। তাই নীলাচলে অর্চ্চা— বিগ্রহরূপে 'জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার' প্রকাশ।

শিশুপাল ও দন্তবক্র কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধের অত্যন্ত অনুগত, সুতরাং তাঁহারাও কৃষ্ণদ্বেষী, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। জরাসন্ধের

অনুরোধে শিশুপালের সঙ্গে ভীষ্মক রাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হয় এবং শিশুপাল বরবেশে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী দেবী ইতিপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করায় রুক্মিণী দেবীর পত্রানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। কাজেই শিশুপালকে অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের 'রাজসূয়' যজ্ঞে যখন শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠপূজা দান করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল তখন শ্রীহরির এইরূপ সম্মান শিশুপালের কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া মুখে যাহা আসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে অপরাপর রাজারা শিশুপালকে বধ করার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিয়া স্বয়ং সুদর্শন চক্রদ্বারা তাঁহার মাথাটী কাটিয়া ফেলিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিশুপালের মধ্য হইতে এক জ্যোতিঃ বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। শিশুপালের মৃত্যু সংবাদ তাঁহার ভ্রাতা শাল্ব প্রভৃতির নিকট পৌঁছিল। শঙ্করের আরাধনা করিয়া শাল্ব একখানা 'মায়ারথ' পাইয়াছেন, জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্রই যাইতে পারেন। তিনি সেই রথ নিয়া সৈন্য সামন্ত সহ দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোকের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুদর্শন চক্রদ্বারা শাল্বকে বধ করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে দুই ভাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া পাপমুক্ত হইলেন।

উপরে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিতেছে যে, বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করেন, কাত্যায়নী পূজা করেন, কালী (কৃষ্ণকালী) পূজা করেন এবং ব্রজকুমারীগণ ভদ্রকালীর পূজা করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২২)

কিন্তু ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি। আমার দয়াময় ঠাকুরও—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে, না হইবে তৎপর
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণভক্তি বর ॥"

এই উপদেশটীর প্রতি সমস্ত ভক্তের মনোযোগ বিশেষ রূপ আকর্ষণ করিয়াছেন। (পঃ ১।১৫)

আবার, এমন কে শাক্ত আছেন যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে "ওঁ বিষ্ণুঃ"—"ওঁ তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি স্থরয়ঃ।" "যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।" "শ্রীবিষ্ণু প্রীত্যর্থম্" ইত্যাদি মন্ত্র ব্যবহার না করেন এবং মৃত্যুর সময় "হরি" "রাম" কি "হরে কৃষ্ণ রাম" নাম উচ্চারণ না করেন বা অপরাপর লোক মুমূর্ষুদের কর্ণে ঐ নাম না দেন? আবার প্রায় প্রতি শাক্তের বাড়ীতেই নারায়ণ শীলা, লক্ষ্মী নারায়ণ স্থাপিত আছেন ও ভক্তি সহকারে পূজিত হইতেছেন। অনেক শাক্তই বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেও বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন।

এই স্থানে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না ঃ—

দুই ভাই—বড় ভাই শাক্ত, ছোট ভাই বৈষ্ণব। বড় ভাইয়ের স্থাপিত কালী মূর্ত্তি, আর ছোট ভাইয়ের স্থাপিত কৃষ্ণ মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ ঘরে বিরাজ করিতেছেন। যদিও তাঁহারা পৃথকান্নভুক্ত, তত্রাপি বাড়ীর বাগান, গাছপালা কিছুই বণ্টন হয় নাই। এজমালী বাগানে বড় একছড়া সবরী কলা হইয়াছে। উভয় ভ্রাতাই মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে ঐ কলা নিজ নিজ ইষ্টকে দিবেন। কিন্তু ছোট ভাইকে কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতে হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পান যে, দাদা ঐ কলা তাহার কালীকে দিয়াছেন। মনে বড়ই রাগ এবং দুঃখ হইল। তিনি তাঁহার কৃষ্ণের নিকট যাইয়া "ওরে বেটা, মনে বড় সাধ ছিল যে ঐ কলা তোকে খাওয়াব। আর তুই কিনা কলা পাকিবার সময় আমাকে দূরদেশে পাঠাইয়া দাদাকে দিয়া ঐ কলা কালীকে খাওয়াইয়াছিস্? আমি আর জীবন রাখবনা" বলিয়া বিগ্রহের সম্মুখে ধন্না দিয়া রহিলেন। প্রত্যাদেশ হওয়ায় উঠিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণকে কোলে করিয়া কালী ঐ সবরী কলা তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন। মনের আনন্দে তিনি দাদাকে

ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন। দাদা মুখে আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি রাগিয়া তাঁহার কালীর নিকট যাইয়া "ওরে বেটী কলা দিয়াছি তোকে খাইতে, আর তুই কিনা সেই কলা নিজে না খাইয়া কৃষ্ণকে খাওয়াইয়াছিস্! আমি আর এ জীবন রাখ্‌ব না" বলিয়া মূর্ত্তির সম্মুখে ধন্না দিয়া রহিলেন। প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়াই দেখেন যে, কৃষ্ণ কালীকে কোলে করিয়া ঐ সবরী কলা তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন। তিনি ছোট ভাইকে ডাকিয়া দেখাইলে—ছোট ভাই বলিলেন, "দাদা, ও দাদা! যত বিবাদ তো দেখি আমাদের মধ্যে। কিন্তু ওদের (কৃষ্ণ এবং কালীর) মধ্যে তো কোনই বিবাদ নাই। বেশ মিল আছে তো!"

প্রকৃত পক্ষেই শাক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে যে বিবাদ তাহা কেবল আমার মত অপক্ক লোকদের মধ্যেই। উন্নত স্তরের লোকদের মধ্যে সে সব কিছুই নাই। শক্তিমান্‌কে অবমাননা করিয়া শক্তি পূজা চলে না, আর শক্তিকে অবমাননা করিয়াও শক্তিমান্‌কে পূজা করা চলে না। তাই বৈষ্ণবগণ শাক্ত কি শক্তি মূর্ত্তিকে কোনদিন ঘৃণা করেন না। অবশ্যই উভয়ের ভজনের মধ্যে প্রভেদ আছে। বৈষ্ণবগণ প্রথমে নাম মন্ত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবান্‌কে পান, তৎপরে তাঁহার পূজা করেন।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ—
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ"
"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন—আপনি শ্রীহরি॥" (নঃ ঠাঃ)
"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"
"বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ
তেমতি ভক্তের—পাছে ধায় জনার্দ্দন।" (নঃ ঠাঃ)

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়োভক্তৈর্ভক্ত জন প্রিয়ঃ ॥"
মদ্ভক্তাঃ যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ ॥" (আদি পুরাণ)

বৈষ্ণবদের পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তি ; যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন জন্মে জন্মে তাঁহার সেবার অধিকার পাওয়া। তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না।

"ন ধনং ন জনং ন স্নুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥" (শিক্ষাষ্টক)

ভক্তের প্রেম রস সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে সেই প্রেমরস-নিমগ্ন রসিক ভক্ত ডুবিয়া থাকেন—শ্রীগোবিন্দের সেই পরম স্নুন্দর নিত্য কিশোর (বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন) নটবর শ্যামস্নুন্দর মদন মোহন মূর্ত্তিতে এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি-স্বরূপা প্রেম ভক্তির মূর্ত্তি নিত্যকিশোরী (১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন বয়স্কা) শ্রীশ্রীরাধামূর্ত্তিতে।

একদিন একজন আগন্তুকের প্রশ্নে আমাদের ঠাকুর এক কথায় উত্তর দিয়াছিলেন যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের Power house (কল ঘর)।

শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানেন,

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ স্নুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥
যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈবহি ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥"

(বরাহ পুরাণ

এমন কি ইউরোপ আমেরিকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এখন এই শ্রীগীতা সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে যিনি যেমন অধিকারী তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ভজনেরই উপদেশ আছে। গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর পরমাত্ম জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৪ হইতে ৬৯ নং শ্লোকে গুহ্যতম উপদেশগুলি বর্ণিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি তৎপ্রতি আর একবার আকর্ষণ করিতেছি।

৬৬নং শ্লোকটী :—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা সকলেই জানি, কিন্তু হয় আমরা শ্রীভগবানের সেই শেষ উপদেশের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেই না, না হয় মনোমত অর্থ করিয়া (বিশেষতঃ "মাং" এই শব্দটীর) আমরা বঞ্চিত হইয়া যাই। যদিও শ্রীশ্রীভক্তি দেবীর কৃপা পাইয়া এই পথে অগ্রসর হওয়ার অধিকার আমার জন্মে নাই তথাপি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে এই পথের পথিকই পরাশান্তি লাভের অধিকারী। অপর কোন পথে এইরূপ শান্তি পাওয়া যাইতে পারে কি না আমার জানা নাই। আমরাও এখন জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া দিন গণনার মধ্যে পড়িয়াছি। সুতরাং এখন আমাদের একটা নিকাশ নেওয়া এবং বুঝাপড়া করা দরকার যে আমরা এই পর্য্যন্ত যে ভাবে চলিয়াছি তাহাতে প্রকৃত শান্তি পাইয়াছি কিনা এবং অন্ততঃ পক্ষে পথের সম্বলের যোগাড় করিয়া লইতে পারিয়াছি কিনা! মাত্র দু'দিনের জন্যও যদি আমাদের কোন স্থানে যাইতে হয় তবে কি খাইব অন্ততঃ চিড়া গুড় ইত্যাদির এবং থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্তের জন্য বিব্রত হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের চিরযাত্রার সময় যে উপস্থিত হইয়াছে তখন পথের সম্বল এবং থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্তের জন্য কি একবারও চিন্তা করিয়া থাকি? আর সময় নাই—স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই সঙ্গে যাইবেন না।

তাঁহারা যখন আমার দেহ পোড়াইয়া অথবা মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিবেন, তখন, তখন, তখন? তাই বলি সাধু সাবধান! এমন কি মায়াবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও শেষকালে তাঁহার 'চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রে' তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন—

"দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ু॥১
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥ ধ্রু
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ রাত্রৌ চিবুক-সমর্পিত-জানুঃ।
করতল ভিক্ষা তরুতল বাস স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পাশঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)২

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত স্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জর দেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)৩

জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বর-বহুকৃত বেশঃ।
পশ্যন্নপি নহি পশ্যতি মূঢ়, উদর নিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৪

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজল সব কণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চ্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৫

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পিণ্ডম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৬

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৭

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াপারে পাহি মুরারে॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৮

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ৯

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কনীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১০

নারীস্তনভরণাভিনিবেশং, মিথ্যা মায়া-মোহাবেশম্।
এতন্মাংস-বসাদি বিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্॥

(ভজ গো[illegible]ন্দমিত্যাদি) ১১

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী [illegible] ম তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্ব[illegible]গরম্॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১২

গেয়ং গীতা নাম সহস্রং, ধ্যেয়ং **শ্রীপতি** রূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জন সঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীন জনায় চ বিত্তম্॥

(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১৩

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১৪

সুখতঃ ক্রিয়তে রামা ভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১৫

রথ্যা কর্পট বিরচিত কন্থঃ, পুণ্যা-পুণ্য-বিবর্জ্জিত পন্থঃ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোক স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১৬

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞান বিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্ম শতেন॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ১৭

দয়াময় ঠাকুর আমার শ্রীচৈতন্য লীলা সম্বন্ধেও আমাদিগকে বহু বহু মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন। মনে বড়ই সাধ ছিল যে শ্রীকৃষ্ণ লীলার পর শ্রীচৈতন্য লীলা আলোচনা করিব। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর গ্রন্থের মূল বিষয় কিছুই আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাদা, প্রধানতঃ যাঁহার প্রেরণায় আমি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তিনি আমাকে লিখিয়াছেন "এবার বাজারে কাগজের দাম ইহার মধ্যেই প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং পুস্তকের আকার অত্যধিক বৃহৎ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।" তাই মনের দুঃখ মনে রাখিয়া মূল বিষয় যতটুকু সম্ভব আলোচনা করতঃ এই গ্রন্থ শেষ করিতে হইবে।

———



Sree Sree Thakur Haranath

(From a Photo taken at 15 Chunapukur Lane, Calcutta in September, 1914.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ১৯২৬ সনের আনন্দ-মিলন পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারী রাত্রে আনন্দ-মিলন উৎসব দর্শনান্তে সোণামুখী হইতে রওয়ানা হইয়া ২রা জানুয়ারী কলিকাতা পৌছি। তথা হইতে ৪ঠা জানুয়ারী রওয়ানা হইয়া ৫ই জানুয়ারী বরিশাল পৌছিয়া সরকারী কার্য্যে যোগদান করি।

তৃতীয় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় অমি নিবেদন করিয়াছি যে শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার আরোগ্য কামনায় রাধানগরের রামগোপাল দাদা অগ্রণী হইয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করতঃ একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞটী সম্পন্ন করিতে ২১ দিন সময় লাগিয়াছিল। যজ্ঞে ফলও হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—"Your love has not allowed me to go away. I have been given a fresh extension." কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ঠাকুরের স্বাস্থ্য পুনরায় ভঙ্গ হওয়ায় জল-বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য বোম্বে ভ্রাতাদের একান্ত অনুরোধে ঠাকুর ১৯৩৭ সনের ১০ই জানুয়ারী সোণামুখী হইতে বোম্বে রওয়ানা হইয়া যান।

৺রামগোপাল ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)

উপরে যে রামগোপাল দাদার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি আর এ মর জগতে বর্ত্তমান নাই। গত ৩রা জানুয়ারী তিনি তাঁহার স্বধামে (ঠাকুরের চরণান্তিকে) চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ১।৩৮, ১৪২, ১৪৪ ও তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা ও ১১৬ পৃষ্ঠায় অতি সামান্যাকারে

কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে। বরিশাল আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কে কে বরিশাল যাইবেন তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আমায় লিখিয়াছিলেন………"তবে রাধানগরের গোপাল যাবে। সে একাই মাতিয়ে রাখিবে।……" ঠাকুরের এই এক কথাতেই বুঝা যায় যে, রামগোপাল দাদা কত উচ্চস্তরের ভক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক। যেমন ছিলেন একজন সুগায়ক, তেমনি ছিল তাঁহার গান রচনা করার শক্তি। ঠাকুরের উপর তাঁহার কিরূপ অগাধ ভক্তি ছিল তাহা তাঁহার রচিত শত শত মর্ম্মস্পর্শী গান চিরকাল জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিবে। আবার তিনি যখন স্বয়ং ভাবে বিভোর হইয়া ঐ গানগুলি গাহিতেন, তখন তো কথাই নাই—সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বাড়ী ঘর স্বজন সব ভুলিয়া ঐ গানের ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের যাহা অবস্থা হইত তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার মত লোকের পক্ষে অসাধ্য। তাই, ঠাকুর আমাকে লিখিয়াছিলেন "সে একাই মাতিয়ে রাখিবে।" তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পরম ভাগবত, তাই তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হইয়া পুরী, উলুবেড়িয়া, দেউলটী প্রভৃতি স্থানের জন্মোৎসব পূজায় পৌরহিত্য করিয়াছেন। গত বৎসর খড়গপুর উৎসবেও তিনিই পুরোহিত হইয়াছিলেন। পূজা আরম্ভের অল্প কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বহু বহু উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও তিনি হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া তন্ত্রধারকের কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। এ কার্য্য আমি পূর্ব্বে কোন দিন করি নাই এবং আমি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও এ হেন ভাগবতের আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না; তাই আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর লোকের ভিড়ে এত নিকটে যাওয়ার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু গত বৎসর রামগোপাল দাদার নিকটে থাকিয়া তাঁহার পূজা ও তৎকালীন তাঁহার ভাব ভক্তি দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রীশ্রীদয়াময় ঠাকুর নিশ্চয়ই এ হেন ভক্তকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন।

হরনাথকে তিনি কিরূপ ভাবে মন্থন করতঃ রস আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং করাইয়াছিলেন তাহার সামান্য একটু দিক্-দর্শন জন্য স্থানাভাবে তাঁহার রচিত দুইটী মাত্র গান নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল ঃ

বাউলের সুর

"ধন্য হরনাথ ! তোমার লীলায় করি প্রণিপাত,
তুমি গেরস্তকে সঁতর করে কর চোরের সঙ্গে মুলাকাত।
তোমার লীলা লহরী (বল) কে বুঝ্‌বে হরি,
ষোল আনা বজায় রেখে কর মূলকাঠি চুরি ;
(তুমি) ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে মুচির কর্লে জাতঃপাত।
কেউ বলছে গোপনে, ও সে অতি যতনে,
ঐ দলেতে যাবি কিন্তু থাকৃবি সাবধানে,
(তাদের ঘরের রাজা বাইরে এসে কিস্তি খেয়ে হ'চ্ছে মাত) ॥
কেউ সযতনে "হর" নাম বল্‌ছে বদনে,
কুসুম হর নাম শুনে কেউ হাত দিচ্ছে কাণে ;
(আবার) কেউ বা ছুটে পালিয়ে গিয়ে—
বলে একি অভ্যপাত !

বিচার বুদ্ধি বল কেউ কর্ত্তেছে প্রবল,
কেউ বলে ভাই বিচার ক'রে কিবা আছে ফল ?
বিচার ক'রে বুঝতে গেলে আসলে হবি হাবাত ॥
কেউ বলছে সম্প্রতি এ কেমন রীতি—
প্রসাদ বলে খাওয়া খায়ি জাতি বেজাতি
(আবার) কেউ বলে ভাই পেট ভরে খাই
কি হবে আর রেখে জাত !'

(যাঁরা) হর মহিলা, তাঁদের অকাট্য লীলা,
যে যেমন ভাবে ভাবে তাকে দেন তেমন খেলা ;
ও যে তাঁদের চরণ করে স্মরণ তাকেই করে আত্মসাৎ ॥
(প্রভু তোমার) এই যে লীলাটি এতে নাই লাঠালাঠি
বাঘ বরাবর মানুষ সকল হ'য়েছে মাটি,
এই সা লীলা যো সমজে সো বোল্‌তা হ্যায় ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ॥
গোঁসাই রাধা বল্‌ছে সজোরে কৃষ্ণ শোন বলি তোরে
(তুই) হর নামের তরী ধরে চল ভব পারে ;
(তুই) বুঝেছিস্ কি, বুঝ্‌বি বা কি, সকল হরনাথের হাত ॥"

———

"পাগলের হাওয়া লেগেছে গায়, জাত কুল মান থাক্‌বে কিসে !
(আমি) ভাল মন্দ বাছ্‌তে গেলে প্রাণে প্রাণে হারাই দিশে ॥
মনে করি ভালয় থাকি,
পাঁচের ভালয় হই গো সুখী ;
সোণামুখীর পাগল ঠাকুর আমার গতিক দেখে হাসে ॥
যে সে পাগল নয় সে পাগল,
জগতকে ক'রেছে পাগল,
নামেও পাগল কাজেও পাগল এসেছে বিশ্বে।—
সেই পাগলের খাম-খেয়ালে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলে ;
ধরলে চরণ অবহেলে পারে লয়ে যায় গো শেষে ॥
সঙ্গে ল'য়ে ভূতের মেলা,
শ্মশান ভূমে করে খেলা ;
নামটী তাঁর পাগল ভোলা

থাকেন কৈলাসে—
সে পাগল যাঁর নামে পাগল
হরনাথ সেই পাগলের পাগল,
কি বিদ্যা বল, কি বুদ্ধি বল, তাঁর নাছ দুয়ারে কাঁদছে বসে।
মাথায় জাত কুল মানের বোঝা
মানুষ কে করেছে কুঁজো
হালকার মাথায় কত মজা
বুঝ্‌বে কেন সে—
যে দিয়েছে জাত কুল মান,
হরনাথ সেই দয়ার নিধান,
না করে তাঁর গুণ প্রণিধান চল্‌ছে জগৎ মায়ার বশে॥
পাগ্‌লী মা কুসুমকুমারী
ত্রিজগতের অধীশ্বরী
আনন্দে বিচরণ করি হর উরসে—
প্রেমের ভাঁড়ার লুটিয়ে দিতে
পাগল হরনাথের সাথে
এসেছেন আজ অবনীতে গোপাল মজা দেখ্‌ছে বসে॥"

———

রামগোপাল দাদার বাড়ী রাধানগর, জিলা মেদিনীপুর। রাধানগর "হরনাথ আশ্রম" হরনাথ জগতের একটী পীঠস্থান ও ঠাকুরের অতি প্রিয় স্থান। প্রত্যেক বৎসর Good Fridayর বন্ধের সময় বার্ষিক উৎসব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতি বৎসরই এই উৎসবে যোগদান করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীও ঠিক সেইরূপই করিতেছেন। সুদূর মান্দ্রাজ এবং বোম্বে হইতেও বহু ভক্তগণ আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করতঃ পরানন্দ উপভোগ করেন। ঐ আশ্রমে থাকাকালীন ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন "ঔষধে আমার কিছুই

উপকার হইবে না, তবে এই **আমার সোণার আশ্রম রাধানগরের** মাটীতে বড়িটী ঘষিয়া আমাকে সেবন করাও, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে।" এ হেন আশ্রম স্থাপন করিয়া যাওয়ার জন্য রামগোপাল দাদার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গীত সংগৃহীত হইয়া "হরগাথা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠায় আমি নিবেদন করিয়াছি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন দ্বারা আনন্দ প্রদান করার জন্য ৪টী বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যেও সেইরূপ ৪টী সম্প্রদায় ছিল। প্রথম সম্প্রদায়ের কর্ত্তা ছিলেন উপরোক্ত রাম গোপাল দাদা, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের কর্ত্তা ঃ—

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতি দাদা ঠাকুরের স্বগ্রাম সোণামুখীর মুখোপাধ্যায় বংশজাত। সোণামুখীর লোক কিরূপ গোঁড়া শাক্ত তাহা অঃ ৩।২১১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভূতি দাদা বাল্যকাল হইতে ঠাকুরকে দেখিয়া দেখিয়া ঠাকুরের গুণে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়াছে হরনাথকে তিনি যে ভাবে চিনিয়াছেন সেই ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে শত শত গান রচনা করিয়া নিজে একটী গোপীযন্ত্র লইয়া ঐ গান গাহিয়া গাহিয়া ঠাকুরকে এবং ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখা এবং নিজেও তাহাতে ডুবিয়া থাকা। গান গাহিবার সময় তাঁহার চক্ষু আদির যেরূপ অবস্থা হয় তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে। এখনো আমার চোখের উপরে তাহা ভাসিতেছে! স্থানাভাবে তাঁহার রচিত দুইটী মাত্র গান নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল।

গৌরী একতালা

"আর পারবে না ভুলাতে।
তুমি ব্রজের বাঁকা কাল সখা
পেরেছি চিনিতে॥

গোকুল আকুল ক'রেছিলে মোহন বাঁশরীতে,
বাজাতে রাধা বলে কদম তলে
গোপীর মন মজাতে ॥
বেজেছে গো প্রেমের বাঁশী
আবার সেই স্বরেতে।
একবার যে শুনেছে সেই মজেছে
তোমারই প্রেমেতে ॥
(তোমার) ভক্ত তরে কেঁদেছে প্রাণ
বাকী নাই বুঝিতে।
(এলে তাই) গোলক ত্যজে, ধরা মাঝে
প্রেমময়ী লয়ে সাথে ॥
জ্ঞানের নয়ন ফুটেছে গো
তোমারই কৃপাতে,
তুমি রাম শ্যাম হে গুণধাম
গৌর নদীয়াতে ॥
আর কেমনে লুকাবে ঠাকুর
জেনেছে জগতে
ওহে ননীচোরা পড়েছ ধরা
ছাড়ব না প্রাণ থাকিতে ॥
আর কি বিভু ভোলে তোমার
ছল কি চাতুরীতে ?
এখন লুকোচুরি পরিহরি
রাখ চরণেতে ॥"

খাম্বাজ ঠুংরী

"জয় শচী নন্দন অধম তারণ
জয় জয় শ্রীগৌর হরি ॥
পাপী-তাপী-গণ তারণ কারণ
হরনাথ রূপে অবতরি ॥
জয় দয়াময় অনাথ আশ্রয়
স্নেহময় তুমি প্রেম অবতরি,
গোপী-মন-মোহন যশোদা-জীবন
মোহন মূরলী ধারী ॥
পতিত পাবন ভক্ত প্রাণ ধন
হরিনাম প্রেম বিতরণকারী।
জয় হে হরনাথ হর পাপ তাপ যত
দয়াময় ভরসা তোমারি ॥
অপার করুণা রাশি স্বগুণে প্রকাশি আসি
মাতায়েছ প্রেমে ধরা নদীয়া বিহারী ॥
সোণামুখী ধাম মাঝে রাজিছ যুগল সাজে
জয় হর কুসুমকুমারী ॥
কৃপাবিন্দু বিতরণে এ দীন হীন জনে
বঞ্চিত ক'র না বাঞ্ছা-পূরণ-কারী।
জয় কুসুম হর প্রেম ভিক্ষা বিতর
বিভু নামে এসেছে ভিখারী ॥

বিভূতি দাদা সর্ব্বদাই প্রভুর নিকটে আসিতেন। তাই ঠাকুরের মনোগ ভাব বুঝিয়া তদনুযায়ী গান প্রস্তুত করতঃ সেই গান গাহিয়া ঠাকুরের আন বর্দ্ধন করিতেন।

"যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥" (চৈঃ চঃ)

তৃতীয় দলের কর্ত্তা ঃ—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন সেন

হরনাথ জগতে ইনি "পাগল ভাই" বলিয়া পরিচিত, সুকবিরাজ, সুপণ্ডিত, সুকবি এবং সুগায়ক। ঠাকুরের জন্য তিনি প্রকৃতই পাগল, এবং তাঁহার উদ্দেশে শত শত সুমধুর গান রচনা করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। তথাপি ঠাকুরের উৎসব যতদূরেই হউক না কেন তাঁহার যাওয়া চাই-ই এবং ঠাকুরও অভাবনীয় উপায়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গে একটী শ্রীখোল এবং করতাল তো যাইবেনই। তিনি কোন সভা সমিতিতে যোগদান করা কি অন্য কোন কার্য্যের ধার ধারেন না। দিন নাই, রাত্র নাই, কেবল ঠাকুরের গুণগান কীর্ত্তন; ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই। প্রত্যেক উৎসবের পরই দেখিয়াছি যে দিবারাত্র গান করার জন্য এমন ভাবে তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া যায় যে গলা হইতে আর স্বর বাহির হয় না। গান করার সময় তিনি এমন ভাবে তন্ময় হইয়া যান যে, তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। একদিন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে বসা অপর একজন ভক্তের সঙ্গে অতি জরুরী বিষয়ে একটী কথা খুব ছোট করিয়া বলিতে আরম্ভ করা মাত্রেই তিনি আমার উপর চটিয়া আমাকে সংশোধন করার জন্য এমন ভৎর্সনা করিয়াছিলেন যে তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। সার্থক তাঁহার 'পাগল ভাই' নাম ধারণ। তিনি এখন বাগবাজার হরনাথ পাঠশালায় শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষা দিয়া ধন্য করিতেছেন। তিনি কিরূপ উচ্চস্তরের ভক্ত তাহা তাঁহার স্বরচিত শত শত গানের মধ্যে একটী গান

শুনিলেও বেশ বুঝা যায়। স্থানাভাবে তাহার দুইটী মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"হরনাথ দাও আমায় সে প্রাণ।
আমি হাসিব, খেলিব, নাচিব, গাইব,
রচিব তোমার গান ॥

শিশুর নিকটে শিখি সরলতা,
জননী সকাশে শিখি হে মমতা,
সখা প্রেম সনে মাখি তব প্রেম,
(যেন) হই তোমাগত প্রাণ ॥

দাম্পত্য হইতে শিখি প্রেমভাব
বাল্য সরলতা গঠিয়া স্বভাব—
দেখি যথা তথা তোমারি প্রভাব
(হবে) স্বার্থ দৃষ্টি অবসান ॥

শিখি তোমা হ'তে আদর্শ করুণা
তন্ন তন্ন ক'রে বিলাইব কণা
সর্ব্বজনে যেন দেখি নিজ জনা
করি—পরার্থে জীবন দান ॥

সম্পদ তোমাতে রাখিব
দরিদ্রতা রস সাধে লুটে খাব
সম্পদে বিপদে তোমাতেই রব
করি বিপদে তৃণ জ্ঞান ॥"

বাহার একতালা

"আমার জীবন-তরীব কাণ্ডারী
সব সুখ-দুঃখ-ভাণ্ডারী,
আমার দুঃখে শান্তি, জীবনে ক্লান্তি
বেদনা ভয় হারী ॥

(আমার) হাসিটুকু তুমি প্রাণে,
অশ্রু শোকের গানে,
আমার নয়নে অঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন
চিত পুলকিতকারী ॥

মম মানস কুঞ্জবন
তাতে পাত চির-আসন,
হেরিয়া তোমার প্রেম আনন,
ঝরুক প্রেমাশ্রু বারি ॥

(আমার নয়নে প্রেমাশ্রু বারি) ।
হরনাথ নাম প্রতি নিশ্বাসে ;
যেন সদা মম হৃদয়ে পশে
প্রাণ খুলে যেন মুক্ত বাতাসে
গাই জয় হর-হরি ॥"

উপরোক্ত মহাজন তিনজন যখন ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদের স্বরচিত বলী গান করেন তখন তাঁহাদের শরীর হইতে রীতিমত অশ্রু, কম্প, পুলক, দাদি নির্গত হয়। ভাব যখন চারিদিক হইতে পুষ্ট হয় তখন তাহার য় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবগুলির সহিত মিলিত হইয়া নাম পায় রস। শ্রীশ্রীঠাকুরে নাবিষ্টতা হেতু তাঁহারা সেই রসে ডুবিয়া যখন গান করিতে থাকেন তখন

আমার মতন লোকেরও বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে তাঁহারা কা
যশঃপ্রার্থী হইয়া গান রচনা করেন নাই। তাঁহাদের নিজের অনুভূতি এ
প্রাণের আবেগে তাঁহাদের প্রাণের কথাগুলিই গানাকারে রচনা করিয়াছে
তজ্জন্যই আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু না লিখিয়া তাঁহাদের রচি
২।১টী গান দ্বারাই তাঁহাদের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

চতুর্থ দলের কর্ত্তা :—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি ই, বি, রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী। তিনিও একজন পুরাত
ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বোম্বে, নাগপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, জামালপু
বরিশাল, আঠার বাড়ী, সুন্দাইল, ময়মনসিংহ, ঘাটাইল, শান্তিপুর, মুর্শিদাবা
নবদ্বীপ, কাল্না, মহাত্মা অটলবিহারী নন্দীর বাড়ী, বলাগড়, কিশোরীগ
পুরী প্রভৃতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ ঠাকুরের সঙ্গ লা
করিয়া আনন্দময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি
লাগিয়াই আছে। কোনরূপ দুঃখ কষ্টে, এমন কি স্ত্রী বিয়োগেও তাঁহা
কোনরূপ অভিভূত করিতে পারে নাই। তিনি নিজে গান রচনা করিে
পারেন বলিয়া আমার জানা নাই। তবে রাণাঘাট অঞ্চলের বহু ভক্ত নি
তাঁহার একটী গানের দল আছে। তাহাদিগকে নিয়া ঠাকুর সম্বন্ধীয় রচি
গান গাহিয়া গাহিয়া নিজেও আনন্দে ডুবিয়া যান এবং শ্রোতাদিগকেও আন
ডুবাইয়া রাখেন। হরনাথ-জগতে তিনি "বসন-ভোজন"এর "বসন"
"ভোজন"—(৺আশুতোষ বাগ্‌চী) আর এ জগতে নাই। ইহাদের দুজনে
প্রধান কাজ ছিল নানারূপ চুট্‌কী কথা ও আজ্‌গুবি গল্প করিয়া ঠাকুরে
আনন্দ প্রদান করা। বসন্ত দাদা একজন সুবিখ্যাত Caricaturi
(অতিরঞ্জক, উপহাসক)। প্রত্যেক কথার মধ্যেই হঠাৎ এমন একটী ক
বলিবেন যে শ্রোতারা আর না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। তাহ

র্শন স্বরূপ "হরনাথ-স্মৃতি" দ্বিতীয় লহরীতে লিখিত তাঁহার নিজের একটী বন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"(বক্তা—শ্রীবসন্তকুমার গাঙ্গুলী, রাণাঘাট)

রাধানগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই বৎসর তথায় প্রথম উৎসব। প্রহর ব্যাপী নাম কীর্ত্তন হইতেছে। ঠাকুর তাঁহার কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। কিন্তু এক সমস্যা উপস্থিত হইল। হরনাথ ভক্তগণের ধ্য ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থও আছেন, সকলেই ঠাকুরের কাছে একত্র প্রসাদ ন; ভক্তগণের মধ্যে উচ্চ নীচ জাতি বিচার নাই। "অতএব ইঁহারা তত, ইঁহাদের সহিত একত্র ভোজন নিষিদ্ধ"; এই আপত্তি তুলিয়া হিরের কেহই উৎসবে যোগ দিলেন না। কেবল ভক্তগণকে লইয়াই প্রথম নের উৎসব হইল।

আশ্রমগৃহের সম্মুখে বৃহৎ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সেই মাঠ পার হইয়া এক সিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ, ঠাকুর যেখানে ভক্তগণ মাঝে বসিয়াছিলেন সেইখানে াসিলেন এবং স্বদলমধ্যেও জাতিভেদত্যাগ অত্যন্ত অনুচিত ইহা শাস্ত্র ক্য দ্বারা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর উত্তরে এই মর্ম্মে বলিলেন যে খানে হৃদয়ের স্পন্দন নাই সেখানে শাস্ত্র বাক্য দ্বারা যন্ত্রবৎ চালিত হইতে হয়। ন্তু যেখানে হৃদয়ের ভালবাসা ও আকর্ষণ সেখানে একত্র পান ভোজন বশ্যম্ভাবী। Love knows no distinction. ভালবাসার কাছে ছোট ড়র বিচার নাই। স্বয়ং কৃষ্ণকেও কুঞ্জ ত্যাগের আদেশ হইয়াছিল, "যাহি ধব যাহি কেশব" ইত্যাদি।

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব-ফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুল॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞা
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥ (চৈঃ চঃ)

ব্রাহ্মণ পুনরায় শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। প
বসিয়াছিলাম, বলিয়া ফেলিলাম "পণ্ডিতে হি গুণাঃ সর্ব্বে, মূর্খে দোষ
কেবলম্; পণ্ডিতের সকলই গুণ, দোষের মধ্যে কেবল একটু মূর্খতা!"

পণ্ডিত মহাশয় এই অভদ্রতায় অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং 'ইহারা
আপনার ব্যাধি! আপনি ইহাদের লইয়াই আছেন এবং থাকুন!! আপ
নিকটে আসাই আমার অন্যায় হইয়াছে!!!' ক্রোধভরে ঠাকুরকে এই
বলিয়া সে স্থান তখনি ত্যাগ করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইলে ঠাকুর আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।
মানী লোকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ি
আসিয়াছিলেন তিনি গ্রামের সকলের সম্মানাস্পদ, নিষ্ঠাবান, সরল ও শাস্ত্র
তাঁহাকে অসম্মান প্রদর্শন করা অতি অন্যায় হইয়াছে বলিলেন। আমি
উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া কেবল মাত্র বলিলাম "আপনি বলাইয়াছেন, বলিয়াছি

পরদিবস মধ্যাহ্নে ঠাকুর স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন স
দেখা গেল সেই প্রখর রৌদ্রে একটী মাত্র গামছা মাথায় দিয়া আমাদের
কথিত ব্রাহ্মণ মাঠ পার হইয়া দ্রুত গতিতে আশ্রম অভিমুখে আসিতেছে
ঠাকুর হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "বসা! লুকাও; এইবার তোমায়
মারিয়াই ফেলিবে!" আমিও হাসিতে হাসিতে এক কোণে স্তূপী
সতরঞ্চের পিছনে যাইয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণ আসিয়াই ভক্তিভরে ঠাকু
পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন ও দীনতা সহকারে বলিতে লাগিলেন "প্রা
জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম! আমার ভ্রম আজ পূজার
বুঝিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন! আজ পূজায়, ধ্যানে কেবল আপনা
দেখিতে পাইলাম—আমায় কৃপা করুন—আমার নিকট প্রকাশিত হউ
ইত্যাদি—ইত্যাদি।

পরে তিনি সানন্দে সকলের সহিত নৃত্য ও পান ভোজনাদি করিলে

নৃত্যকালে আমাকে এরূপ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন যে মনে হইয়াছিল বা সত্যই মারিয়া ফেলেন। দেখি, ঠাকুর হাসিতেছেন! ঠাকুরও আনন্দ পাইলেন, ব্রাহ্মণও আনন্দ পাইলেন, আমরাও আনন্দ পাইলাম। যেখানে হরনাথ সেখানেই ভক্তের আনন্দ মিলন,—যেখানেই ভক্তের আনন্দ মিলন সেখানেই হরনাথ!"

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

এই বসন্ত দাদার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বিখ্যাত মৃদঙ্গ তবলা ও খোল বাদক। ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট গান আছে। বীরভূম জিলার খ্যাতিপুর গ্রামে ১৪ ঘর কৃষি ব্যবসায়ী সদ্গোপের বাস। তাহাদের সকলের অনুরোধে ঐ বসন্ত দাদা তথায় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। তিনি তথায় ১৯২৪ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ "হরনাথ আশ্রম" স্থাপন করিয়া উপরোক্ত সদ্গোপগণকে আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখিতেছেন। তিনি এত উচ্চস্তরের ভক্ত যে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ থাকায় তিনি যাইতে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ সোণামুখীতে পত্র লিখিলেন যে ঠাকুর না আসিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। আর কি ঠাকুর না যাইয়া পারেন?

"প্রভু কহে, এই দেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার॥" (চৈঃ চঃ)

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বের বর্ণিত বসন্ত দাদা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আমাকে বিস্তারিত লিখিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু স্থানাভাবে তাহা এখানে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে পারা গেল না। এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল যে উৎসবের তিন দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখাৎ ২।৩ জন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে উৎসবের বন্দোবস্ত করিবার জন্য খ্যাতিপুর যাইয়া দেখেন যে শ্রীযুত বসন্ত

কুমার মুখোপাধ্যায়ের তহবিলে মাত্র একখানি সিন্দূর মাখা আধ পয়সা আছে। সকলেরই বিশ্বাস যে ঠাকুরের নামে সবই ঠিক হইয়া যাইবে। তাই তাহারা সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরের নাম দিয়া একখানি গেইট প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর হইতেই চারিদিক হইতে চাউল, দাইল, তরকারী, আম, মোরব্বা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এবং নগদ টাকা পয়সা এমন পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইল যে সহস্র সহস্র লোক এবং বহু বহু দরিদ্র-নারায়ণ বিচিত্র প্রসাদ পাইয়াও তাহা ফুরাইতে পারেন নাই। এই উৎসবকে ঠাকুর "আধপয়সার" উৎসব বলিয়া বিশেষ আনন্দ করিতেন।

বোম্বে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ২১শে জানুয়ারী বরোদা যান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ীর সংস্পর্শে আদৌ যাইতেন না। কেবল মাত্র রাজা প্রতাপ রুদ্র 'নাছোড়বান্দা' হইয়া লাগিয়া পড়ায় তাঁহাকে কৃপা না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু বহু বহু লক্ষপতি আমাদের ঠাকুরের কৃপা পাইয়াছেন। তত্রাপি রাজা মহারাজের নাম শুনিলেই ঠাকুর একটু বিচলিত হইতেন। নেহাৎ আগ্রহাতিশয্য আছে বুঝিতে না পারিলে তিনি তাঁহাদের নিকট দিয়াও যাইতেন না। ১৯২৬ সনের ৭ই নভেম্বর ঠাকুর আমাকে লিখিয়াছিলেন "স্নেহের দীনেশ বাবা এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন। তিনি ছত্রপুর মহারাজার নিকট গিয়াছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে স্নেহান্ধ হয়ে যা তা বলাতে এখন মহারাজা ক্ষেপেছেন—আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানে গিয়ে কি করিব তাই ভাবিতেছি। এখন যে কি উত্তর লিখি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না * * * বাবা গো, ছত্রপুরকে কি লিখিব ব'লে দাও···।" (অঃ ৩।১৪২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বরোদার মহারাজা বাহাদুরের একান্ত আগ্রহ না হইলে কিছু আর ঠাকুর বরোদা যান নাই এবং মহারাজা বাহাদুর যে ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশাদি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং উপকৃত হইয়াছিলেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই। (এ সম্বন্ধে অঃ ৩।১৪৬ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)।

ঠাকুর ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন "স্নেহময় দীনেশ বাবার চক্ষু আমাকে না জানি কত সুন্দর দেখে বলিতে পারি না। তাঁর ভালবাসা পাইয়া জীবন সার্থক মনে হয়।" এই দীনেশ বাবু আর কেহই নহেন, তিনি স্বনাম ধন্য এবং প্রসিদ্ধ সমালোচক রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট। তিনি আজীবন সমালোচনাই করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহার মত লোকের পক্ষে 'এক গুঁয়েমি' থাকিতেই পারে না। আমি তাঁহাকে কোন দিন ঠাকুরের বাড়ী কি কোন জন্মোৎসবে কোথাও ঘুরাফিরা করিতে দেখি নাই। কলিকাতা হরনাথ-সাধন-সঙ্ঘের বিষয় আমি অঃ ১।১০১ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। দীনেশ বাবু কলিকাতার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ লোক, সেই হিসাবে হরনাথ-ভক্তগণের অনুরোধে তাহার কয়েকটী সভার অধিবেশনে তাঁহাকে যোগদান করিতে দেখিয়াছি, (অঃ ১।১০২, ১০৫) এবং তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া তিনি একদিন ঠাকুরকে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত গৌরিদাস কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনে যোগদান করার জন্য নিয়া গিয়াছিলেন (অঃ ১।৭৯ পৃষ্ঠা) এই মাত্র দেখিয়াছি। এই অল্প কয়েকদিনের সঙ্গের ফলেই রায় বাহাদুরের মত লোক কিরূপ হইয়া গিয়াছেন তাহার নমুনা স্বরূপ, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া "হরনাথ-চরিতামৃত" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া তিনি ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"আমি ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন হরনাথের উপস্থিতি-মহিমায় মহিমান্বিত কয়েকটী সভায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহাশয়দিগের কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, খুব ওস্তাদের হাতের বীণা শুনিলে যেমন তাহার রেশ অনেকদিন পর্য্যন্ত কাণে বাজিতে থাকে, তাঁহাদের অমৃতময়ী উক্তি সেইরূপ এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। সেই সকল উক্তি ছিল তাঁহাদের চোখের জলে ভেজা, যাঁহারা তাঁহার দেবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—প্রথমটা কতক পরিমাণে অবিশ্বাস ও দ্বিধার সহিত অগ্রসর হইয়া শেষে বাবার পাদপদ্মে মন

প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সরল অনাড়ম্বর, ভক্তি-পূত ইতিহাস শুনিতে শুনিতে আমি নিজের চোখের জল সম্বরণ করিতে পারি নাই। যাঁহারা সে সকল প্রাণস্পর্শী একান্ত করুণ উক্তি শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল। সেই সকল সভা, সাধারণ সভা সমিতির মত আদবেই ছিল না—তথায় বাহ্যাড়ম্বরময়ী বক্তৃতা ছিল না, ভাষার কৌশল ছিল না, শিশুরা যেমন বাপ মায়ের কাছে যাইয়া আনন্দে কলরব করে, ঠাকুরকে পাইয়া ইঁহারা তেমনই আনন্দ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চভাবের প্রণোদনায় কলরব করিয়াছিলেন। সেই সভাগুলি মনে হইত বৈকুণ্ঠ, ঠাকুর নিজে সেই সকল সভায় যে উপদেশ দিতেন, তা' যেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে চোখের সামনে উপস্থিত করিয়া দিত, মনে হইত যেন শত শত কীর্ত্তন গানের সার সেই উপদেশ; যেন নারদ বীণা বাজাইয়া কৃষ্ণগুণগান করিতেছেন। আমরা স্তব্ধ প্রস্তর মূর্ত্তি বা কোন পটে আঁকা ছবির ন্যায় মুগ্ধ-কর্ণে সেই উপদেশগুলি শুনিয়াছি।

আমি একদিকে এই ভক্তদিগকে দেখিতাম, অপরদিকে ঠাকুরকে দেখিতাম—এই দুই রূপই আমার কাছে আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি বিস্তার করিত। যেমন সূর্য্য আর সূর্য্যরশ্মি, যেমন চন্দ্র আর চন্দ্রিকা তেমনি ছিলেন ঠাকুর আর তাঁর ভক্তমণ্ডলী।

এই সকল ভক্ত যখন আমার কাছে চাক্ষুষ দৃষ্ট বলিয়া এই ভাবের শত শত লীলার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন আমি তাহা অগ্রাহ্য করিব কিরূপে? বিশেষ যাঁহারা শিক্ষার তুঙ্গশৃঙ্গে অবস্থিত, যুক্তি ও বিচারের সঙ্গে সমস্ত কথা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে গবেষণা করিবার অধিকারী, তাঁহারা যখন বক্তা তখন আমি তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি, কি বলিয়া তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিব? কিন্তু ঠাকুরকে যদি আমি দেখিতে পাই এরিওপ্ল্যানের মত ভোঁ ভোঁ করিয়া তিনি শূন্যমার্গে চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে যে আমার শ্রদ্ধা বেশী বাড়িবে আমার পক্ষে অন্ততঃ আমি তাহা মনে করি না। আমার কাছে

তাঁহার সর্ব্বপ্রকার যাদুকরী হইতে তাঁহার ভক্তি, বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের যাদুকরী বেশী মূল্য বহন করে। তিনি আমাদের যে গুণে প্রাণের রাজা হইয়াছেন তাহা সেই সকল বাহিরের যাদুকরী দেখাইয়া নহে। তিনি প্রাণকে ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ করিতে জানেন, তিনি তাঁহার সহজ মূর্ত্তিতে ভিখারীর বেশে রাজার মাথা তাঁহার পায়ে নোওয়াইবার অদ্ভুত মন্ত্র জানেন, সে মন্ত্রের অর্থ প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছি, ভাষা দিয়া বুঝাইতে পারিব না।

আমাদের কাছে কেহ বিচার প্রত্যাশা করিবেন না, আমরা গোটা ভারতবর্ষটা রসাতলে দিতেছি কিম্বা খুব উঁচুতে উঠাইতেছি সে প্রসঙ্গ আদবে এখানে তুলিব না। এই মাত্র বলিতে চাই হরনাথের মত কয়েকজন ভাবের পাগল যুগে যুগে ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশের প্রাণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, এইজন্য লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদের কথা এত উৎকর্ণ হইয়া শোনে। বিজ্ঞান-সঙ্গত যুক্তিতর্কের মাপ কাঠিতে ওজন করা কথায় সব সময়ে প্রাণের সেই তিয়াস মেটে না, যাহা অলীক দেবলীলার প্রসঙ্গে ও পৌরাণিক উপাখ্যানে মিটিয়া থাকে। এদেশের লোক নরলীলা শুনিতে চায় না, তা'রা চায় দেবলীলা শুনিতে। এজন্য এদেশে ইতিহাস জন্মিল না, কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের কথায় দেশ ছাইয়া গেল! যুক্তি তর্ক একদিকে, প্রাণটা আর এক দিকে; মন যদি ফিরিয়া বসে, তবে শিক্ষিত মহাশয়েরা কি করিবেন?

উপরের বর্ণিত "হরনাথ চরিতামৃত" হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রকৃতঃ অমৃতের খনি। হরনাথ জগতের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ৺সত্যচরণ সেন শর্ম্মা এই অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন "আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, সত্যচরণের এই পুস্তক পড়িয়া অনেক লোকের পিপাসা মিটিবে। শোকার্ত্তগণ শোক ভুলিবে এবং অবিশ্বাসী বিশ্বাসের অমৃত গঙ্গায় অবগাহন করিবে। তারপরে যদি বৈজ্ঞানিকের দল এইরূপ বই অগ্রাহ্য করেন তাহাতে কিছু যাইবে আসিবে না।"

দয়াময় ঠাকুর বরোদা হইতে ১৯২৭ ইং ২৪শে জানুয়ারী শ্রীধাম বৃন্দাবন যান। তথা হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী আমাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

শ্রীঃ

বৃন্দাবন।

পরম স্নেহের বাবা, তোমার পত্র পেয়ে সকল সমাচার অবগত হইলাম। বাবা গো আমার স্থূল শরীরের জন্য বম্বের মা বাবারা তাদের মন প্রাণ শরীর সকল অর্পণ করে আমাকে নিয়ে এখানে সেখানে ফিরিতেছে। তাদের দয়াতে আমি এখানে এসেছি এবং অনেক ভাল মনে করিতেছি। এখানে কিছুদিন থাকিলে শরীর একেবারে সেরে যেত, কিন্তু ময়মনসিংহ আমার সে পথে কণ্টক রোপণ করিল। বাঁচি আর মরি আমার সেখানে যেতেই হবে। এখান হ'তে আমি ২৬শে মাঘ রওনা হ'য়ে ২৭শে কলিকাতা পৌঁছিব। তারপর প্রভু যা লিখেছেন তাই হবে। বাবা, এ শরীর তোমাদেরই, তাই বলে এটা নিয়ে যা তা ভাবে খেলা উচিত নয়। বাবা গো, তোমাকে ত বোধ হয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় যেতে হবে। আমার সঙ্গে Dwarakadas Jagamohon ও ২টী বম্বের মা যাইতেছেন। পাছে আমার কোন রকম পথে কষ্ট হয় সেই জন্য তারা আমাকে ছেড়ে দিতে পারিল না। নিজেদের কষ্টের ও খরচের দিকে লক্ষ্য না করে আমার সঙ্গে ছুটেছে। আমার স্নেহময়ী মাকে বলিবে তার গোপাল ভাল আছে; বাবা স্নেহের রায় বাহাদুর বাবা, গাঙ্গুলী বাবা, স্নেহের কালু, হরিমোহন বাবা, ডাক্তার বাবা, রসিক বাবা প্রভৃতি সকলে কেমন আছেন, সকলকে বলিবে যেন আমার উপর স্নেহের নজর রাখে। স্নেহময় ব্রজেন বাবার বিষয় শুনে বড় কাতর হলাম। প্রভু তাঁকে চিরসুখে রাখুন। বাবা, আশুর জন্য তাকে লিখিতে হবে না। তিনি আমা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা করিতেছেন, যাতে আশু বাবাকে তার অধীনে নিতে পারেন। আশুর বিষয় ভাবিলে আমি পাগল হয়ে যাই; তাকেও

ময়মনসিংহ নিয়ে যাবে। আমার স্নেহের ছোট ছোট ভাই বোনগুলি কেমন আছে লিখিবে। আমি এখানে একাই আছি; তোমার মা মাছ্‌ডোবায় আছেন, তাঁর শরীরও ভাল নাই।

তোমার স্নেহের

হর।

৺আশুতোষ গুহকে (অঃ ৩।২১৮ ও ১০৮ পৃষ্ঠা।) ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রখানি আশুভায়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যাইবে যে, ঠাকুর কিরূপ ভক্তাধীন এবং নিজের স্বাস্থ্যের দিকে অণুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া কিরূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য ভগ্নস্বাস্থ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে সুদূর ময়মনসিংহ আঠারবাড়ী গিয়াছিলেন এবং একজন ভক্তের সাংসারিক সুবিধার জন্য তাহাকে সুদূর আসাম হইতে বরিশাল বদ্‌লী করাইতেই বা কিরূপ যত্ন নিয়াছিলেন। কেমন ভক্তবৎসল ঠাকুরটী আমাদের! সহস্র সহস্র ভক্তের মধ্যে আশু একজন ভক্ত, সে সাংসারিক বিষয়ে কষ্ট পাইতেছিল, তাই ঠাকুর আমাকে উপরোক্ত পত্রে লিখিলেন "আশুর বিষয় ভাবিলে আমি পাগল হ'য়ে যাই।" সকলের জন্যই তিনি এইরূপ ভাবিতেন এবং এখনও ভাবেন।

শ্রী

"বাবা তোমার পত্র পেলাম; Iswarganj হইতে Telegram পেলাম; আমাকে নেবার জন্য এখানে পর্য্যন্ত লোক আসিতেছে। বাবা, এ শরীর নিয়ে এ ভাবে যথেচ্ছ খেলিতে পারে এমন লোকও আছে। যাক, ২৬শে মাঘ এখান হতে রওনা হ'য়ে ২৭শে কলিকাতা পৌছিব। ২৮শে বিশ্রাম ক'রে, পরে যা হয় করা যাবে। প্রভুর অপার দয়াতে এবং বোম্বের মা বাবাদের অদম্য যত্নে শরীর কিছু কিছু ভাল হইতেছিল। যাক্, এ সকল আর চিন্তা করিব না। প্রভুর ইচ্ছা নয় যে আমি আর বেশী দিন থাকি। এই ভাবেই শরীর ছাড়িতে হবে। তোমাকে বরিশালে নেবার জন্য স্নেহের ব্রজেন বাবা খুব

চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কি করিবেন কোন উপায় পাইতেছেন না। যাই হ'ক, স্নেহময় অক্ষয় বাবার কথা মত ছুটী নিতে থাক, তবে সংসার কি ক'রে চলিবে তাই চিন্তার কথা। ময়মনসিংহ গেলে সেখানে দেখা হবে। স্নেহময় অক্ষয় বাবা প্রভৃতি সকলে কেমন আছে লিখিবে। সঙ্গে দ্বারিকা দাস, জগমোহন, কাকী ও জগমোহনের স্ত্রী যাইতেছে। বাকী সকলে বম্বে ফেরত যাবে।

তোমার স্নেহের
"হর"

৭ই ফেব্রুয়ারী সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাইয়া তুইবেলাই ভ্রাতা ললিতমোহন দত্তের বাড়ী প্রসাদ পাই এবং বৈকালে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ও ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করি। ভক্তপ্রবর বসন্তকুমার গাঙ্গুলী ঠিকই বলিয়াছেন "যেখানে ভক্তের আনন্দ-মিলন, সেখানেই হরনাথ।"

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস

এই ভূপেন ভায়ার কলিকাতা সহরেই বাড়ী, আথিক অবস্থা খুব ভাল এবং নিজেও আফিসে বড় চাকুরী করেন। তিনি প্রথমতঃ খুব সাধু চাখিয়া বেড়াইতেন। একদা একজন মস্ত বড় সাধু কলিকাতা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পিছু পিছু বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে শিব পূজায়, কুমারী পূজায় ও দরিদ্র সেবায় যথেষ্ট ব্যয় করিয়া আসেন। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মাণিকতলা আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া নিকটে বসেন। ঠাকুর হাসিয়া ভূপেন ভায়াকে বলিয়াছিলেন—"কি বাবা, পরের ঘরে উঁকি মারিতে গিয়াছিলে, নাকটী ছেঁচিয়া আসিলে তো?" আবার বলিলেন, "কেমন তীর্থ দেখা হইল?" একদা ঠাকুর চুণাপুকুরে ভক্তপ্রবর দ্বিজেন দাদার বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়াও সেদিন মাংসাদি আহার করিয়াছেন বলিয়া ভূপেন ভায়া

ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না। পরদিনও ঐরূপ কোন কারণে নিজেকে অশুচি মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট গেলেন না। তৃতীয় দিন আর থাকিতে না পারিয়া ঠাকুরের কাছে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া চুপে চুপে একটী হারমোনিয়মের অন্তরালে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর অন্যদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "বিষ্ঠা মূত্র মাখা থাকিলেও সন্তানকে কি বাপ-মা কোলে লয় না? বাপ-মা যখন কোলে লয়েন তখন ছেলেকে পরিষ্কার করিয়াই লয়েন।" পরে সহসা ভুপেন ভায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই যে মেসো মহাশয়! কতক্ষণ?" প্রকাশ থাকে যে ঠাকুর ভূপেন ভায়াকে 'মেসো মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঠাকুরে এমনই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কলিকাতার বাজারে যখন যে জিনিষ নূতন উঠিবে—মূল্য যতই কেন হউক না—তাহার একটী টুক্‌রী ঠাকুরের জন্য পাওয়া চাই-ই। সভার পুস্তকের তহবিল তাঁহার হাতে ছিল। তাঁহার নিজের তহবিলে টাকা না থাকিলে ঐ তহবিলের টাকাও সমস্তই এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। ঠাকুরের সেবায় টাকা পয়সা ব্যয় করিতে তিনি কোনদিন কোনরূপ ইতস্ততঃ করেন নাই। ধন্য ভূপেন ভায়ার ঠাকুর সেবা!

ময়মনসিংহ আঠার বাড়ী অঞ্চলের ভক্তপ্রবর রজনীকান্ত কর, যামিনীনাথ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায়, রাসমোহন রায়, পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতির উদ্যোগে ঐ সনের (বাং ১৩৩৩ ইং ১৯২৭) ৭ই ফাল্গুন ঈশ্বরগঞ্জে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন উপলক্ষে প্রকাণ্ড একটী উৎসব হয়। ভক্তদের ঐকান্তিকতায় দয়াময় ঠাকুরকে অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেই শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ঈশ্বরগঞ্জ আসিতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বের বর্ণিত পত্রেই তাহা জানা গিয়াছিল। এই উৎসবে বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু ভক্ত এবং ঐ অঞ্চলের ও ময়মনসিংহ সহরের বহুলোক, বহু সরকারী কর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার অমূল্য উপদেশাদি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার

উপদেশ "নাম কর, নাম কর, নাম করা গুণ গাওয়া ছাড়া আর কি আছে? কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর নাই।" মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া পত্রাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "তিনি কেবল হরিনাম করিতে বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; যাহাতে হরিনামের মিষ্টতা আস্বাদন করিতে পারা যায় সেই অজ-ভব-বাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তিরূপ মহাশক্তি মহাপাতকীর হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণনামের মধুরত্ব ও মাদকতা অনুভব করাইতেছেন। যে সমস্ত জীব ভ্রমেও কখন হরিনাম জিহ্বায় উচ্চারণ করে নাই তা'রাই আজ অহর্নিশ লক্ষ লক্ষ নাম জপিতেছে, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে।" এখানেও ঠাকুর সেইরূপই করিয়াছিলেন। ঠিক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মত—

"কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায়, তাঁহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥" (চৈঃ চঃ)

* * *

"যারে দেখে তারে কহে,—কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন বলিয়াছিলেন—

"ভারকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব?
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥" (চৈঃ চঃ)

ঠাকুরও এইস্থানে ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন। উপদেশ প্রদানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর "চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হাসে।" (চৈঃ ভাঃ)

কি মধুর দৃশ্য! আর উপদেশগুলিও যেন 'কানের ভিতর বাসা' করিতে চায়।

ভক্তগণ সহ স্নানের সময়ও ঠিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত—

"আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল।
জল মণ্ডুক-বাদ্যে সবে বাজায় করতল॥
দুই-দুই জনে মেলি' করে জল রণ।
কেহ হারে, কেহ জিনে, প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দে জল-কেলাকেলি।
আচার্য্য হারিয়া, পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুইজনে॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায়॥" (চৈঃ চঃ)

আঠার বাড়ীতে বাহিরের যত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তাহারা নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দিবেন যে ঠাকুরের ভোজনকালীন লীলাও ঠিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন-লীলার মতই হইয়াছিল।

"তবে মহাপ্রভু বসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে॥

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি॥
'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়॥" (চৈঃ চঃ)

এই উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণীর পূজার সময়ই ভক্তপ্রবর কিরণেন্দু ঘোষকে খুব ভাল পোষাকে সাজিয়া গুজিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন "ঠাকুরের কাছে যেতে ভাল পোযাক পরবো না ত কখন পরব ?" (অঃ ২।০৯)। এহেন ভক্তের এহেন ভাব দেখিয়া যেমন ঠাকুরের আনন্দ, তেমন অধিকতর আনন্দ সেই ভক্তদের—

"আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত॥ (চৈঃ চঃ)

অতি সমারোহের সহিত এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে পূর্ব্ববঙ্গের এই উৎসবই ঠাকুরের এইবারকার লীলার শেষ উৎসব।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল

পূর্ণবাবুই এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি তখন ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক। অল্পদিন হয় তিনি আমাদের এই পাগল ঠাকুরের দলভুক্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে একবার সোণামুখী ঠাকুর বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। তিনি ঠাকুর এবং মা-ঠাকুরাণীর জন্য ভাল ভাল কাপড় কিনিয়া আনিয়া ভক্তিভরে গদগদ কণ্ঠে কি জানি কি কি বলিয়া যেরূপ ভাবে ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন; সে দৃশ্য জীবনেও ভুলিতে পারিব না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঠাকুরের এমন অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে শুধু ঠাকুরের নামের জোরেই তিনি কয়েকটী শক্ত শক্ত

রোগীকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বরিশাল আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ঠাকুর আমাকে লিখিয়াছিলেন "ময়মনসিংহের Sub-Inspector of Police পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল তোমার মত তার নিজ বাড়ীতে একটা আশ্রম করিতে চান; আমি তাকে পত্র দিই নাই" (অঃ ২।১৯০ পৃঃ)। তৎপর পূর্ণবাবু ইন্‌স্পেক্টার পদে উন্নীত হইয়া বহুদিন প্রশংসার সাহিত কার্য্য করতঃ সম্প্রতি পেন্সন নিয়া ময়মনসিংহ সহরের উপরই বাস করিতেছেন। কিন্তু ঈশ্বরগঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য তিনি তথায় একটা কারবার খুলিবার চেষ্টায় আছেন বলিয়া শুনিয়াছি। বহুদিন মধ্যে তাহার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং বলিতে পারি না যে তিনি কোন আশ্রম করিয়াছেন কিনা। আমি বহুপূর্ব্বে যখন ময়মনসিংহ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের পদে কার্য্য করি, তখন হইতেই পূর্ণবাবুকে চিনি। কিন্তু ঠাকুরের কৃপা পাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ভিতর কোন ভক্তির ভাব ছিল কিনা লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ষ্টেশন মাষ্টার
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

বিধুবাবুর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে কোনই পরিচয় ছিল না। হরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা হইতে আমার "অভিজ্ঞতা" ১ম খণ্ড পাইয়া পাঠ করতঃ তিনি পরম প্রীতিলাভ করিয়া ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার নিজের যাহা অভিজ্ঞতা আছে তাহার কতক কতক আমাকে লিখিয়া জানান। তদ্বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা ২য় খণ্ডের ভূমিকার ৶০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছিলাম কিন্তু ২য় খণ্ডের গর্ভে তাহা নিবেদন করার সুযোগ হয় নাই। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় বিধুবাবুর পত্র পাওয়ার অব্যবহিত পরেই 'হরনাথ-স্মৃতি' ষষ্ঠ লহরীতে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মাত্র তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। আরও অনেক লিখিবার ছিল, কিন্তু স্থান ও সময়াভাব। তজ্জন্য আমি বিধুদাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"কে বলে ঠাকুর হরনাথ দেহ রক্ষা করিয়াছেন? কে বলে ঠাকুর হরনাথ এ জগতে নাই?"

'সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝল্‌মল্।
সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল॥'
'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥'

(চৈতন্য চরিতামৃত)

না আমাদের আঁখি নিরমল, না আমরা ভাগ্যবান্, কাজেই আমাদের সেই সৌভাগ্য হইবে কেন?

দেখিতেছেন ঠাকুর হরনাথকে ময়মনসিংহ গৌরীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ভাগ্যবান্ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু মহাশয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ। বিধু দাদা উক্ত জিলার পুলিশ সবইনস্পেকটার বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নিকট ঠাকুরের মহিমা প্রথম অবগত হন। তৎপর ১৩৩৩ সনে ঈশ্বরগঞ্জ উৎসবে যাওয়ার পথে উপরোক্ত গৌরীপুর ষ্টেশনে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন এবং উক্ত পূর্ণ বাবুর চেষ্টায় ঠাকুরকে তিনি কিছু সময়ের জন্য তাঁহার বাসায় নিয়া যান। তৎপর দিন তিনি সস্ত্রীক ঈশ্বরগঞ্জ যাইয়া উৎসবে যোগদান করেন। জানি না উৎসবের দিন সহস্র সহস্র লোকের ভিড়ের ভিতর ঠাকুরের মধ্যে তিনি কি দেখিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিবার সময় ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়া ঠাকুরের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছিলেন; তখন একটী ভক্ত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামই উদ্ধারের পথ। ঠাকুর ঈশ্বরগঞ্জ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় ভক্ত-বৃন্দসহ ঠাকুরকে বিধু দাদা বিচিত্র ভোগ এবং প্রসাদ দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর যাওয়ার সময় তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন "আমার নিকট চিঠি লিখিও, আমাকে ভুলিও না।" তৎপরে উপরোক্ত পূর্ণ বাবুর নিকট হইতে ঠাকুরের একখানি ফটো আনিয়া পূজা

আরম্ভ করেন। উহার অল্প কয়েক মাস পরেই ঠাকুর অপ্রকট লীলাভিনয় করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার মাত্র তিন দিন দেখা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরের চরণে দেহ মন সমর্পণ করার ফলে ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে অদ্যাপি কিরূপ লীলা করিতেছেন শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। স্থানাভাবে তাহার মাত্র ২।১টী দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল।

ঈশ্বরগঞ্জ উৎসবের দেড় বৎসর পর, পুরীধামে ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মেদিনীপুর উৎসবে যাইতে না পারিয়া এই উৎসবে যোগদান করার জন্য কিছু পূর্ব্বেই ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায়ের সঙ্গে বিধুবাবু তাঁহার স্ত্রী ও মাতাকে নিয়া পুরীধামে উপস্থিত হইয়া উৎসব দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিধুবাবুর ১৩।১৪ বৎসর বয়স্কা প্রথমা কন্যার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে শয্যামূত্রের দোষ হয় এবং অনেক টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করান সত্ত্বেও কোন ফল হয় না। পুরীধামে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করেন "শ্রীশ্রীঠাকুর তো নাই, তবে মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া যদি ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারি দেখিব"। উৎসবের অধিবাস দিবস সন্ধ্যার সময় আশ্রমের আঙ্গিনায় বহু ভক্ত বসিয়া ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন এবং বিধুদাদা চক্ষু বুজিয়া তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় বিধুদাদা দেখেন যে ঠাকুর আকাশে দাঁড়াইয়া ২০।২৫ হাত দূর হইতে তাঁহাকে বলিতেছেন "তোর মেয়ে আর প্রস্রাব করিবে না।" ইহা তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রম কিনা তৎসম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে না পারিয়া এবং পাছে ইহা সত্যে পরিণত না হয় এই আশঙ্কায় এই বিষয় তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। ১৭।১৮ দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে উক্ত জন্মোৎসবের অধিবাস দিবস হইতেই মেয়েটীর শয্যামূত্রের দোষ চলিয়া গিয়াছে।

৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়া ৩।৪ মাস পর একদিন রাত্রে বিধুদাদা স্বপ্নে দেখেন যে ঠাকুর একটী চেয়ারে বসিয়া আছেন, অনেক ভক্ত নীচে বসিয়া,

এবং ঠাকুর তাহাদিগকে নানারূপ উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় দয়াময় ঠাকুর বিধুদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন "আয় তোকে দীক্ষা দিব"; এই বলিয়া বিধুদাদাকে তাঁহার ডান দিকে নিয়া কাণের কাছে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীক্ষা দিলেন। তাহার পরে বিধুদাদার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

অনুমান দুই বৎসর হইল বিধুদাদার ২ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা ছোট কন্যাটী আমাশয় ব্যারামে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছিল এবং নানারূপ ঔষধ ব্যবহার করাইয়াও কোনরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তৎপরে একদিন বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় বিধুদাদা ষ্টেশন হইতে বাসায় যাইয়া দেখেন যে মেয়েটী ঘুমাইতেছে। তখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা ঐ মেয়েটীকে স্নান করাইবার জন্য ডাকিয়া উঠাইলে বিধুবাবু প্রভৃতি দেখিতে পান যে মেয়েটী ডান হাত দিয়া কি খাইতেছে অর্থাৎ কোন মিষ্ট জিনিষ হাতে পাইলে ছেলে মেয়েরা যেরূপ ভাবে তাহা খায় তখনকার তাহার ভাবও ঠিক সেইরূপ ছিল। ক্ষণকাল মধ্যেই মেয়েটী পুনরায় শুইয়া পড়িল এবং বিধুদাদাও ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন। অনুমান বেলা ১১॥০ ঘটিকার সময় বিধুদাদা বাসায় আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাহার মধ্যমা কন্যা ছোট মেয়েটীকে ঘুম হইতে উঠাইবার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সে তখন কি খাইতেছিল, উত্তরে মেয়েটী বলিয়াছিল "এক বুড়া ঠাকুর তাহাকে সন্দেশ প্রসাদ দিয়াছিল।" তখন তাহাকে বাসার মধ্যে যে সকল ছবি ও ফটো ছিল একে একে সব দেখান হইল, কিন্তু যখন তাহাকে ঠাকুরের ছবির নিকট লওয়া হয় তখন সে ঐ ছবিখানি দেখিয়া বলিয়া উঠে "এই ঠাকুরই আমাকে সন্দেশ দিয়াছে।" ঐ কথা শুনিয়া বিধুদাদা আবার মেয়েটীকে কোলে করিয়া প্রথমতঃ অন্যান্য সকল ছবি ও ফটো দেখাইলেন। তৎপর যখন দয়াময় ঠাকুরের ছবির নিকট নিয়া গেলেন তৎক্ষণাৎ মেয়েটী অঙ্গুলী দ্বারা ঐ ছবিখানা দেখাইয়া বলিল যে "এই বুড়া ঠাকুরই তাহাকে সন্দেশ দিয়াছে।" উহার পরেই মেয়েটী আরোগ্য লাভ করিল।

বিধুদাদা আমাকে আরও লিখিয়াছেন "ইহা ছাড়া আমি আরও কোন

কোন বিষয় স্বপ্নে আদেশ পাইয়াছি, কিন্তু তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হইবার সময় হয় নাই বিধায় এখন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার বিশ্বাস দয়াল ঠাকুর স্বয়ং ভগবান এবং সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন ও সকল সময় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিলে তিনি স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আমার স্ত্রীকে ঠাকুর সোণার রূপ ধরিয়া স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন। আমার স্ত্রী বলেন এরূপ মনোরম রূপ আর জীবনে দেখি নাই।” ধন্য বিধুদাদা এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী!

স্বামী স্ত্রী দুজনেই কেবল মাত্র তিন দিনের জন্য ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া মোহবশতঃ যে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই এবং দুজনেই তদবধি ঠাকুর ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া গাঁট হইয়া বসিয়া আছেন তাহার প্রমাণ পাইয়াছি গত বৎসর খড়্গপুর জন্মোৎসবের সময়। বিধুবাবু তাঁহার স্ত্রীকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণের উপর সমর্পণ করতঃ করজোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট স্বরে যেরূপ ভাবে “কৃপা কর মা কি ভাবে চলিতে হবে বলে দাও মা” ইত্যাদি বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতা-ঠাকুরাণীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন সে দৃশ্য দেখিয়া আমাদের সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিধুবাবুর সঙ্গে খড়্গপুরেই আমার প্রথম পরিচয় হয়।

শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায়

ঈশ্বরগঞ্জ হইতেই দয়াময় ঠাকুর তাঁহার অতি প্রাচীন এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত সুন্দাইল সাকিনের শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায়ের বাড়ী শুভাগমন করতঃ “হরনাথ আশ্রম” স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়া আসিয়াছেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য তাই সে উৎসবে যোগদান করার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠে নাই। রাসমোহন দাদা বৃদ্ধ, সাংসারিক অবস্থাও তত স্বচ্ছল নহে, তার উপর আবার স্ত্রী অন্ধ। তত্রাপি তিনি সাংসারিক কোন কিছুর দিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত

না করিয়া দিবারাত্র আশ্রমের সেবাতেই সানন্দ চিত্তে দিনাতিপাত করিতেছেন। ঠাকুরের এমন কৃপা যে তাঁহার ২।৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেটী তাহাকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে আশ্রম সেবার কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। রাসমোহন দাদার বিষয় আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে এ হেন ভক্তের সঙ্গে আমার এখনও পত্র ব্যবহার চলিতেছে। তিনি যে এখনও ঠাকুরের নিকট হইতে অযাচিত কৃপা পাইতেছেন তাহার দৃষ্টান্ত তাহার পত্রে অবগত হইয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি। স্থানাভাবে তাহা এখানে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারা গেল না।

অল্প কিছুদিন পরেই হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হইবে, তাই সস্ত্রীক ঐ মেলা এবং তদুপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি তীর্থ দর্শন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হওয়ায় আমি এই সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করি। তিনি আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করতঃ পরে আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি বরাবরই হুজুগে মাতা। ইতিপূর্ব্বে শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি দর্শন করার সৌভাগ্য আমি পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীর ভাগ্যে এযাবৎ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এই কুম্ভ মেলা উপলক্ষে তাহাকে ধামাদি দর্শন করাইবার হুজুগ উঠিয়া গেল, এবং যেন তেন প্রকারেণ ঠাকুরের অনুমতিও পাইলাম। সুতরাং ঠাকুর কেন যে ইতস্ততঃ করিয়া অনুমতি দিলেন সেই দিকে লক্ষ্য করার আমার ফুরসৎ (অবসর) কোথায়? কিন্তু পরের ঘটনাগুলিতে, দয়াময় ঠাকুরের পত্রে, তীর্থ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ের ঘটনায় এবং তাঁহার শ্রীমুখের কথায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তখন আমাদের ঐরূপভাবে তীর্থ ভ্রমণে বাহির না হওয়াই উচিত ছিল। এমন কি, ঠাকুর যে আমাকে তীর্থ ভ্রমণে যাইবার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়ার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম। **ফলও সেই রকমই পাইয়াছি এবং তজ্জন্য এখনও অনুতাপ ভোগ করিতেছি।**

যথা সময়ে বিদায়ের দরখাস্ত করা গেল, ঠাকুরের অনুমতি যখন পাওয়া গিয়াছে তখন বিদায় মঞ্জুর হইতেই হইবে। তাহার বহু বহু দৃষ্টান্ত নিজের জীবনেই পাওয়া গিয়াছে সুতরাং অনায়াসেই বিদায় মঞ্জুর হইয়া গেল। কিন্তু তখন আমার চার্জ্জে থাকা প্রকাণ্ড একটী Gang case-এর বিচার সেসন আদালতে চলিতেছিল। দিনের পর দিন সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা চলিতে থাকিল, কিছুতেই বিচার শেষ হইতেছে না। অথচ হরিদ্বার পূর্ণ কুম্ভে যাওয়ার পূর্ব্বে বৈষ্ণব মহাজনগণ সকলে সমবেত হইয়া যে দিনকতক শ্রীধাম বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে ছাউনি করিয়া থাকেন তাহা দর্শন করার জন্য মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। সুতরাং অতি শীঘ্র রওনা হইয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই, ১৪ই মার্চ্চ জুরীরা জজ সাহেব বাহাদুরের বক্তব্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাদের নিজ মত নির্দ্ধারণ জন্য প্রস্থান করা মাত্র ষ্টীমার ছাড়িয়া যায় বলিয়া জুরীর মত শুনিয়া যাওয়ার জন্যও অপেক্ষা না করিয়া বরিশাল হইতে রওনা হইয়া যাই। ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতা পৌছিয়া ১৬ই মার্চ্চ আমি আমার স্ত্রী, সহোদর প্রতিম ললিতমোহন দত্ত ও তাহার স্ত্রী এই চারিজন একত্রে তুফান গাড়ীতে রওনা হইয়া ১৭ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবন পৌছি এবং সৌভাগ্যক্রমে তথায় কয়েকদিনই আমরা বৈষ্ণব মহাজনগণকে যমুনাপুলিনে দর্শন এবং তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করার সুযোগ পাই। বহু বহু বৈষ্ণব তথায় বিরাজ করিতেছিলেন। কুম্ভ মেলা ব্যতীত এত বৈষ্ণব এক স্থানে মিলিত হবার সুযোগ খুব কমই ঘটিয়া থাকে।

"ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ,
শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণ॥
বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত;

বৈষ্ণব চরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥" (সাঃ কঃ)

একদিকে বৈষ্ণব দর্শন, অপরদিকে শ্রীশ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনাদি বিগ্রহ, শ্রীবংশীবট, নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ, নিধুবন প্রভৃতি দর্শন, তার উপর আবার সুবিখ্যাত পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামীর ভাগবত পাঠ শ্রবণ—খুবই আনন্দ উপভোগ হইল।

আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবন পৌছিয়া ১৭ই হইতে ২৪শে মার্চ্চ এবং ৩১শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত "হরনাথ-কুসুম-কুঞ্জে" অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন তথায় মহাত্মা অটলবিহারী নন্দীর স্ত্রী, ভক্তপ্রবর ৺হেমচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী এবং আর একজন ভক্ত, যাঁহারা হরনাথ জগতে যথাক্রমে "শারী মা" ...নি মা" এবং "ডাবের জল" বলিয়া পরিচিত এবং আমাদের ছোট মাসী মা ঠাকুরের ছোট শ্যালিকা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচর্য্যায় আমাদের মাতাঠাকুরাণীর প্রধানা সহায়) কে পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের নিকট হইতে, বিশেষতঃ ধনি মার নিকট হইতে, যে আদর যত্ন পাইয়াছিলাম তাহা জীবনেও ভুলিবার নহে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা—

মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী

যখন হাতরাস জংসন ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক,—চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত এবং মদ্যপানাদিতে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম দেখা হয়। ঠাকুর তখন কাশ্মীরের মহারাজার ধর্ম্মার্থ অফিসের ইনচার্জ্জ অফিসার ছিলেন। এ হেন অটলবাবু ঠাকুরের সংস্পর্শে সোণা হইয়া তাঁহার চাকুরী ছাড়িয়া উপরোক্ত আশ্রম স্থাপন করতঃ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি পবিত্রতার সহিত ঐ আশ্রমে কাটাইয়া দিয়া ঠাকুরের পত্রাবলী এবং নাম, প্রেম প্রচার করতঃ স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। অটল বাবুর স্বহস্তে লিখিত পরম বৈষ্ণব ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' নামক মাসিক পত্রিকায় ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইবে। তজ্জন্যই তিনি হরনাথ জগতে মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী বলিয়া বিখ্যাত। এই সময়ে বঙ্গদেশের লোক শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতেন না। কিন্তু মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কিছু কিছু জানিতে পারিয়াই তাঁহার ম্যাগাজিনে ২।১টী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়াই অটলবাবু এই প্রবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

"আপনার পত্রিকায়, ঠাকুর হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি অদ্ভূত আধ্যাত্মিক শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুমতি পাইলে, এ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি নিবেদন করি। তাঁহাকে একজন Psychic বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়া আপনারা কি বুঝাইতে চাহেন বলিতে পারি না, তবে আমি জানি, তিনি একজন Saint বা প্রকৃত সাধু। অদ্ভূত শক্তির পরিচয় দিয়া লোককে প্রণোদিত করা, তাঁহার স্বভাব বা ব্যবসায় নহে। যাহা হউক কিরূপে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় এইবার বলিব।

উত্তর পশ্চিমে কোন এক রেল ষ্টেশনে আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি।

চেহারা দেখিলে ভক্তির উদয় হয় না। পরিধানে ময়লা কোট পেণ্টালুন, মাথায় একটা কদর্য্য টুপি এবং দাড়ির বাহারও তদনুরূপ। আমি রূঢ়ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করি। তিনি কিন্তু তাহাতে বিচলিত বা বিরক্ত না হইয়া প্রীতিপূর্ণ সস্মিত বদনে আমায় নিরীক্ষণ করিলেন মাত্র। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। অনেকেই তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। আমি দেখিলাম অজ্ঞাতসারে আমিও কিরূপে সেই দলে মিশিয়া গিয়াছি। রাত্রি আটটায় আরম্ভ হইয়া রাত দুটা অবধি গল্প চলিল। পরমেশ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল এবং আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। জীবনে কখনও এরূপ সুখের রজনী অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর সাধু।

ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার সহিত আলাপের সুযোগ পাই। এবার তিনি আমার অতীত জীবনকাহিনী সমস্তই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। 'তোমার ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, দিল্লী গাজিয়াবাদ গিয়াছিলে সেইখানে তোমার শূল বেদনার সূত্রপাত হয় এবং এখনও উহাতে ভুগিতেছ।' এইরূপে আমার জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহার সন্ধান পাইল। তাঁহার কৃপায় আমি সেই দুরারোগ্য শূলরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। পীড়ারোগ্য বিষয়ে বোধ করি, তাঁহার তুল্য আর একটী লোক মিলে না। আমি জানি শত শত লোককে তিনি এইরূপে ব্যাধির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী বড়ই অদ্ভুত, কোন ঔষধের ব্যবস্থা প্রায়ই দেন না; কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলেন, কাহাকেও বা অন্য পরামর্শ দেন কিন্তু প্রায়শঃ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেই কোনরূপ উপদেশ প্রদত্ত হয়। যে সমস্ত পীড়ার তিনি শান্তি বিধান করিয়াছেন সেগুলি প্রায়ই কোন দুশ্চিকিৎস্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

তিনি শুধু আমার নহে, অন্যেরও মনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। আমার ন্যায় অন্যেরও গত জীবনী শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আমি বহুবার তাঁহার সূক্ষ্ম দেহে বিচরণের পরিচয় পাইয়াছি। একটী মাত্র ঘটনার এস্থলে উল্লেখ করিব। আমি যেখানে থাকি তথা হইতে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পত্র যাইতে তিন দিন বিলম্ব হয়। সাধারণতঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে আমি আমার পত্রের উত্তর পাইতাম। একদা তৃতীয় দিবসে উত্তর পাই এবং তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন। 'আমি সূক্ষ্ম দেহে তোমার নিকট গিয়াছিলাম, দেখিলাম তুমি চিঠি লিখিতেছ। আমার বিষয় ভাবিতেছিলে বলিয়াই হয়ত তোমার নিকট আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কি লিখিয়াছিলে আমি পড়িয়াছি। কি পড়িয়াছিলাম জানিতে চাহ কি? আচ্ছা তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই এই উত্তর পাঠাইতেছি।' উত্তর পড়িয়া বুঝিলাম—তিনি প্রকৃতই আমার পত্রখানি পাঠ করিয়াছেন! যেদিন আমি তাঁহাকে লিখিতেছিলাম, তাঁহার পত্রখানিও সেইদিনেই প্রেরিত হইয়াছিল।

আর একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার একটা বড় গোছের বিপদ আসিতেছে কিন্তু ভয় নাই জগদীশ্বর রক্ষা করিবেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দু' একদিন পরেই আমি দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। সতের আঠার দিন প্রায় সর্ব্বদাই অচৈতন্য থাকিতাম, কিন্তু যদিও বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তথাপি তিনি যেন সর্ব্বদাই আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন এবং সস্মিত বদনে আমায় উৎসাহ দিতেছেন, এইরূপ দেখিতে পাইতাম। আমার পত্নীকে একথা বলিলে তিনি ইহা আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ জ্ঞান করিয়া কাঁদিতে থাকেন। কিছুদিন পরেই ঠাকুরের নিকট হইতে চিঠি আসিল, 'বধূকে ভাবিতে বারণ করিও, আমিই তোমাদের নিকট যাইতাম।'

এইবার আমি আমার জীবনের পরিবর্ত্তন-সাধক এক অতি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিব। জগদীশ্বরকে ভক্তি এবং ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ঠাকুর হরনাথ আমায় উপদেশ দিয়াছিলেন। আমিও তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইতাম। এই সময় জনৈক মহিলা তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে আমার

নিকট আগমন করেন। আমি জানিতাম না যে, তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, কারণ দীনা ভিখারিণীর বেশে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং আমিও সেই কারণে যথাশক্তি তাঁহার দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাই। আমার সেই যৎসামান্য পরিচর্য্যা হেতুই আমার উপর তিনি নিরতিশয় কৃতজ্ঞা হয়েন এবং গৃহে গিয়া আমায় একখানি স্নেহপূর্ণ পত্র লিখেন ও উপহারাদি পাঠাইয়া দেন। পত্রখানি তাঁহার বালবিধবা কন্যার হস্ত-লিখিত। তরুণী প্রথম প্রথম মায়ের নামেই পত্র লিখিতেন, শেষে কিন্তু নিজের নাম দিয়াই লিখিতে আরম্ভ করেন। দু'জনার মাঝে এইরূপ পত্র বিনিময় হইতে হইতে, মাস কয়েকের মধ্যেই আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হই। এবং শেষে ঐ অনুরাগ নূতন প্রেমের মাদকতায় পরিণত হয়। তরুণী লিখিয়াছিলেন তাঁহার মাতা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, তিনি তাঁহার একমাত্র দুহিতা, আমি যদি তাঁহার নিকট গমন করি তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এমন কি স্বদেহ অবধি আমার করে অর্পণ করিতে প্রস্তুত।

পত্র পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহাকে পাইবার স্বপ্নে আমি বিভোর ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি চাকুরী করি, ছুটির জন্য দরখাস্ত করিবামাত্র উহা বিনা বাধায় মঞ্জুর হইয়া গেল। এখন ভয় শুধু ঠাকুর হরনাথের জন্য। মনে করিলাম কোন না কোন উপায়ে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট লুকাইতে পারিব। আমি ছুটি লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছি, ছুটি ফুরাইলে আসিব, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে এক পত্র দিলাম। পত্রপাঠ মাত্র নাছোড়বান্দা ঠাকুর আমার, কেন আমি সহসা ওরূপে স্থানান্তরে যাইতেছি এবং ব্যাপারটা কি সবিস্তারে জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি নানা কথাই লিখিলাম, কেবল প্রকৃত মূল বিষয়টী গোপন করিলাম। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর্য্যামী ঠাকুরের আমার এই উত্তর পাঠে তৃপ্তি বোধ হইল না। তিনি তাঁহার শেষ পত্রে খুলিয়া লিখিলেন, আমি তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টা পাইতেছি ও অধঃপতনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছি। যাহা হউক তবুও তিনি

আমায় ছাড়িবেন না, আমার পাছু পাছু দৌড়াইবেন ও আমার রক্ষা সাধন করিবেন।

এইরূপ ভাবে সাবধান করিয়া দিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। কিশোরী সঙ্গের লোভে ও সঙ্গে সঙ্গে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির চিন্তায় আমি তখন আর প্রকৃতিস্থ নহি। নরকে যাইতেও তখন আমি অম্লান বদনে প্রস্তুত। ঠাকুরকে এত ভয়ই বা কিসের? তাঁহার নিকট হইতে যখন আমি শত শত মাইল দূরে চলিয়াছি তখন কিরূপেই বা তিনি আমার অনুসরণ করিবেন ও আমায় খুঁজিয়া বাহির করিবেন? মনের এইরূপ অবস্থায় আমি গৃহত্যাগ করিয়া নরকের পথেই চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া তরুণীর জননীর আনন্দের সীমা নাই। চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়াদি সহযোগে আমি সংকৃত হইলাম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষটি আমার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাটী, কিন্তু ভোগের লোক নাই। চাকর বাকরদের ছাড়িয়া দিলে মানুষের মধ্যে আমরা শুধু ঐ তিনজন—মা, মেয়ে এবং আমি।

এতক্ষণে আমার আশা মিটিবার উপক্রম হইল। যাহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল তাঁহাকে পাইলাম। রাত্রি হইলে কিশোরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি, এখনও সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই—আমিই উহার পতন ঘটাইব?

দেবতার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র? কে জানিত অচিন্ত্য উপায়ে এই সূত্রে আমাদের উভয়েরই পরম মঙ্গল সিদ্ধ হইবে? কিশোরীকে কাছে পাইয়া মনে কেমন একটা বেদনা বোধ জন্মিল। মেয়েটীর মা আমার উপর একতিলও সন্দেহ না করিয়া পুত্রের ন্যায় আমার যত্ন করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার গলা ছুরি বসাইয়া আমি কি সেই বিশ্বাসের প্রতিশোধ দিব? তা' ছাড়া ধরা পড়িবারও খুব একটা ভয় হইতেছিল। ঐ চাকরগুলা ও মা যদি সব বুঝিয়াই থাকে, তখন কি উপায় হবে? মেয়েটীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দুয়ার সব

বন্ধ করা হ'য়েছে তো ? উহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া, সাবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া নিজে একটা আলো লইয়া উহার সঙ্গে দুয়ারগুলা সব আর একবার ভাল করে দেখিয়া লইলাম। এইবার নিশ্চিন্ত মনে দু'জনে আসিয়া খাটে বসিলাম, কিন্তু বসিবামাত্রই জানালার কাছে কি একটা শব্দ হইল। কক্ষটী দোতালার উপর সুতরাং জানালা বন্ধ করা আবশ্যক মনে করি নাই। শব্দ শুনিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম কি ? কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখি যে ঠাকুর হরনাথ তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। যেন শূন্যে প্রলম্বিত রহিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার জন্য একটী পিরাণ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেই, সেইটা গায়ে আছে। আমার অধঃপতনে বাধা দিতে তিনি সত্য সত্যই উপস্থিত! ঐরূপ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়া কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রহিল না। তিনি যে আমার গুরুদেব এবং আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছেন সে কথা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে ত কেহ ডাকে নাই, আপনি এখানে কেন ? চলিয়া যান।" আমার কথা শুনিয়া বালিকাটির আশ্চর্য্য বোধ হইল, জিজ্ঞাসা করিল "কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?" আমি বলিলাম, 'দেখিতেছ না কে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে ?' বালিকাটী জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কিন্তু ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বালিকা আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিল, কাহার সহিত কথা বলিতেছিলাম ? আমি বলিলাম 'সে সব পরে বলিব উনি আমার গুরুদেব, উঁহারই কথা তোমায় বলিতাম, এখন এস জানালাটা বন্ধ করি ?'

জানালাটা বন্ধ করার উদ্দেশ্য, পুনরায় যেন কোন বাধা না পড়ে। নরকে যাইতে তখন যেন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি। শিকার হাতে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িব না। জানালা বন্ধ ক'রে আবার আমি খাটে বসিতে গেলাম।

কিন্তু ইহাতেও ঠাকুরের নিবৃত্তি নাই—বিরক্তি নাই। আমার উদ্ধারের জন্য তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যে দয়াময় ও প্রেমময়! তা না হ'লে পশু পক্ষী অবধি তাঁহাকে ভালবাসে কেন ? বনের বানর তাঁহার অনুসরণ করে কেন ?



Sree Sree Thakur Haranath

(While at Dharmartha Office, Kashmir)

S. H. T. P Sava Calcutta

জানালা ছাড়িয়া এবার তিনি দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। এমন জোর ধাক্কা যে মনে হ'ল ঘরটা বুঝি পড়ে যায়। আমাদের ভয়ানক ভয় হ'ল। চাকরেরা সব জেগে উঠ্‌ল, মেয়েটীর মাও জেগে উঠ্‌লেন। আমার ঘরে দৌড়ে আস্‌তেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। মাকে সে একটা মিছা কথা ব'লে বুঝাইয়া দিল যে গোলমালে জেগে উঠে অল্প আগেই তথায় এসেছে। ব্যাপার কি? চোর না ভূত? এইরূপ ভাবেই সকলে বলাবলি করিতে লাগিল। কর্ত্রী বলিলেন, তিনি খুব ঘুমাইতেছিলেন, শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, সে রাত্রিতে আমাকে একা শুইতে দিতে তিনি আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। একজন চাকরের উপর আদেশ হইল, যেন আমার ঘরে থাকে।

মেয়ে মার কাছে গেল, আমি আমার ঘরে রহিলাম। দু'জনের কেহই আর সে রাত্রে ঘুমাই নাই। মনে এমন একটা ভাব পরিবর্ত্তন ঘটিল যে দুই জনেই সমস্ত রাত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া কাটাইলাম। প্রভাত হইলে আমি আর সে মানুষ নহি, পাপ প্রবৃত্তি তখন আমার নিঃশেষে বিলুপ্ত এবং পাপের করাল কবল হইতে আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত। আমার গুরুদেবের মহিমা ও প্রভাবের বিষয় মেয়েটীকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। সকালে দেখিলাম তাঁহার আরও অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'জানি না কি মোহবশে নরকের পথে চলিয়াছিলাম; ধন্য ঠাকুর হরনাথের দয়া, আজ হ'তে আমাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম, তিনি আমার ভগবানকে মিলাইয়া দিন' এইরূপ ভাবের সব কথা কহিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার পবিত্র জীবন, যেন স্বর্গের শোভায় শোভাময়।

সেইদিন হ'তে আমারও পাপের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। রিপুসকল বশে আনিতে পারিয়াছি বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু ঠাকুর হরনাথ সবই দেখেন, সবই জানিতে পারেন এবং সর্ব্বদাই খোঁজ রাখেন, সুতরাং আমাকেও সৎপথে থাকিতে হয়।

কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলে, কিছুদিন পরে ঠাকুরের সহিত দেখা করি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেদিন সে সময় কে আমায় ওরূপ বাধা দিয়াছিলেন ? তিনি হাসিয়া বলিলেন 'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ'। 'কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে যে ঠিক আপনারই মত, এমন কি আমার দেওয়া জামাটি অবধি যে গায়ে ছিল !' তিনি বলিলেন "তুই আমায় ভালবাসিস্, তাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাস্। ভালবাসার একটা লক্ষণই এই।"

শ্রীধাম বৃন্দাবন অবস্থান কালে ঠাকুরের পত্রে জানিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, আমরা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব এই আশায় তিনি আমাদের জন্য মেদিনীপুরে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা না যাওয়ায় তিনি কাতর হইয়াছেন। আমাদের বরিশাল হইতে চলিয়া আসিবার সামান্য কিছু পূর্ব্বেই কালু (পঃ ৩।৪২ পৃষ্ঠা) না বলিয়া আবার বরিশাল হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন "এক কাপড়ে তোমাদের কালু নানাস্থান ফিরে আজ এখানে এসেছে। তার মা, বাবা, স্ত্রী সকলেই যে কি কাতর বলা যায় না ; কেন এমন হ'ল কে জানে বাবা !"

২৫শে মার্চ্চ শ্রীধাম বৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র," শ্রীজীব গোস্বামীর "শ্রীরাধা-দামোদর", গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "শ্রীরাধা-রমণ", নরোত্তম ঠাকুরের "শ্রীগোকুলানন্দ", লোকনাথ ভট্ট গোস্বামীর "শ্রীরাধা-বিনোদ" "যোগপীঠ", "গোমটিলা", (যে স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামী 'শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ' পাইয়াছিলেন) শ্রীরূপ গোস্বামীর আসন প্রভৃতি দর্শনান্তে ঘোড়ার গাড়ীতে (৬ মাইল ব্যবধান, ভাড়া তিন টাকা) মথুরা ধামে পৌঁছাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, কংস কারাগার, শ্রীমথুরানাথ, কংস বধের স্থান, এবং বিশ্রাম ঘাটের সুপ্রসিদ্ধ আরতি দর্শনান্তে মথুরায় অবস্থিতি। ২৬শে মার্চ্চ প্রাতে মথুরা হইতে মটরবাসে (৬ মাইল ব্যবধান) নন্দ-গোকুল (মহদ্‌বন) গমন (এই স্থানেই জন্মাবধি তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অর্থাৎ দাম বন্ধন লীলা পর্য্যন্ত শ্রীমানের অবস্থিতি)। শ্রীযশোদা মা'র সূতিকা ঘর, শ্রীবলরামের জন্মস্থান 'চৌরাশী খাম্বা'

নন্দ মহারাজের বাস গৃহ), উদূখল, ব্রহ্মাণ্ড ঘাটাদি দর্শনান্তে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন। লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে এই গোকুল দর্শনে এবং স্থানের নামটি মাত্র উচ্চারণে ব্রজলীলা রসের আস্বাদন জাগাইয়া দেয়। বৈকালে ঘোড়ার গাড়ীতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কুসুম সরোবর প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পৌঁছাই। কুণ্ডদ্বয়ে স্নান, তাহার তীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন স্থান ও সমাধি এবং কবিরাজ গোস্বামীর ভজন ও চৈতন্য চরিতামৃত লিখার স্থান দর্শনান্তে তথায় অবস্থিতি। ২৭শে মার্চ্চ কুণ্ডদ্বয়ে স্নান,—

"শ্যাম কুণ্ডে রাধা কুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥"

*　　　*　　　*

"কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া।
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া॥" (নঃ ঠাঃ)

তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান প্রভৃতি দর্শনান্তে বৈকালে গিরি গোবর্দ্ধন পৌঁছাই। মানস সরোবরের জল শিরে অর্পণ করতঃ তথায় অবস্থিতি। ২৮শে মার্চ্চ প্রাতে মানস সরোবরে স্নান ও শ্রীশ্রীহরিদেব ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শন।

"গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়ন।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণ॥" (নঃ ঠাঃ)

তৎপরে টাঙ্গায় 'বর্ষাণা' (বৃষভানু পুর) পৌঁছিয়া, বৃষভানু কুণ্ড, পাহাড়ের উপর রাধারাণীর আবাস স্থান ও চরণচিহ্ন-এবং রাধা গোবিন্দের আরতি

দর্শন অন্তে তথায় অবস্থিতি। যেরূপ অবস্থার মন নিয়াই যাউন না কেন, বর্ষানা পৌছান হইতে রওয়ানা হইয়া আসার সময় পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত প্রফুল্ল থাকিবেই। ব্রজবাসী পাণ্ডাদের কাছে শুনিয়াছি—নিজেরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে আহীরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥" (নঃ ঠাঃ)

২৯শে মার্চ্চ 'শ্রীশ্রীবৃকভানু', 'প্রেম সরোবর' 'শ্রীরাধা-রমণ', 'বিহারী জি,' 'যোগপীঠ' দেখিতে দেখিতে "সঙ্কেত" পৌছাই এবং সঙ্কেত দেবী, গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন স্থান ও সঙ্কেত বটের চিহ্ন দর্শন। বট বৃক্ষটী এখন নাই, কিন্তু সেই স্থান পাকা করিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। ব্রজবাসী পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মতে সেই স্থানের উপর গড়াগড়ি দেওয়া মাত্রই, পাণ্ডাঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত শরীর শীতল এবং অপার এক আনন্দ অনুভব হইল।

"দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী! কাঁহা গিরিবর ধারী
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব॥" (নঃ ঠাঃ)

ব্রজবাসী পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন স্থান নিয়া দুই পক্ষে ভীষণ গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছিল। সখীগণ বলেন যে তাঁহাদের রাধা রাজকন্যা, তিনি কেন গোয়ালার বাড়ী যাইবেন? আর সখাগণ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, তিনি কেন স্ত্রীলোকের বাড়ী যাইবেন? কিছুতেই বিবাদ মিটে না; তৎপর ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান নন্দ গ্রাম এবং শ্রীরাধার বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তী এই "সঙ্কেত" স্থানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইবেন ঠিক করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। তথা হইতে নন্দ গ্রামে

পৌছাই। নন্দীশ্বর পর্ব্বতের উপর নন্দ মহারাজার বাড়ী (নন্দ মহারাজার পৈত্রিক বাসস্থান। তিনি কংসের ভয়ে গোপকুল সহ "শ্রীমান্"কে নিয়া বৃন্দাবন ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন), শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদা এবং উভয়ের মধ্যে স্থাপিত গোপাল মূর্ত্তি, প্রেম সরোবরাদি দর্শনান্তে যাবটে যাই।

"যাবটে আমার কবে এ পাণি গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সেবি দুহাঁর যুগল চরণ॥ (নঃ ঠাঃ)

অভিমন্যু ওরফে আয়ান ঘোষের বাড়ী এবং বিগ্রহ আদি দর্শনান্তে কোষি রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হই।

একজন প্রবীণ বৈষ্ণবের নিকট শুনিয়াছি যে নন্দগ্রামের কয়েকজন ব্রজবাসী তাঁহাকে বলিয়াছেন "চার গাঁও লালাকা, চার গাঁও লালীকা" এই কথা ব্রজে চিরন্তন প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ ব্রজ ভূমিতে শ্রীনন্দের লালা চারিটি গ্রামের মালিক এবং শ্রীবৃষভানু রাজার লালী অপর চারিটি গ্রামের মালিকা। লালার খাস সম্পত্তি (১) গোকুল, (২) গোবর্দ্ধন, (৩) নন্দগ্রাম, (৪) মথুরা। আর লালীর খাস সম্পত্তি (১) রাধারাণীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান—রাওল গ্রাম, (২) বর্ষানা, (৩) যাবট, (৪) বৃন্দাবন। কোন কোন ব্রজবাসীর বদ্ধমূল বিশ্বাস যে লালা ও লালীর মালিকী সত্ত্ব নিরূপক দলিল অদ্যাপি উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। বলিহারি যাই বিশ্বাসকে! ৪০০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত একজন সরকারী ডাক্তার, মুসলমান হইয়াও ট্রেণে হাতরাস হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কোন স্থানে গাড়ী পৌছিলে তিনি গদগদ ভাবে নিকটে বসা

উপরোক্ত বৈষ্ণব মহাজনকে বলিয়াছিলেন "From here commences the abode of Lord Krishna" অর্থাৎ এই স্থান হইতে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বসতি স্থল ও সম্পত্তির আরম্ভ। ভক্তি মার্গের সাধক যে কোন রকমেই হউক তাঁহার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেও নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। আর আমরা ?

মথুরা হইতে কৌষি পর্য্যন্ত আমরা আগাগোড়া টাঙ্গা গাড়ীতেই পরিভ্রমণ করিয়াছি। কৌষি হইতে ট্রেণে আগ্রা পৌছিয়া ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে তাজমহলাদি দর্শন করতঃ মথুরায় আগমন ও অবস্থিতি। ৩১শে মার্চ্চ বৃন্দাবন পৌছিয়া অবশেষে ৩রা এপ্রিল তথা হইতে প্রস্থান। এই দুইবারে মাত্র ১১ দিন আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবন থাকিতে পারিয়াছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীনিকুঞ্জ বনে যাইয়া আরতি আদি এবং আত্ম সমর্পণের এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে ভগবানের অবস্থা যাহা হয় তাহার জলন্ত মুর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্রপট (এ বিষয়ে আমি এই খণ্ডেই ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি) দর্শন করতঃ যে কি আনন্দ পাইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

"আর কবে এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুঞ্জ লতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥"

* * *

"কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়।
হরি হরি! কবে মোর হইবে স্থদিন।" (নঃ ঠাঃ)

প্রাতে এবং বৈকালে দুই বেলা যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ ও স্নান করার

সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে **ভাব** পাই নাই কাজেই সেইরূপ আনন্দও অনুভব করিতে পারি নাই। পারিয়াছিলেন বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর। তাই, তিনি তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্র বয়ান॥
হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিন॥" (নঃ ঠাঃ)

রোজ প্রাতে ৮৷৯টার সময় বংশীবটে ব্রজবাসী ছেলেরা রাধা, কৃষ্ণ, সখী সাজিয়া রাস লীলা অভিনয় করেন। নৃত্য গীত হইতে হইতে হঠাৎ শ্রীরাধা মানভরে চলিয়া যান শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার পাছে পাছে অদৃশ্য হইয়া যান, তৎপরে সখীগণও চলিয়া যান। আবার সকলে একত্র হইয়া রাসের নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করেন। অপরূপ দৃশ্য! সেই লোভে সময় পাইলেই তাহা দেখিতে যাইতাম এবং সেই সুযোগে বংশীবটে একটা গড়াগড়ি দিয়া আসিতাম, দেখি তাপ দূর হয় কি না! কারণ নরোত্তম ঠাকুর অনুভূতি করতঃ লিখিয়া গিয়াছেন "তাপ দূর করিব শীতল বংশী বটে"।

"আর কবে এমন হব, শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাইয়া পরম আনন্দ হঞা
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥" (নঃ ঠাঃ)

এই অল্প কয়েক দিন থাকিয়া বৃন্দাবন দর্শনের পিপাসা মিটিতে পারে না। তার উপর আবার আমাদের না আছে দর্শন করিবার চক্ষু, আর না আছে

ধামের রস আস্বাদন করার ক্ষমতা! বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম ঠাকুর নিজের জীবনে অনুভূতি করিয়া তারস্বরে লিখিয়াছেন ঃ—

"আজি রাস বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম ঘন বরিষয়ে প্রেম সুধাধার।
করয়ে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
দিগ বিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥"

সাঁতার জানিলেই বিপদ, আর সাঁতার না জানিয়া ডুবিতে পারিলেই কিস্তি ফতে! সে যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবন দর্শনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহাই আমার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজী ও শ্রীশ্রীমদনমোহনজী কালাপাহাড়ের সময় হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিত্যাগ করতঃ যথাক্রমে জয়পুর ও করৌলীড়ে (রাজপুতানার অন্তর্গত) বিরাজ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই ৫রা এপ্রিল বৃন্দাবন হইতে ট্রেণে রওয়ানা হইয়া শেষ রাত্রে দিল্লী এক্সপ্রেসে হিণ্ডাউন স্টেশনে পৌছিয়া টাঙ্গায় ৩৸০ ঘণ্টায় করৌলী পৌছিলাম। (ভাড়া—৫৶০ আনা,) এবং মদনমোহন জীর মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। রাত্রে আরাত্রিকাদি দর্শনান্তে তথায় অবস্থিতি করতঃ পরদিন পূজাদি দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে বৈকালে কৌরালী হইতে টাঙ্গায় রওয়ানা। সন্ধ্যার সময় হিণ্ডাউন পৌছিয়া শেষ রাত্রের ট্রেণে রওয়ানা হইয়া সিওয়াই ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতঃ জয়পুর পৌছিলাম। গোবিন্দ জীর মূর্ত্তি দেখিয়া যে কি আনন্দ পাইলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, রাত্রে আরাত্রিকাদি দর্শন, এবং তৎপর দিন (৭ই এপ্রিল) পূজাদি দর্শন এবং

মহাপ্রসাদ সেবনান্তে আজমীর পুষ্কর তীর্থ দর্শন করার অভিলাষে জিনিষপত্র সহ রওনা হইয়া সদর রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে রাস্তায় প্রায় মিনিটে মিনিটে ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করে সেই রাস্তায় পুলিশের সাহায্য নিয়াও আজমীরের ট্রেণ ছাড়ার পূর্ব্বে একখানা গাড়ী পাওয়া গেল না; তখন বুঝিলাম যে ঠাকুরের ইচ্ছা নহে যে আজমীর যাই। তাই, পরবর্ত্তী ট্রেণে রওয়ানা হইয়া ট্রেণের মধ্যেই জরাক্রান্ত হইয়া ঐ দিনই দিল্লী পৌছিলাম। ১০ই এপ্রিল অন্নপথ্য করিয়া ১১ই এপ্রিল মটরে বাহির হইয়া কুরুপাণ্ডবদের নানা স্মৃতি-চিহ্নাদি এবং অপরাপর অনেক দেখিবার স্থান দর্শন করতঃ ঐ দিনই দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া ১২ই এপ্রিল প্রাতে হরিদ্বার পৌছি।

তথায় শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং আমাদের ঠাকুরের অতিপ্রিয় ভক্ত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার, ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত কিরণেন্দু ঘোষ, আশুতোষ বাগ্‌চী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড়ই আনন্দ হইল। ১৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হরিদ্বার থাকিয়া কুম্ভমেলা উপলক্ষে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিণ্ডদান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী দর্শন, কন্‌খলে দক্ষযজ্ঞের স্থান, দাক্ষেশ্বর শিব, সতীকুণ্ড ও গঙ্গা এবং বেল্লিকেশ্বর শিব, মায়াদেবী, গৌরী-শঙ্কর কুণ্ড ও শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি যে স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন সেই গুহা, তৎপর হৃষীকেশ, লছমন ঝোলার নিম্নদেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

আমরা গিরি মহারাজের ধর্ম্মশালায় বাস করা কালে পাইয়াছিলাম পরম বৈষ্ণব দুটী ভাই—কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মল্লিককে। আমরা যে কোঠায় শয়ন করিতাম তাহার সম্মুখে খোলা জায়গায় তাঁহারা থাকিতেন। রোজ প্রাতে ও বৈকালে দুই ভাই দুই জোড়া করতাল বাজাইয়া ভক্তিভরে নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন; তাহা আমার এখনও যেন কাণের মধ্যে বাজিতেছে।" ঐ গানটী

জীবনে আমার মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে। ঠাকুরের কৃপা যে কখন্ কাহার মধ্য দিয়া কি ভাবে আসে তাহা বলা সুকঠিন।

"নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণ প্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণের পদ পাব এই অভিলাষী॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করে কর তারে বৃন্দাবন-বাসী॥
এই মনের অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি।
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
কুঞ্জ-সেবা দিয়ে মোরে কর নিজ দাসী॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমানন্দে সদা ভাসি।
নমো-নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী॥"

তাঁহারা এই ভাবেই মনঃ-প্রাণে তুলসী সেবা করিতেন। নামাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিদাস প্রভুর উপদেশ ঃ—

"নিরন্তর নাম কর—তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ)

এই দুই ভাই উপরোক্ত উপদেশ অনুসরণ করিয়াই চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম্মশালাটি ঠিক গঙ্গার পাড়েই অবস্থিত এবং তাহার সিঁড়ি গঙ্গার মধ্য হইতেই উঠিয়াছে। ঐ সিঁড়ির অতি নিকটে ধর্ম্মশালার মধ্যে একটী কোঠায় "শিব" স্থাপিত আছেন। গিরি মহারাজ ঐ ঘাটে স্নান করিয়াই ভক্তি গদ্‌গদ্ ভাবে ঐ শিব পূজা করেন। তৎপর তিনি আশ্রমে গিয়া বসিলে শিষ্যগণ একে একে যাইয়া তাঁহার চরণ পূজা করেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। তাঁহার

একজন অতি প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শশীকুমার গুপ্তের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় সামান্য কিছু লিখিয়াছি। তিনি ঐ সময়ে হরিদ্বার যাইয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। যে গিরি মহারাজ বাল্যকালে সংসার ছাড়িয়া এত উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং যিনি কুম্ভমেলা উপলক্ষে নানা কার্য্যে এবং ঐ উপলক্ষে উপস্থিত থাকা শত শত শিষ্যের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, সেই গিরিমহারাজ উপরোক্ত শিষ্যটীর ব্যারামের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে যেরূপ আদর যত্ন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

আমি হরিদ্বার থাকা কালে ঠাকুরের নিকট হইতে এক পত্র পাই, তাহাতেও লিখিয়াছেন যে, আমাদের সঙ্গে দেখা হবে তজ্জন্য তিনি মেদিনীপুর বসেছিলেন। ঐ পত্রে আরও জানিতে পারিলাম যে তিনি ঝাড়গ্রামে যাইতেছেন; তাঁহার ভক্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার S. N. Mittra-এর নিকট থাকিবেন, আমাকে সেই ঠিকানায় পত্র লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে রাধানগর উৎসবে যাইবেন।

৺ললিতমোহন দত্ত

ইনি ছিলেন ই, বি, রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী। ১৯২২ সনের বড়দিনের বন্ধের সময় পুরী যাওয়ার পথে শুভক্ষণে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় (অঃ ১।১১ পৃষ্ঠা)। তদবধি তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কি সোণামুখী ধামে ঠাকুর দর্শনে, কি ঠাকুরের জন্মোৎসবে, কি আনন্দ-মিলনে, কি হরনাথ-সাধন-সঙ্ঘে, কি ঠাকুরের সম্পর্কীয় অন্য কোন সভা সমিতিতে, কি ঠাকুর কলিকাতা আসিলে তাঁহাকে দর্শন করিতে যখন যেখানে গিয়াছি, সমস্ত সময়েই তিনি আমাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের কলিকাতার এবং বরিশাল আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমাদের

বরিশালের বাসায় ঠাকুরের শুভ-পদার্পণ উপলক্ষে, এমন কি আমাদের ছেলে মেয়েদের বিবাহাদিতেও তিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের অপেক্ষাও বেশী সম্মান এবং ভয় করিতেন। নিজে বেশ ভাল গাইতে পারিতেন এবং সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি বহু বহু গান রচনা করিয়া আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও (তাঁহার নিজের ছেলে মেয়ে না থাকায়) তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়া সুন্দর একটী গানের দল গঠন করতঃ ঠাকুরের সম্বন্ধীয় বড় বড় সভায় ঠাকুরের গুণ গান করিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতাদিগকে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া দিতেন। তাঁহার রচিত অল্প কয়েকটী গান "মোহন-মুরলীতে" মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার একটী মাত্র গান, যাহাতে তাঁহার নামের সঙ্গে আমার নাম একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

"ওরে পাষাণ মন, কি ভাবছ অবিরাম,
রাধা কৃষ্ণ যুগল চরণ একবার ভাবিলে না ॥
জীবন টলমল, (যেন) পদ্মপত্রের জল,
দিনের দিন ফুরায়ে গেল, কিছু করিলে না ॥
মায়া মোহে ভুলে, সংসার কোলাহলে,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম বলিলে না।
সুখ সম্পদ তরে, ঘুরে বেড়াও হা হা ক'রে,
কোথা সুখ কোথা শান্তি তাই জানিলে না ॥
(শুধু) বিষয় বাসনা বিষে, নিশিদিন নিলরে শুষে,
বিষহরী হরি নাম মুখে করিলে না।
এ সংসারের বন্ধন, করিবারে খণ্ডন,
একমাত্র হরিনাম তাই কি জান না ?
অক্ষয়-ললিত কাঁদে, মজিয়া মোহের ফাঁদে,
(বুঝি) নামে শুচি নামে রুচি কভু হইল না।

শেষেরি সম্বল, রাধা কৃষ্ণ নাম বল,
নাম সুধা পান করিয়ে একবার দেখ না।
ভজ রাধা গোবিন্দ, জপ রাধা গোবিন্দ
গোবিন্দ গোবিন্দ নাম কভু ভুল না॥"

'মোহন-মুরলীতে' তাঁহার স্ত্রী প্রবাসিনী দত্তের নামে যে কয়েকটী গান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীমান্ ললিতেরই রচিত। ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার একটু একটু কাশ হইত, কিন্তু তীর্থ ভ্রমণে বাহির হওয়ার পরেই ঐ রোগটী ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও আরম্ভ হইল। আমি তাহাকে মথুরাদি স্থানের বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ঐ ব্যারামের জন্য তাহার একটু ভয় হওয়ায় সে কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে বলিয়া আমার নিকট ২।১ দিন মৌখিক প্রকাশও করিয়াছিল, কিন্তু কুম্ভ-মেলাদি দর্শনের লোভ সামলাইতে না পারিয়া বিরত ছিল। তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া আমরা ৪ জন (আমি, আমার স্ত্রী, ললিত ও তাহার স্ত্রী) বরাবরই এক স্থানে থাকিতাম। হরিদ্বার আসিয়াও চারিজনেই শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমে উঠিয়াছিলাম। কিন্তু আমার গ্রামের কয়েকজন লোক, বিশেষতঃ আমার ধর্ম্মপথের সহায় ৺লক্ষ্মীচরণ সেনগুপ্ত (অঃ ১।১৩ পৃষ্ঠা) গিরি মহারাজের ধর্ম্মশালায় থাকেন বলিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিক অনুরোধে তথায় বেশী স্থান না থাকায় ললিত ও তাহার স্ত্রীর থাকার জন্য উপরোক্ত আশ্রমেই যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি ও আমার স্ত্রী ধর্ম্মশালায় চলিয়া যাই। পরের দিন ধর্ম্মশালার দোতালায় স্থান হওয়ায় শ্রীমান ললিত এবং তাহার স্ত্রীও তথায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। আমরা থাকিতাম এক তালায় আমার গ্রামবাসী লোকদের সঙ্গে। একে ক্রমান্বয়ে শরীর খারাপ হইয়া পড়িতেছিল, আবার কুম্ভস্নানও হইয়া গিয়াছে, তার উপর আবার আমরা তাহাদিগকে আশ্রমে ছাড়িয়া আসায় প্রাণাধিক ললিত ব্যথিত হইয়া, আমরা ১৫ই এপ্রিল যখন হৃষীকেশ

গিয়াছিলাম তখন তাহার স্ত্রীকে নিয়া আমাদের নিকট কিছু না বলিয়াই কলিকাতা চলিয়া যায়। সে যে এতদূর ব্যথিত হইবে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলে আমি কখনও তাহাকে ছাড়িয়া আসিতাম না। আমার ইহাতে নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার নিকট কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যখনই আমার ইহা মনে পড়ে তখনই আমি অনুতাপে দগ্ধ হই। বিশেষতঃ আমরা ৫ই মে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে তাহার ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ডাক্তরগণ যক্ষ্মা রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কলিকাতায় যে দুই দিন ছিলাম, রোজ তাহাকে দেখিতে গিয়াছি এবং চিকিৎসার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করার সাহায্যও করিয়াছি। কিন্তু চাকরীর খাতিরে আমাকে বাধ্য হইয়াই তখন বরিশাল চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমার পরম দুর্ভাগ্য যে সেই আমার শেষ দেখা। শ্রীশ্রীঠাকুর ২৫শে মে তারিখে দেহ রক্ষা করেন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সহোদর-প্রতিম ললিত আমাদের মায়া পরিত্যাগ করতঃ হরনাথের অভয় তরীর সাহায্যে এই ভব দরিয়া পাড়ি দিয়া তাঁহারই পদ-প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বহু পূর্ব্বেই তিনি নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

“হরনাথ কণ্ডারী ভাসায়ে অভয় তরী
দিয়াছেন পাড়ি এই ভব দরিয়ায়।
(ওরে) আয়, আয়, আয় বলে, ডাকেন দু’বাহু তুলে
পাপী, তাপী, শোকী, দুঃখী যে আছ যথায়॥
ভবে এসে মোহ বশে, মায়া পাশে আচ্ছন্ন,
বিষয় ভাবনা ভেবে, ব্যাধিগ্রস্ত বিপন্ন ;
হর নাম মহৌষধি, সেবন না করিবে যদি
অভয় তরণী মাঝে স্থান নাহি পায়॥
(ওরে) ভব পারে যেতে তার ভরসা কোথায়॥
ভবার্ণব তরিবারে আর কি উপায় হতে পারে,

ভব কর্ণধার হর, বসেছেন হাল ধরে,
(এখন) হরনাথ নাম স্মরি, উঠ তরী ত্বরা করি,
তরণী সাজান ঘাটে সময় বয়ে যায় ॥
হরনাথ বিনে আর নাহিক উপায়,
হেলিয়া দুলিয়া তরী তরঙ্গে যায় রঙ্গে,
কত শত নর নারী আছে তার সঙ্গে,
জয় হরনাথ ধ্বনি কাঁপাইয়া মেদিনী ;
চেয়ে দেখ, ঐ অভয় তরী ভব পারে যায় ॥
(তরী হরনাথ পবনে বয়ে নিয়ে যায়।)"

তাঁহার লক্ষ্মী-সদৃশী ও পরমা ভক্তিমতী স্ত্রীও দেড় বৎসর পরেই ঐ যক্ষ্মা রোগেই মর-ধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে কি সাহায্য পাইয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। দয়াময় ঠাকুর তাহাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

আমরা আরও বহু তীর্থ দর্শন করিব এবং বোম্বাইতে ঠাকুরের বহু ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকেও দর্শন করিতে যাইব বলিয়া ঠাকুরকে লিখিয়াছিলাম এবং ঠাকুর আমাকে উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে তিনি আমাদের যাওয়ার বিষয়ে বোম্বাইর পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত দ্বারকা দাস, জগমোহন দাস কলিয়ান দাসের নিকট পত্র দিয়াছেন। তাই আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের গ্রামের আমার আত্মীয় ও ধর্ম্মপথের একজন সহায় শ্রীমান্ বিমলাচরণ দাসকে সঙ্গে নিয়া ১৬ই এপ্রিল রাত্রের ট্রেণে হরিদ্বার হইতে রওয়ানা হইয়া তৎপর দিন প্রাতে ৯টার সময় কুরুক্ষেত্র পৌঁছি। উপরের বর্ণিত পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ মল্লিক এবং সত্যচরণ মল্লিক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাই তাঁহাদের সাহায্যে "গীতা-ভবন" নামক অতি সুন্দর একটি অট্টালিকায় স্থান পাইলাম। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠ, ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পলাশ পুষ্পের ছোট ছোট গাছ।

তন্মধ্যে "গীতা-পাঠস্থলীতে" সারথীরূপে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বের বল্গা ধরিয়া পিছনে অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া যে ভাবে তাহাকে গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ মূর্ত্তিতে অবস্থিত আছেন। বড়ই মনোরম মূর্ত্তি। তথা হইতে বহু দূরে যে স্থানে ভীষ্ম, অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া রবির উত্তরায়ণ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন ত্যাগ করিবেন না বলিয়া শরশয্যায় শায়িত ছিলেন সেই স্থান এবং তাহার নিকটে যে স্থানে ভীষ্মের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য অর্জ্জুনের বাণ পৃথিবী ভেদ করতঃ নিম্নে প্রবেশ করিয়া ভোগবতী গঙ্গা উঠাইয়াছিলেন, সেই কুণ্ডটী অবস্থিত। সাধারণ ভাষায় উহাকে "বাণ গঙ্গা" বলা হয়, ইহার জল শ্বেতবর্ণ। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তৎপরে থানেশ্বর শিব, মহাকালী ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিয়া গীতা-ভবনে অবস্থিতি। কুরুক্ষেত্র বড়ই নির্জ্জন এবং মনোরম স্থান। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, রাত্রে একাকী কুরুক্ষেত্রের মাঠে যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে দেখা হইবে। তাই অপর সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তখন আমি তথায় যাওয়ার জন্য একাকী বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু স্থানটী অত্যন্ত নির্জ্জন বিধায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না, তাই বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমার সেই অবস্থাটী জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। পরদিন (১৮ই এপ্রিল) দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি ও কুন্তীশ্বর শিব দরশন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম।

দ্বারকাধীপ শ্রীকৃষ্ণ যখন সূর্য্যাপরাগ উপলক্ষে এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যজ্ঞের আয়োজন করতঃ ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তখন শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সহচরীগণকে বলিয়াছিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত মালতী স্থরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার তখন পতি হইয়াছেন ; সেই মধুমাসের রাতিও উপস্থিত ; উন্মীলিত মালতী পুষ্পের সৌগন্ধও আছে ; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে ; সুরত ব্যাপার লীলা কার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত ; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

"শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন॥

*　　　*　　　*

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥" (চৈঃ চঃ)

ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণের মনে বাঞ্ছা হইল যে, আস্বাদন করিবেন শ্রীরাধা তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসেন, তাঁহার নিজেরই বা কত মাধুর্য্য আছে এবং শ্রীরাধাই বা তাহা আস্বাদন করতঃ কিরূপ সুখী হইতেছেন।

"নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥

*　　　*　　　*

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥

*　　　*　　　*

রাধা-প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥

*　　　*　　　*

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥

* * *

বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ
আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ

* * *

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধকধকি॥

* * *

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥

* * *

অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥

নম্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥

* * *

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তব মন ধায়॥" (চৈঃ চঃ)

ইহা আস্বাদনের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গাবতার। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, তখন মনে ভাবিতেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রে মিলন পাইয়াছেন। আবার রথযাত্রার সময় তিনি যখন রথের আগে আগে—

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি' গেনু॥" (চৈঃ চঃ)

এই ধূয়া গান গাহিয়া গাহিয়া দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে থাকিতেন এবং ভাবে অভিভূত হইয়া "যঃ কৌমার হর···" শ্লোকটী পাঠ করিতেন।

কুরুক্ষেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া এই ভাবটী মনে উপস্থিত হইলে যে কিরূপ আনন্দ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইলেও আমার সাধ্যের অতীত।

আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাই, এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠিল না। সে যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দেখিলেন, যে তাঁহার সন্ন্যাস নেওয়ার ফলে স্ত্রীলোক এবং বিষয়ী বাদ পড়িয়া গেল, তখন তিনি লীলা সঙ্গোপন করিলেন, এমন ভাবে, যে তাঁহার দেহটী পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। যাঁহারা স্নান করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন মহাসিন্ধুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডাগণ বলেন শ্রীশ্রীজগবন্ধুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। টোটা গোপীনাথের সেবাইতগণ বলেন, শ্রীশ্রীগোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া

গিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলেন যে তাঁহার পূজিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বিগ্রহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

করুণাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্বাসীদের মঙ্গলের তরে তাঁহার "শিক্ষাষ্টক", "নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবা", "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রভৃতি বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। আরও বলিয়া গিয়াছেন—

"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার॥" (চৈঃ ভাঃ)

সুতরাং আবার অবতীর্ণ হইতে হইলে চিরকাল গৃহীরূপে থাকারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

"অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার॥

*   *   *

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ-স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ॥" (চৈঃ চঃ)

সে যাহা হউক, হরনাথ-ভক্তের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরই শ্রীহরনাথ। তাঁহাকে যাহারা গুরুভাবে ভাবেন—

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু
মদাত্মা সর্ব্ব ভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

যাঁহারা তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত বলিয়া মনে করেন—

"ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥" (চৈঃ চঃ)

আর যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কথা তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ও সব বিষয়ে আলোচনা করা আমার মত লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। যাহা কলমের টানে লিখিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে কোন পাঠকের কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১৮ই এপ্রিল রাত্রে কুরুক্ষেত্র হইতে রওয়ানা হইয়া ১৯শে এপ্রিল রাত্রে বলামৌ ষ্টেশনে উপস্থিতি ও অবস্থিতি। ২০শে এপ্রিল বেলা ১০টার পর নৈমিষারণ্যে গমন।

পাঠকবর্গ সকলেই জানেন যে ভগবান ব্যাসদেব জগতের কল্যাণের জন্য বেদকে চারিভাগে বিভাগ করেন, ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ প্রকাশ করেন, এবং সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু তাহাতেও চিত্তের সন্তোষ লাভ করিতে না পারায় দেবর্ষি নারদ তাঁহার চিত্তের মালিন্য দূর করার জন্য তাঁহাকে একাগ্রচিত্তে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করতঃ বাসুদেবের মহিমা মুখ্যভাবে প্রকাশ করার জন্য উপদেশ দেন। ব্যাসদেব তদনুসারে ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া ভক্তি-যোগের প্রভাবে বাসুদেব তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব এবং সমস্ত অনর্থের মূলচ্ছেদনকারী বাসুদেব বিষয়ক ভক্তিতত্ত্ব দর্শন করতঃ অন্তরে দৃশ্য ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং যথাসময়ে নিজের সুযোগ্য পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দেন; কলিযুগের আবির্ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলে লোকের দৃষ্টি অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল; লোকের চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া ধর্ম্মের বিমল পথ দেখাইবার জন্য শ্রীশ্রীভাগবত রূপ পুরাণ ভাস্কর তখনই প্রকাশিত হন। তৎপর শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজ যখন শাপগ্রস্ত হইয়া ৭ দিন পরে মরিয়া যাইবেন বলিয়া জানিতে পারিলেন তখন তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কি কর্ত্তব্য, কি শ্রোতব্য এবং কি অনুক্ষণ স্মরণ ও ভজন করা উচিত। ভগবান লীলাময়

এবং লীলার মধ্যেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং ভক্তের পোষণ জন্য বহু লীলা করেন। কোনও স্বরূপে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন, আর কোনও মূর্ত্তিতে, তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন। যিনি বাল্যকালে ননী-চোর, পৌগণ্ডে গোপীর বসন চোর, তিনিই আবার যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতির মন চোর। তাঁহারই নাম শ্রীকৃষ্ণ। সকল অবতারই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত। সুখ পাইবার এবং বুঝিবার শক্তিও সুখময় এবং তাহারই নাম ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহার গুণ প্রকাশ প্রেমে, প্রেম পাইলেই শ্রীভগবানকে পাওয়া হইল। ভগবানের গুণ গাহিলে প্রেমের প্রকাশ হয়। তাই—শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁহার পিতা মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত ভগবদ্‌গুণাদি বর্ণনে পরিপূর্ণ পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে কৃত কৃতার্থ করেন। সেই সভায় বহু মুনি ঋষিগণ উপস্থিত থাকা সত্বেও শ্রীল সূত গোস্বামী যেভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আসনের নিম্নে বসিয়া তন্ময় হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনিই ভাগবত পাঠের একমাত্র অধিকারী। শৌনকাদি যাট হাজার মুনিগণের 'জীবনের একান্ত মঙ্গলের উপায় কি' প্রভৃতি ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত পুরাণ ইতিহাসের রহস্যবেত্তা শ্রীল সূত গোস্বামী ভগবানের অধিষ্ঠানভূমি পুণ্যক্ষেত্র এই নৈমিষারণ্যে আবার সেই ভাগবত শাস্ত্র বর্ণন করেন। যাহার গৃহে সর্ব্ব বেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ না থাকে তাহাকে কখনও বৈষ্ণব বলা যায় না। এই নৈমিষারণ্য বৈষ্ণবদের একটী পরম তীর্থ।

আমরা নৈমিষারণ্যে ভাগবত পাঠের স্থান, চক্রতীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, গোমতী গঙ্গা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ঐ দিনই বৈকাল বেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন বৈকালে অযোধ্যা পৌঁছিয়া সরযূ নদীতে অবগাহন করতঃ সন্ধ্যার সময় অতি মনোরম সরযূ আরতি দেখিলাম। আমার স্ত্রী ঐ আরতি দেখিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া যখন মাটীতে পড়িয়া যাইতেছিলেন তখন আমার সঙ্গী

বিমলাচরণ তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপর সরযুতীরে খোল করতালাদি সহ যে অতি মধুর রামায়ণ পাঠ হয় তাহা শ্রবণ করতঃ অযোধ্যায় অবস্থান করিলাম। পরদিন ২২শে এপ্রিল প্রাতে সরযু নদীতে অবগাহন-পূর্ব্বক জনক ভবন, রাজ মহল, রত্ন বেদী, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম স্থান, অন্নারম্ভের স্থান, খেলিবার স্থান, কোপ ভবন, হনুমান গাড়ী, তুলসীদাসের আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বৈকালে অযোধ্যা হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রে কাশীধামে পৌছাইয়া তথায় অবস্থিতি।

হরিদ্বার হইতে রওয়ানা হইয়া ৺কাশীধাম পৌছান পর্য্যন্ত উপরের বর্ণিত পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ মল্লিক ও সত্যচরণ মল্লিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইহার পূর্ব্বে কি পরে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু ঐ অল্প কয়েক দিন তাঁহাদের সঙ্গলাভে যে উপকার পাইয়াছি তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

২৩শে হইতে ২৫শে এপ্রিল ৺কাশীধামে থাকি। আমরা রোজ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব, শম্ভুনাথ ও অন্নপূর্ণার বাড়ী দর্শন করতঃ বাজার করিয়া বাসায় আসিতাম। আবার বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট পরিভ্রমণ করতঃ ভাগবত পাঠ, মনোরম কীর্ত্তনাদি শ্রবণ অন্তে শম্ভুনাথ ও অন্নপূর্ণার বাড়ী হইয়া বাসায় ফিরিতাম। শম্ভুনাথের বাড়ীর আরতি বড়ই গম্ভীর, মন উধাও করিয়া নিয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে নীলাচল ফিরিবার পথে, এই কাশীধামে তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে বাসা ও শ্রীতপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে দুই মাসকাল 'জীবের স্বরূপ', 'কৃষ্ণ শক্তি', 'সম্বন্ধ জ্ঞান', 'অভিধেয়রূপা ভক্তি' প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ পুর্ব্বক তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন পাঠান। তৎপর দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কৃপা করতঃ গৌড়ীয় জগতের সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীপ্রবোধানন্দ" প্রস্তুত করেন। কিরূপে তাঁহাকে

উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ২য় খণ্ডের ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণন করিয়াছি। যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের "মুক্তি"ই চরম লক্ষ্য সেই কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রকাশানন্দ সরস্বতী অবশেষে বলিয়াছিলেন "যদি আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি এবং টপ্ করিয়া উপর হইতে 'মুক্তি' আমার হাতের উপরে পড়ে ও তেত্রিশ কোটী দেবতা আমার চরণে ধরিয়া ঐ "মুক্তি" গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন তত্রাপি আমি **'মুক্তি চাই না'**; আমি চাই শুধু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ।"

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥

*　　*　　*

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

*　　*　　*

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ)

আর আমার ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

১। "এ রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনিতে চায় না। মুক্তি এখানে দোকানে পড়ে থেকে বস্তা পচা হয়ে গেছে"। (পঃ ২।১৩)

২। "কৃষ্ণ-ভক্তগণ মুক্তিকে প্রার্থনা করে না। মুক্তি একঘেয়ে এক রকমের খেলা; কৃষ্ণ-ভক্তগণ এরূপ খেলিতে চায় না। তাহারা ক্ষণে ক্ষণে নবরাগে নূতন খেলা খেলিতে চায় ও খেলে।" (পঃ ২।৩২)

৩। "মা, ভবে আসিতে ভয় পাইও না, ভ্রমেও মুক্তি চাহিও না। যারা নিতান্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন তারাই খেলা ছেড়ে জড়বৎ থাকিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে রাখিয়া বার বার এই ভবে আসিব, এমনি করে সকলে মিলিব আবার পট পরিবর্ত্তন করিব, আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিব।

২৩শে এপ্রিল প্রাতে কাশীধাম হইতে রওয়ানা হইয়া বিন্ধ্যাচল পৌছিয়া "বিন্ধ্যবাসিনী" এবং অষ্টভুজা দর্শনান্তে তথা হইতে বৈকালে রওয়ানা এবং ঐ দিনই প্রয়াগে (এলাহাবাদে) উপস্থিতি ও অবস্থিতি। পরদিন প্রাতে ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করতঃ "অলোপ শঙ্করী", "বেণীমাধব", "শেষ নাগ", বাল্মীকি ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দর্শন। পাণ্ডার কাছে শুনিলাম যে একদা শঙ্কর-শঙ্করী শূন্যে বিচরণ কালে দেখিতে পাইলেন যে তাহাদের নিম্নে এক ঘাটে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতে যাইতেছেন। শঙ্করী যখন শঙ্করের নিকট জানিতে পারেন যে ঐটী প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘাট তখন তিনি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, তুমি না আমাকে বলিয়াছিলে যে এই ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করিলে তাহার কৈলাসে বসতি হয়? তবে এত লোককে কি করিয়া কৈলাসে স্থান দিবে?" "এত লোকের মধ্যে কয়জন লোক প্রকৃতপক্ষে স্নান করে? আচ্ছা দেখিবে? এই কথা বলিয়া শঙ্কর ও শঙ্করী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করতঃ ঘাটের নিকটে পথের পার্শ্বে শঙ্কর একটী মৃত শবের মতন পড়িয়া রহিলেন এবং তাঁহার উপদেশ মত, যাহারা যাহারা ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল, কি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট শঙ্করী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা আমার স্বামীকে দাহন করার সাহায্য কর। আমরা ব্রাহ্মণ বটি, কিন্তু তোমরা যে কোন জাতীয় লোক হও না কেন, শরীরে কোন পাপ না থাকিলেই হইল; তবে কোনরূপ পাপ থাকিলে এই মৃত দেহ স্পর্শ করা মাত্র সেই লোকটি ভস্ম হইয়া যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কি কেহ এই দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিতে পারেন? অবশেষে এক চণ্ডাল সমস্ত রাত্রি বেশ্যা বাড়ীতে মদ্যপানাদি করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিতে যাওয়ার সময় শঙ্করীর ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ত্রিবেণী ঘাট হইতে একটা ডুব দিয়া আসি। আমি একাই সৎকার করিয়া আসিতে পারিব"। তিনি এই কথা বলিয়া দৌড়াইয়া ঘাটে যাইয়া যখনই একটী ডুব

দিলেন তখনই শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিলেন "এত লোকের মধ্যে মাত্র এই একটী লোক প্রকৃতপক্ষে ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করিলেন।" শঙ্করী ও শঙ্কর তৎক্ষণাৎ অলোপ (অদৃশ্য) হইয়া গেলেন। তাই ঐ স্থানটীর নাম হইয়াছে "অলোপ-শঙ্করী।" প্রয়াগ এত বড় তীর্থ হইলেও লঘুভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন ঃ—

"গো কোটি দানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞা যুতঃ মেরু স্বর্ণ দানং গোবিন্দ কীর্ত্তন সমং ন শতাংশৈঃ॥"

অর্থাৎ প্রয়াগ তীর্থে কল্প (ব্রহ্মার ১ দিন অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসর) বাস করিলেও শ্রীগোবিন্দ নামের সমান নহে। আর আমার ঠাকুরের প্রধান উপদেশ এই যে শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণ নাম করিবে, নামকে পরমাশ্রয় করিবে, নাম পুকুরে ডুবে থাকিবে।

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাট বৈষ্ণবদিগের একটী মহাতীর্থ, দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। ঘাটের উপর যে স্থানে একটী বটবৃক্ষ অবস্থিত আছেন সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামীকে দশ দিন যাবৎ কৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভক্তি তত্ত্ব, রস তত্ত্ব এবং সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায় রামানন্দের মুখে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষা দিয়া তাঁহার ভিতর রীতিমত শক্তি সঞ্চার করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম বৃন্দাবন পাঠাইয়া দেন। এই প্রয়াগ হইতেই ৺কাশীধাম যাইয়া শ্রীল রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া তাঁহাকেও ঐ উদ্দেশ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবন পাঠান। তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই নিবেদন করা হইয়াছে।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ ব্রজে যাইয়া কিরূপে তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্ট বিগ্রহ পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই বলা হয় নাই। এই স্থানেই সংক্ষেপে কিছু কিছু নিবেদন করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

১। শ্রীল রূপ গোস্বামীর ঐকান্তিকতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া **শ্রীগোবিন্দ** তাঁহাকে আদেশ করিলেন "আমি যোগপীঠে মৃত্তিকার ভিতরে আছি ; একটী গাভী রোজ ঐখানে আসিবা মাত্র তাহার স্তন হইতে আমার মাথায় দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। তুমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই স্থান খনন করতঃ আমাকে উঠাইয়া সেই স্থানেই স্থাপন করিয়া আমাকে সেবা কর।" শ্রীরূপ আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং এই ভাবে **শ্রীগোবিন্দ** প্রকট হইলেন। সেই স্থান এখন গোমটীলা নামে বিখ্যাত এবং শ্রীরূপের আসন এখনও তথায় বর্ত্তমান আছেন।

২। মথুরার জনৈক চৌবের নারী, কুব্জা মহিষীর প্রকাশন **শ্রীমন্ মদনমোহন**কে নিষ্ঠার সহিত পূজা করিতেছেন, তাঁহার মাধুরী দেখিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া রোজ রোজ মাধুকরীর জন্য তথায় যাইতেন। কিন্তু চৌবের ঘরণী তাঁহাকে অনাচারে সেবা করেন দেখিয়া সনাতন গোস্বামী মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে আচারের সহিত সেবা করার জন্য বলায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমার দিন চলিয়া যাইতেছে—আচার বিচারের সহিত সেবা করার সময় আমি কোথায় পাইব ?" তিনি গোস্বামীজীর কথায় কোনরূপ দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিজ মত **প্রেমভাবেই** সেবা করিতে থাকিলেন। গোস্বামীজীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমন্ মদনমোহন তাঁহাকে একদিন দেখাইলেন যে তিনি চৌবের বালকের সহিত একত্র বসিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। গোস্বামীজীর তখন চক্ষু ফুটিয়া গেল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে **প্রেম-সেবায়** কোন আচার-বিচার অপেক্ষা করে না, তাই তিনি জোড়হস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ চৌবের ঘরণীর নিকট হইতে চাহিয়া ঐ শিশুর ভোজনপাত্রের অবশেষ গ্রহণ করতঃ নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

প্রকাশ থাকে যে শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের এই উপাখ্যান পাঠ করিয়াই আমাদের ঠাকুর যে কোন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যে ভক্তই যখন প্রেমের

সহিত তাঁহার মুখে অন্ন দিতেন তাহা তিনি তখনই সাদরে গ্রহণ করিতেন, এবং মহোৎসবের সময় সমস্ত ভক্তই বা কেন কাড়াকাড়ি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন তদ্বিষয়ে আমার যাহা কিছু সন্দেহ ছিল সমস্তই নিরসন হইয়া গেল। সে যাহা হউক ঐ রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীমদনমোহন তাঁহাকে চৌবের ভবন হইতে আনিয়া কেবল মাত্র জল তুলসী দ্বারা সেবা করিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে সনাতনের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার জন্য—শ্রীমদনমোহন আবার চৌবের মহিষীকেও স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তদনুসারে শ্রীসনাতন, শ্রীমান্ মদনমোহনকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া সূর্য্যঘাটের নিকট একটী টিলার উপরে তৃণ দ্বারা ঝোপ্ড়া বাঁধিয়া তথায় স্থাপন করতঃ প্রেমের সহিত সেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিরক্ত সন্ন্যাসী সনাতন ভিক্ষালব্ধ আটা দ্বারা অর্দ্ধ সিদ্ধ, অর্দ্ধ দগ্ধ চুট্‌কি (চাপাটী) প্রস্তুত করতঃ তাহা দ্বারা ঠাকুরের ভোগ দিতেন। একদিন সনাতন প্রভু স্বপ্নে আদেশ পাইয়া একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তৎসঙ্গে ঐ চাপাটী ভোগ দেন। তৎপর শ্রীমদনমোদন আবার স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে রুক্ষ আধপোড়া চাপাটী তিনি খাইতে পারেন না। তাহাতে গোস্বামীজি বলিলেন যে ক্রমেই তাহার বাহানা বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি বিষয়ীর স্থানে ঘৃত শর্করা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারিবেন না। ঠাকুরের সখ থাকে তো তিনি নিজেই যোগাড় করিয়া লউন। বিশুদ্ধ ভক্তের এত বড়ই বুকের কলিজা! ঠাকুর আর কি করেন? ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী যমুনা দিয়া এক মহাজন তাঁহার বহুমূল্য কারবারের জিনিষপত্র সহ নৌকায় যাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহার নৌকাখানি চড়ায় আটকাইয়া ফেলিলেন। মহাজন হাহাকার করিতে আরম্ভ করেন। ঐ রাত্রে যমুনার তীরে এক সন্ন্যাসী (শ্রীল সনাতন গোস্বামী) গদগদ ভাবে কৃষ্ণ নাম জপ করিতেছেন এবং নিকটে এক বিগ্রহ আছেন, তাঁহার তেজ সমস্ত বন ব্যাপিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মহাজন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ঐ বার বাণিজ্যে যাহা লাভ হইবে তাহা সমস্তই শ্রীচরণ পদ্মে

সমর্পণ করতঃ মন্দির নির্ম্মাণ ও সেবার শৃঙ্খলা করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করায় নৌকাখানি তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিল। ঠাকুরের কৃপায় সেইবার মহাজনের খুবই লাভ হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তিনি প্রকাণ্ড মন্দির এবং নাট্যশালাদি প্রস্তুত করতঃ সেবা ও ভোগ রাগের অতি চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অদ্যাপি শ্রীমদনমোহনের সেই বিশাল পুরাতন মন্দির ভগ্নাবস্থায় এবং তাহার নিকটেই সেই তৃণের ঝোপড়ার অনুরূপ একটী ঝোপড়া বিরাজ করিতেছেন।

৩। মহাপ্রেমিক শ্রীল মধু পণ্ডিত ঠাকুর ৺বৃন্দাবন যাইয়া বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। একদিন তিনি বিরহে কাতর হইয়া যমুনার তীরে বংশী বটের তলায় অনাহারে ক্ষিতি তলে পাড়িয়া রহিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপ **শ্রীগোপীনাথ** প্রতিমা রূপে তাঁহাকে দরশন দেন। পণ্ডিতজী চমকিয়া উঠিয়া দ্রুত যাইয়া সেই প্রতিমাকে পাথালি করিয়া উঠাইয়া লইলেন। এবং যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকট স্থাপন করতঃ শৃঙ্খলার সহিত সেবা করিতে আরম্ভ করেন। পরে কোন ভাগ্যবান পুরী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

৪। জগদ্বিখ্যাত বিরক্ত উদার ও শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীর বিশেষ কৃপাপাত্র শ্রীহরিদাস স্বামী ৺বৃন্দাবন ধামে নিধুবনে বাস করিতেন। স্বতঃ প্রকাশিত চিদানন্দ **শ্রীবঙ্কুবিহারী** নিধুবনে মৃত্তিকার ভিতরে ছিলেন। তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীহরিদাস স্বামী মাটী খুঁড়িয়া পরম সুন্দর মণিময় অপ্রাকৃত ভুবনমোহন রূপ শ্রীবঙ্কবিহারীকে উঠাইয়া অভিষেক করতঃ সিংহাসনে বসাইয়া সেবায় নিযুক্ত হন। এই স্থানে ঝাঁকি দর্শন হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদাই সম্মুখের পরদা টানিয়া আবার পর মুহূর্ত্তেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ব্রজবাসীদের নিকট শুনিলাম যে, অনেকক্ষণ এই 'রূপ' দেখিলে সে 'রূপ' চক্ষে লাগিয়াই থাকে এবং তিনি আর সংসারে প্রবেশ করিতে পারেন না। একদা স্বামীজি বালুকোপরি বসিয়া আছেন; একজন বিহারীজীর জন্য বহুমূল্য আতর লোক দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তখন বিহারী জিউ শয়নে ছিলেন

এবং দ্বার বন্ধ ছিল কাজেই তাঁহার অঙ্গে দিতে না পারিয়া স্বামীজী সেইখানে বসিয়াই সেই আতর ভূমিতে ডারিয়া দিলেন। প্রেরিত লোকটী এ হেন মূল্যবান জিনিষ এই রূপভাবে মাটীতে ফেলিয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিহারীজীর অঙ্গেই ঐ আতর পরাইয়া দিয়াছেন। তৎপর লোকটীর প্রত্যয়ের জন্য ঠাকুরের গাত্রোত্থানের পর তাহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া আতর পড়িতেছে এবং আতরের সদ্‌গন্ধে দশদিক আমোদিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তটীতে পরিষ্কার প্রমাণ করিতেছে যে যেখানে বসিয়াই হউক, নিষ্ঠার সহিত নিবেদন করিতে পারিলে ঠাকুর তাহা গ্রহণ করেন। অবিশ্বাস করার উপায় নাই,—শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখা। আর আমাদের ঠাকুর আমাদিগকে রোজ রোজ এই ভক্তমাল গ্রন্থ এবং সাধক কণ্ঠহার গ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (পঃ ৪।১৫৩ নং), আমাদের "হরনাথ-কুসুমকুঞ্জ" শ্রীবঙ্কবিহারীর বাড়ীর অতি সন্নিকট। প্রত্যেক দিন দুই বেলা বিহারীজীকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছি।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবা-বিগ্রহ ছিলেন—নারায়ণ শিলা। একদা এক ধনী ৺বৃন্দাবন দরশনে যাইয়া সমস্ত বিগ্রহকে সেবাযোগ্য নানা বস্ত্র অলঙ্কার দেন। ভট্ট গোস্বামীর মনে বড়ই খেদ হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শালগ্রামের যদি হস্ত পদাদি হইত, তাহা হইলে তিনি মনের সাধে এই বস্ত্রালঙ্কার তাঁহাকে পরাইতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে কি শোভাই না হইত? উদ্দীপনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপর তিনি ঐ বাসনা নিয়া রাত্রে শয়নে যান। ভক্তাধীন ভগবান তো? তিনি আর যান কোথায়? সেই নারায়ণ-শিলারূপী ভগবান রাত্রে ছোট একটি বাক্সের মধ্যে শয়ন করিতেন। রাত্রের মধ্যেই তিনি অবয়ব ধারণ করিলেন। ভট্ট গোস্বামী প্রাতঃকালে বাক্স খুলিয়া বাক্সের উচ্চতার সমান উচ্চ সেই মুরলী বদন ত্রিভঙ্গিম রূপ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বিগ্রহকে ধনী প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া কৃতকৃতার্থ

হইলেন। এবং নাম রাখিলেন "**শ্রীরাধারমণ**"। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিলে শরীর শীতল হইয়া যায়।

প্রয়াগ হইতে ২৭শে এপ্রিল পুনরায় ৺কাশীধাম পৌছাই এবং ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তথায় থাকি। আমাদের সঙ্গী শ্রীমান্ বিমলা এই স্থান হইতেই ২৩শে এপ্রিল দেশে রওনা হইয়া গিয়াছিল।

৺কাশীধামে থাকিবার সময় ঠাকুরের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাই। ইহাই আমাদের নিকট ঠাকুরের শেষ পত্র।

"পরম স্নেহময় বাবা!

বাবা অনেকদিন যাবৎ পত্র না পেয়ে ভাবিতেছিলাম, সেদমাপুর হতে redirect হয়ে তোমার পত্রখানি এল। বাবা গো এত সাধু দর্শন করিলে তাতে কি রকম পরিবর্ত্তন হল আর কত শান্তি পেলে জানিতে ইচ্ছা। বাবা গো, বাড়ী ব'সে প্রভুর নাম করাতে যা আনন্দ, সে আনন্দ কোথাও নাই। বাবা, স্নেহময়ী মার শরীর ভাল নাই শুনে বড়ই কাতর হলাম। **এ অবস্থায় আর বাহিরে থাকা উচিত নয়**; তবে যাবার আগে একবার স্নেহময় সারদা বাবার সঙ্গে মেদিনীপুরে দেখা করে গেলে উৎসব সম্বন্ধে অনেকটা বলে যেতে পার—যাতে সুবিধা হয় করিবে। মাকে কলিকাতায় রেখে একা একদিনের জন্য মেদিনীপুর আসিতে পার। আমার শরীর ভাল না থাকায় এবারকার উৎসব করিতে যেতে পারি নাই। উৎসব বেশ সুন্দর হয়েছে। নূতন আশ্রমটীও বড় সুন্দর হয়েছে বাবা। যদি প্রফুল্ল নিয়ে যায় তা হলে ২১শে বৈশাখ হাওড়ায় যেতে হবে, তখন কলিকাতায় এলে দেখা হবে। মা যেমন ভুলে না থাকেন। বাবা প্রভুর কৃপায় অমুর একটী, কৃষ্ণদাসের একটী পুত্র হয়েছে, সকলে ভাল আছে।

তোমার স্নেহের হর"

পত্রে আদেশ ছিল যে, আমার স্ত্রীর যখন শরীর ভাল নহে তখন আর আমার বাহিরে থাকা উচিত নয়। আমার স্ত্রীর অসুখের বিষয় এযাবৎ কিছুই

বলা হয় নাই। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হেতু কষ্ট পাইয়া আমাদের বরিশালের প্রতিবেশী শ্রীযুত ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ডাক্তারের হোমিও-প্যাথিক ঔষধে অনেকটা আরোগ্য লাভ করেন। তৎপর আমরা কলিকাতা হইতে ৺বৃন্দাবন যাওয়ার পথে ট্রেণের মধ্যেই আবার ভীষণ বেগে স্রাব হইতে আরম্ভ করে। ৺বৃন্দাবন পৌঁছিয়া ক্ষীরোদবাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া ঔষধ আনাইয়া তাঁহাকে সেবন করাইলে স্রাব কতকটা কমিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তীর্থ দর্শনে যান-বাহন ব্যবহার নিষেধ সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সর্ব্বত্র ডুলিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। ক্রমে শরীর রক্তশূন্য হইয়া হাতে পায়ে শোথ আসিয়া পড়িল। জীবনের কোন আশা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু কাল পূর্ণ হইয়া থাকিলে দেশে গেলেও কোন ফল হইবে না বরং তীর্থে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ তজ্জন্য দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু দয়াময় ঠাকুর তো আমায় বেশ চিনেন! শুধু "এ অবস্থায় আর বাহিরে থাকা উচিত নয়" লিখিলে যদি আমি না মানি, তাই আবার লিখিয়াছেন "তবে যাবার আগে একবার স্নেহময় সারদা বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলে উৎসব সম্বন্ধে অনেকটা বলে যেতে পারো" তখন বুঝিলাম যে ফিরিয়া যাইবার জন্য কড়া আদেশ, যাইতেই হইবে। এতদিন স্ত্রীও তাঁহার অসুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও তীর্থ ভ্রমণ করিবেন বলিয়া দৃঢ় সংকল্প ছিলেন কিন্তু ঠাকুরের ঐ পত্র পাইয়া তিনিও কি জানি কেন ঠাকুর দরশনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মেদিনীপুর যখন যাইতেই হইবে তখন ৺কাশীধাম হইতে একছাড় **মেদিনীপুরের** টিকেট করতঃ পথে Journey break করিয়া গয়ায় নামিয়া আমার ছোট ভাই সুশীলের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতঃ তথা হইতে রওয়ানা হইয়া ৩রা মে বেলা ১১৷৷৹টার সময় বাঁকুড়া ষ্টেশনে নামি। ঐ ষ্টেশনের মালবাবু শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় দু'প্রহরের প্রসাদ পাইব এবং বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার ট্রেণে সোণামুখী যাইব এই

উদ্দেশ্যে উহার বাসায় যাইয়া, শুনিয়া অবাক হইলাম যে দয়াময় ঠাকুর তথায় আহার করিরা আমরা যে ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিয়াছি সেই ট্রেণেই **মেদিনীপুর** যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছেন, এবং বাসার সকলেই ঠাকুরকে ট্রেণে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ঠাকুরের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়াছেন। বাঁকুড়া ষ্টেশনে ট্রেণখানি অনেকক্ষণ থাকে, তাই আমরাও তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইলাম।

"নন্দবাবা, যশোদা মা"

উপরোক্ত মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী হরনাথ জগতে "নন্দবাবা ও যশোদা মা" বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ডের ১৩৮, ২য় খণ্ডের ১৫০ ও তৃতীয় খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় সামান্যাকারে কিছু নিবেদন করিয়াছি। নন্দবাবা যখন ঝাটস্থগুড়া ষ্টেশনের সহকারী মালবাবু ছিলেন তখন তিনি ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন। যশোদা-মা ছোটকাল হইতেই গোপাল সেবা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে ঠাকুরের লীলা গুণাদির কথা শুনিয়া উভয়ের মনে এই ধারণা জন্মে যে তাঁহাদের সেই গোপালই শ্রীহরনাথরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য উভয়েই অস্থির হইয়া উঠেন। এবং তদ্বিষয় ঠাকুরকে জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে পত্র লিখেন যে তিনি নাগপুর যাইবার পথে অমুক তারিখে ঝাটস্থগুড়াতে নামিতে পারেন। যেদিন ঐ পত্র তাঁহাদের নিকট পৌছে সেই দিন রাত্রেই যশোদা-মা এমন একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন যে তাহাতে তাঁহাদের উপরোক্ত ধারণা (গোপালই হরনাথ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ) বদ্ধমূল হইয়া যায়। ঠাকুর নাগপুর যাওয়ার পথে ঝাটস্থগুড়া নামিয়া তাঁহাদের বাসায় শুভ পদার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। ঝাটস্থগুড়া পৌছান এবং তথা হইতে রওনা হইবার মধ্যে ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের উপরোক্ত ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনই কারণ রহিল

না। তদবধি তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরকে গোপাল ভাবে ভজন করিয়া আসিতেছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ হরনাথ-স্মৃতি দশম লহরীতে দ্রষ্টব্য। আমি বহুদিন তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখিয়াছি। তাঁহারা তখন নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ঠাকুরকে গোপাল ভাবে সেবা করিতেন। হরনাথ-ভক্ত সকলেই এই যুগলকে অতি উচ্চ আসন প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ জন্মযাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥
দধি দুগ্ধ ভার প্রভু নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি 'হরি' 'হরি'॥

* * *

কানাঞি খুটিয়া আছেন 'নন্দ'-বেশ ধরি।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী'॥

* * *

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥
ইহা—সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)

সেইরূপ আমাদের ঠাকুরও বহুদিন হইল ৺পুরীধামে একবার কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতেও এই মনীন্দ্র বাবু গোয়ালার ভার স্কন্ধে করিয়া 'নন্দ-বাবা'ই সাজিয়াছিলেন। তাহার ফটো এখনও কোন কোন প্রাচীন ভক্তের বাড়ী বিরাজ করিতেছেন। এই আদর্শ যুগলটী যে 'নন্দ-বাবা ও যশোদা-মা' নাম ধারণ করিয়াছেন তাহা সার্থক! আমি এই যুগল চরণে বারংবার প্রণাম করিতেছি। শুধু যে তাঁদের চরণেই প্রণাম করিতেছি তাহা নহে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপাত্র যিনি যেস্থানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন

(দেখা যাইতেছে যে ঠাকুরের অপ্রকট লীলার পর এই দশ বৎসর যাবৎ প্রত্যেক বৎসরই বহু বহু নূতন লোক তাঁহার কৃপাপাত্র হইতেছেন) তাঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব এবং আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণেই প্রণত হইতেছি।

"হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস॥ (নঃ ঠাঃ)

আরও বহু বহু ভক্ত (বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও তাঁহার পরমা ভক্তিমতী স্ত্রী, যিনি হরনাথ জগতে 'ডাক্তার-মা' বলিয়া পরিচিতা এবং যে আদর্শ যুগল ঠাকুর ঠাকুরাণীর সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষাল, সত্যধন ঘোষাল, কালী সিংহ, উপরোক্ত জিতেন চৌধুরীর সৃজিত উলুবেড়িয়া ও দেউলটীর বহু বহু ভক্ত) দের সম্বন্ধে কিছু কিছু করিয়া লিখার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার আয়ুতে কুলাইল না। বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ এত উচ্চস্তরের ভক্ত যে, তাঁহার সম্বন্ধে আমার কলম ধরিতেই সাহস হয় না। তাঁহার বাড়ীতে 'গোপাল' এবং তাঁহার পার্শ্বে আমাদের দয়াল ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি ঠাকুরকে গোপাল ভাবে ভজন করিয়া তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মুরুব্বি এবং অতি উদার। কোনরূপ নিন্দা কুৎসাতে তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না।

সে যাহা হউক আমি নন্দ-বাবার বাসা হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ষ্টেশনে (বাঁকুড়া) পৌছিয়া ঠাকুর ট্রেণের মধ্যে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছেন তথায় যাইয়া টিপ করিয়া ঠাকুরকে একটী প্রণাম করিলাম। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই, ঠাকুর হঠাৎ আমাকে বলিয়া উঠিলেন "কি বাবা! মেদিনীপুর যাইতেছ ত ?" এবং নন্দবাবাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রসাদ পাওয়ার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বলা মাত্রই নন্দবাবা বলিলেন যে, ট্রেণের মধ্যেই প্রসাদ আনিয়া দেওয়ার জন্য তিনি তাঁহার বাসায় লোক পাঠাইয়াছেন। সেখানে

অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ • নিজেরাই আমাদের মালপত্র নিকটবর্ত্তী একখানা ইণ্টার ক্লাসের কামরায় উঠাইয়া দিলেন। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা! কেমন তীর্থ হইল?" শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বাসকেও ঠিক এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (হরনাথ স্মৃতি—২য় লহরী ১১ পৃষ্ঠা)। ঠাকুরের কথায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহার মনের ভাব—

"বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা,
কারা গৃহে কিমথবা কনকাসনে বা
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি,
শ্রীকৃষ্ণসেবনমৃতে ন সুখং কদাপি। (সাঃ কঃ)

* * *

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" (নারদ পঞ্চরাত্র)

ঠাকুরের কথায় আরও বুঝিয়াছিলাম যে আমরা যে ঠাকুর দর্শন করতঃ মেদিনীপুর যাওয়ার জন্য টিকিট করিয়াছিলাম তাহা অন্তর্য্যামী প্রভু আমার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে বাঁকুড়ায় মিলিত হইয়া একত্র মেদিনীপুর যাওয়ার জন্যই তিনি বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া আসিয়াছেন। আরও বুঝিয়াছিলাম যে আমরা যে তাঁহার মনোভাব না বুঝিয়া এবং তাঁহার শ্রীচরণে চাতকজলদগতিবৎ অচলা, অটলা, অব্যাভিচারিণী ভক্তি স্থাপন করিতে না পারিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম তাহা আমাদের খুবই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাই আমি হরিদ্বার থাকা কালে ঠাকুরের নিকট হইতে যে পত্র পাই তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই আমাকে লিখিয়াছিলেন "বাবা গো লোকের কথা শুনে প্রাণের বিশ্বাস কেন হারাতে বসেছ? যেমন চলিতেছ

চল,—আর না হয় কোথাও দেখে শুনে দীক্ষা গ্রহণ কর।" আমি সেই সময় গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ ও শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট যাওয়া আসা করিতাম বটে, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য সেরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল বলিয়া আমার স্মরণ নাই, তবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেরূপ কিছু ভাব লুক্কায়িত না থাকিলে ঠাকুর কখনো এরূপভাবে আমাকে লিখিতেন না। ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ এবং অনুতাপ হইয়াছিল। ঠাকুরের সঙ্গে আমার ঐ সময়ের মিলনের অবস্থা এবং কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল তাহার অনেকটাই শ্রীমন্মাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর মিলনের সময়ের মত—

"তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা।
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল ॥"

* * *

"**স্বরূপ** কহে প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ ॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা পাশ গলায় বান্ধি' চরণে আনিলা ॥" (চৈঃ চঃ)

* * *

"শুন শুন অহে অহে প্রভু গৌর ভগবান্।
এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন-নয়ান ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ—কিছুই না জানি ॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্য্যটন।
দুঃখিত হঞাছি আমি—দেহ প্রেমধন ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল উত্তর।
মোর এক বোল তুমি শুন **শুক্লাম্বর** ॥
সে বনে কতক আছে শৃগাল-কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাথে—কহিল ঠাকুর ॥
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে ॥
কৃষ্ণ প্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহো কিছু নহে।
পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে ॥" (চৈঃ মঃ)

আমার স্ত্রীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া তিনি আমার অনেক পাছে পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু সেদিকে আমার কোনই লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চলিয়াছি কি না ? তাই দৌড়াইয়া গিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী কিছু কাল পরে ট্রেণের নিকট আসিলেও ঠাকুরের গাড়ীর সম্মুখে অনেক লোকের ভিড় থাকায় তাঁহাকে কিছুকাল পিছনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তৎপর তিনি ঠাকুরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর আমাকে বলিয়া উঠিলেন "একি বাবা, তুমি তো আমার মাকে খুন করিয়া আনিয়াছ ! তুমি স্ত্রীহত্যা পাপে অপরাধী ! শীগ্‌গির আমার মাকে নিয়া কলিকাতায় খুব ভাল একজন ডাক্তারকে দেখাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ কর।" বাস্তবিকই আমার স্ত্রীর তখনকার অবস্থা দেখিলে তিনি যে আর বাঁচিয়া উঠিবেন এই আশা কেহই করিতে পারেন নাই। স্ত্রী যাইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের চরণে পতিত হইলেন। কিছুতেই আর মাথা উচু করিতেছেন না. দেখিয়া ঠাকুর "উঠ মা" "উঠ মা" বলিয়া নিজেই তাঁহার অভয় হস্ত দ্বারা উঠাইলেন। স্ত্রী ট্রেণের বাহিরে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন কৃপা প্রার্থিনী হইয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং ঠাকুরও যেন অতি গম্ভীর ও অভয়দাতার ভাবে আমার স্ত্রীর কেশাগ্র হইতে চরণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে থকিলেন। ঐ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই নীরব নিস্তব্ধ ! আমাদের সৌভাগ্যে সেইদিন বাঁকুড়া ষ্টেশনে

ট্রেণখানিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্তের বিষয় আমি পূর্ব্বেও নিবেদন করিয়াছি। তৎপরে ট্রেণ ছাড়ার বাঁশী বাজিয়া উঠিলে আমরা দুইজন আমাদের সেই ইণ্টার ক্লাশের কামরায় উঠিয়া দেখি যে নন্দ-বাবা আমাদের দুই জনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বিচিত্র প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছেন। দুই জনেই সেই মহা প্রসাদ সম্মান করিলাম। কিন্তু স্ত্রীকে দেখিলাম অত্যন্ত গম্ভীর। দুই কি তিন ষ্টেশন পরে আমি ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য কিছু ফল লইয়া ঠাকুরের কামরায় যাইয়া দেখি যে ঠাকুর অত্যন্ত কাতর এবং বুকের উপর হাত রাখিয়া গ্লাস হইতে জল পান করিতেছেন। ভক্ত সেবকদের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম যে গাড়ী ছাড়ার পরই ঠাকুরের বুকে ভয়ঙ্কর এক বেদনা উঠিয়াছে এবং অত্যন্ত পিপাসা হেতু ক্রমান্বয়ে দুই গ্লাস জল দেওয়া সত্ত্বেও পিপাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় তাঁহারা অবশেষে ঐ জলের মধ্যে বরফ দিয়াছেন। যথা সময়ে ট্রেণ মেদিনীপুর পৌঁছিলে ভক্তপ্রবর ৺সারদা প্রসন্ন সেন, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি ষ্টেশনে আসিয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করতঃ সারদা দাদার বাসায় নিয়া যান। সেখানে আমরা সকলে মিলিত হইয়া আগামী জন্মোৎসব মেদিনীপুরে কি ভাবে করিতে হইবে তদ্বিষয় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলাম। ভোগের সময় দেখা গেল যে ঠাকুরের শরীর এত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে তিনি নাম মাত্র গ্রহণ করিলেন। কাজেই প্রসাদ সম্মানের সময় ভক্তগণ বরাবর যেরূপ আমোদ প্রমোদ করেন সেরূপ আর কিছুই হইল না। আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তৎপর দিন ভক্তপ্রবর প্রফুল্ল গাঙ্গুলীর নূতন বাড়ী "হরবাস"-এ প্রবেশ করার দিন ধার্য্য ছিল। কাজেই ঠাকুর ঐ রাত্রের তিনটার ট্রেণেই হাওড়া রওনা হইয়া যান। আমরা ইণ্টার ক্লাসে যাইব, ঠাকুর যাইবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে। আমরা টিকেট খরিদ করিতে রওয়ানা হওয়ার সময় ঠাকুর জেদ ধরিলেন যে তিনিও আমাদের সঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাইবেন। কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে না পারিয়া

তাঁহার জন্যও বাধ্য হইয়াই ইণ্টার ক্লাসের টিকেট করিয়া আমরা সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে একখানা ইণ্টার ক্লাসের কামরায় উঠিলাম, তথায় আর কোন যাত্রীই ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি পায়খানার কোঠাটী খুব ভাল করিয়া ধুইয়া দিলাম, যেন কোনরূপ খারাপ গন্ধ না আসিতে পারে। ঠাকুরের সঙ্গে এক স্থানে শয়ন আমাদের সেই-ই প্রথম এবং সেই-ই শেষ। আমাদিগকে কৃতার্থ করার জন্যই ঠাকুর এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র ইণ্টার ক্লাসে পরিভ্রমণ করিলেন। অনেক পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে ঠাকুর রাত্রে কি করেন, কোথায় যান, কেহ দেখিতে না পারে, তজ্জন্য ঠাকুরের কাছে অন্য কোন লোক শয়ন করিতে পারে না।

রাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে এক কামরায় থাকিয়া যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ঠাকুর এক বেঞ্চে শয়ন করিয়া আমাদের সঙ্গে নানারূপ আলাপাদি করিয়া পরে সামান্য একটু ঘুমাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের আর ঘুমাইতে ইচ্ছাই করিল না। বহুদিন হয় জামালপুর থাকা কালে স্থানীয় থিয়েটার পার্টি 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করা কালে যে একটী চমৎকার গান শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই ভাবটী জাগিয়া উঠিয়াছিল—

"আজি, এসেছি—এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান ॥

আজি, তোমার চরণতলে রাখিয়ে কুসুম হার,
এ হার তোমার গলে দিব বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি
কর বঁধু কর তায় পান ॥

আজি, হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা
তোমাতেই হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উজল জলদল কলরব।
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
এমন চাঁদের আলো মরি যদি সে ও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান॥
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবন তলে ডুবিয়া মরিতে চাই;
তোমার চরণ তলে শয়ন লভিব বলে
আসিয়াছি তোমার নিদান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা
তোমাতেই হউক অবসান॥"

পরদিন ৪ঠা মে প্রাতে আমরা হাওড়া পৌছিয়া ঠাকুরের সঙ্গে প্রফুল্ল বাবুর নূতন বাড়ী "হরবাস"এ পৌছিলাম। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইল। যদিও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা হেতু দু'প্রহরের আহারের সময় ঠাকুর অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তত্রাপি ঐ দিন রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণ-প্রেম সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটী বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমরা পরদিন প্রাতে তথা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঠাকুর আজ নিজ হইতেই আমাকে বলিলেন, "আমার মাকে বরিশাল নিয়া গিয়া perfect rest (সম্পূর্ণ বিশ্রাম) দাও।" আজ আর গতকল্যকার মত চিকিৎসা করার বিষয়ে কিছুই বলিলেন না। তখনই বুঝিতে পারিলাম যে স্ত্রীর জীবনের আর কোন ভয় নাই। কিন্তু ঠাকুর যে আমার স্ত্রীর ব্যারামটী আকর্ষণ করিয়া

নিয়া নিজে কষ্ট পাইতেছেন তজ্জন্য বড়ই দুঃখ এবং অনুতাপ হইল। কঠিন কঠিন ব্যারামের সময় তিনি এইরূপই করিয়া থাকেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন ;—

"বাবা, পরের জন্য প্রভু আমার এ শরীর দিয়াছেন, সেই কারণে সময়ে সময়ে নানারকম ভোগ করিতে হয়। সম্প্রতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ মজুমদার নামক প্রভুর কোন প্রিয়পাত্র রক্ত বমন ইত্যাদি রোগে নিতান্ত কাতর হওয়ায় প্রভুর এ খেলা হইল। পত্র পাইয়াছি—বেশ ভাল আছেন, আমিও ভাল হইয়াছি, কোন চিন্তা করিবেন না।"

আমরা কলিকাতা যাইয়া আমার তৃতীয় জামাতা শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ী উঠিলাম। ঠাকুরও ঐ দিনই কলিকাতা মাণিকতলা ৺শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন, আমি রাত্রে তথায় যাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিলাম। কলিকাতার অনেক ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন। ঠাকুর কলিকাতা আসিলে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি অন্ততঃ ১২টা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই লোক জনের ভিড় থাকে। সহরের বহু বহু উচ্চপদস্থ ভদ্রমহোদয়গণ ঠাকুরের নিকট হরি-কথা শুনিতে যাইতেন এবং আনন্দ পাইয়া দুই বেলাই সমান ভাবে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের আগমনের সংবাদ পৌঁছার এক ঘণ্টার মধ্যে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। পরদিন ৬ই মে অতি প্রত্যূষে আবার ঠাকুরের নিকট গেলাম। ক্রমান্বয়ে ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইতে থাকিলেন, কেহ ফুল, কেহ ফুলের মালা, কেহ খবরের কাগজ, কেহ রসগোল্লা, কেহ সন্দেশ, যাহার যাহা ইচ্ছা আনিয়া ঠাকুরের চরণে রাখিয়া প্রণাম করতঃ ঠাকুরের সম্মুখে কর-জোড়ে দাঁড়াইতেছেন। আর ভক্ত-বৎসল ঠাকুর মালা হইলে তৎক্ষণাৎ গলে পরিয়া, আর খাবারের কিছু হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কিছু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ খাবারের পাত্র নিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করা মাত্রই "আন—কি এনেছ" বলিয়া ঠাকুর তাহার হাতের উপর হইতেই তুলিয়া

নিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আবার ইহার ৬ দিন পরে (১২ই মে) জনৈক ভক্ত ঠাকুরের জন্য দুই হাঁড়ি মিষ্টি নিয়া ৺শরৎ দাদার বাড়ী আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে জানিয়া ভক্ত ভ্রাতা উহা বৈঠকখানার বিছানার এক কোণে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐদিকে ঠাকুরের দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি নিজেই উহা টানিয়া আনিয়া প্রত্যেক হাঁড়ি হইতে এক একটী মিষ্টি স্বয়ং গ্রহণ করতঃ বাকী সমস্ত ভক্তদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

"ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি হইলে অভক্তের উলটি না চায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগমে আসর জমকিয়া উঠিল। আর আমার দয়াময় ঠাকুরও তৎক্ষণাৎ হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শরীর খারাপ, সেদিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই, অনর্গল হরিকথা চলিতে থাকিল। এমন দিন যায় না যেদিন নামের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু না বলেন। সেদিন নামের উপর খুবই জোর দিয়া বক্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে নাম করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দয়াল ঠাকুরের কৃপা আমার মত অভাজনের প্রতিও আজ পর্য্যন্ত নানারূপে বর্ষিত হইতেছে। এত এত লোক সাধে কি তাঁহার জন্য পাগল হইতেছেন? অল্প কয়েক মাস হইল রায় শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর পেন্সনপ্রাপ্ত চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে আমাদের মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ষ্টেটের কোন কার্য্যোপলক্ষে আগরতলা আনাইয়াছিলেন। আলাপ করিয়া দেখি যে অতি উচ্চস্তরের বৈষ্ণব। এত বড় সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও এত বড় নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে! তিনিও একদিন নামের উপর খুব জোর দিয়া বলিয়াছিলেন। এত মিষ্টি লাগিয়াছিল যে, তাহার ২।১টী কথা সহৃদয়

পাঠকবর্গের সঙ্গে আস্বাদন করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছিলেন "ধরুন—আমি এক হাটবার হাটের সময়ে আমার নিজের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। শত শত লোক ঐ রাস্তায় নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছে, আমার কর্ণ আদৌ সে সব কথার দিকে যাইবে না। কিন্তু যদি ঐ সব কথার মধ্যে কেহ হঠাৎ আমার নামটী উচ্চারণ করে, তৎক্ষণাৎ আমার কর্ণ সেই দিকে ছুটিয়া যাইবে; উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে থাকিবে আমাকে ভাল বলে কি মন্দ বলে। যদি ভাল বলে, প্রশংসা করে—তবে আমার ইচ্ছা হইবে যে আরও বলুক।" আবার ধরুন,—আমার বাড়ীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড মাঠ, আমার ছেলে এবং অন্যান্য ছেলে মনোযোগসহকারে ফুটবল খেলিতেছে। নিকটে যত কথাই বলুক না কেন,—যত ডাকাডাকিই করুক না কেন—কর্ণ সে দিকে যায় না। কিন্তু আমার বাড়ী হইতে কেউ আমার ছেলেকে ডাক দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ডাক আমার ছেলের কর্ণে পৌঁছিবে। কারণ তাহার নিজের বাড়ী হইতে ডাকিতেছে সুতরাং যাইতেই হইবে। তবে ছেলে যদি বুঝিতে পারে যে বাড়ীর চাকর তাহাকে ডাকিতেছে তখন হয়ত ছেলে ভাবিবে যে বলটী তাহার দিকে আসিতেছে সে একটা কিক্ দিয়া তৎপর চলিয়া যাইবে। কিন্তু ছেলের মা যদি একটা আছাড় খাইয়া আর্ত্তির সহিত ছেলেকে ডাকে, তখন কি আর ছেলে কিক্ দেওয়ার জন্য অণুমাত্র অপেক্ষা করিতে পারে? সে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসে। সেইরূপ শ্রীভগবান যদি বুঝিতে পারেন যে আমার নিজ জন, নিজ ধাম হইতে আমাকে আর্ত্তির সহিত ডাকিতেছেন তখন কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন?

"এ মন! বুঝিয়া বুঝিতে নার।
দিনে দিনে তোর, ভাঁটী কি উজান, শরীরে কেন না হের॥
আগে যেন দেহে, পাথর ঠেলেছ, এবে দাণ্ডাইতে হেল।
শ্রবণ, নয়ন, তারাও এমনি, দশন কোথা বা গেল॥

রুধির শুকায়ে, বল লুকায়েছে, বাতাসে হেলিছে চাম।
যত সন্ধি কল, ক্ষণেকে নড়িছে, সরস হৈয়াছে দাম॥
তবু ঘুচিল না, 'এ আমি আমার', ফিরি না চাহিলি পাছে।
এখন তখন, কখন কি হয়, শমন দেখ না কাছে॥
তুমি কত শত পোড়ায়ে এসেছ, বিবেক নহে কি তায়।
তোরে না ছাড়িবে, অমনি পোড়াবে, দেখি না বুঝিলি হায়॥
বদন ভরিয়া, **'হরি' না বলিলি,** সদাই অসতে ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, আবার কপালে, কি জানি কি আছে তোর॥" (বৃঃ ভঃ)

সে যাহা হউক, অনেকক্ষণ হরি-কথা চলিল। ঠাকুরের শরীর খারাপ, তাই ভক্তদের ঐকান্তিক অনুরোধে ঠাকুরকে অবশেষে বাধ্য হইয়াই থামিতে হইল। তৎপর জলযোগ, পানচর্ব্বণ, নানাবিধ গল্প এবং অপর দিকে নিত্যনিরঞ্জন দাদার সুমধুর কীর্ত্তন।

"আনন্দ-সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ॥" (চৈ ভাঃ)

ঠাকুরের তখন দাঁত ছিল না। কোন সময়ে পান ছেঁচিয়া, আর কোন সময়ে না ছেঁচিয়াই দেওয়া হইত। সেদিন জনৈক ভক্ত একটী খিলি পান ঠাকুরকে দেওয়ায় তিনি কতক্ষণ মুখের মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া হঠাৎ ঐ প্রসাদী পানটী আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে পানটী খাইয়া আমার যে আনন্দ অনুভব হইয়াছিল তাহা যাহাদের এইরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমার এইরূপ সৌভাগ্য এই প্রথম এবং এই শেষ।

"কহে প্রভু নিজ-তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে॥
প্রভু বলে মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈলা দান॥

সম্ভ্রমে মুরারি যোড় হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বলে মুরারি সকালে ধোও হাত।
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥
প্রভু বলে আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥" (চৈঃ ভাঃ)

বেলা অধিক হইলে আমি ঠাকুরের নিকট বরিশাল যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর না দিয়া অন্যান্য কথার পর কতক্ষণ বাদে অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিলে গায়ে হাত বুলাইয়া যে একটী হাসি দিয়াছিলেন তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। কারণ ইহাই আমার শেষ দর্শন! কে জানিত যে ঠাকুর আমাদের মাথায় লাঠি মারিয়া এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবেন? সবই তাঁ'র ইচ্ছা। তিনি যাহা করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কুমারখালীর পরমভক্ত মৃত ননীগোপাল কুণ্ডু প্রদত্ত একখণ্ড জমিতে আশ্রম মন্দিরের ভিত্তি নিজ হস্তে স্থাপন জন্য ঠাকুর ঐ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপনগর মুরারিপুকুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে রীতিমত মহোৎসব ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপ্রকট লীলার পর তাঁহার একখণ্ড অস্থি ও শ্মশানের কিছু ভস্ম তথায় রক্ষিত হইয়াছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরগঞ্জের উৎসব হইতে কলিকাতা পৌছিয়া ঠাকুর ২৬শে ফেব্রুয়ারী খুলনার ষ্টেশন-মাষ্টার ভক্ত-প্রবর হরিপদ সরকারের বাসায় শুভ পদার্পণ করতঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া ১লা মার্চ্চ সোণামুখী চলিয়া যান। বঙ্গের ভক্ত জগমোহন দাস প্রভৃতি এযাবৎ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তৎপর ১৩ই এপ্রিল ঝাড়গ্রামে এবং ১৫ই এপ্রিল রাধানগরে শুভ পদার্পণ করেন।

সে যাহা হউক; আমরা ৬ই মে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া ৭ই মে বরিশাল পৌঁছিয়া তিন দিন পরেই দেখি যে, আমার স্ত্রী-যাহার বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না—তিনি, ঠাকুরের কৃপায় এই দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি ৯ই মে ঠাকুরকে পত্র দ্বারা ঐ সংবাদ জানাইলাম।

প্রভু যীশুখৃষ্টও ঠিক এইরূপ একটী রোগীকে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবেই আরোগ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটী বার বৎসর যাবৎ রক্তস্রাবের জন্য খুবই কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রভু যীশুখৃষ্টের ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইল যে সে যদি অন্ততঃ প্রভুর পোষাক পরিচ্ছদের সামান্য অংশও স্পর্শ করিতে পারে তবু সে রোগমুক্ত হইবে; এই বিশ্বাস লইয়া প্রভুর শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি স্ত্রীলোকটীকে আরোগ্য করিয়া দিলেন।

বাইবেল ভাল করিয়া পড়ার সুযোগ আমার হয় নাই। কিন্তু অল্প যাহা কিছু পড়া আছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রভু যীশুখৃষ্ট এবং আমাদের ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বের ঘটনা, উভয়ের উপদেশ ও শিক্ষা প্রণালী, ভক্তগণের সহিত ব্যবহার এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে বহু বহু দুরারোগ্য রোগীকে আরোগ্য করার প্রণালী এবং ভবিষ্যৎ বাণী, উভয়েরই ঠিক একই রকম। বাইবেল ও ঠাকুরের চারি খণ্ড পত্রাবলী পরিশিষ্ট সহ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িয়া গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। স্থান ও সময়াভাবে আমি এখানে তাহার অল্প কয়েকটী দৃষ্টান্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

(১) প্রভু যীশুখৃষ্ট যখন তাঁহার মাতা মেরীর গর্ভে, তখন "The angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, (father of Jesus Christ) thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife : for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus : for he shall save his people from their sins."—(Mathew I. V.—20-21.)

অর্থাৎ দেবদূত, (যিশু খৃষ্টের পিতা) জোসেফ কে স্বপ্নে দেখান যে তোমার স্ত্রীর গর্ভে পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি যে সন্তান প্রসব করিবেন তিনি তাঁহার নিজের সকলকে পাপের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

আমাদের ঠাকুরও যখন তাঁহার মাতা শ্রীমতী শ্রীভবতী দেবীর গর্ভে, তখন ঠাকুরের পিতা শ্রীজয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় একটী আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখিয়া তৎপর দিন বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণীর নিকট বলেন, "আমি রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন একটী শিবমূর্ত্তি সাধু আমাকে বলিতেছেন 'তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার স্ত্রীর নিকট বড়ই যত্নে আছি ও থাকিব।' স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পরেই আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এখানে চলিয়া আসিলাম।"

(মহাত্মা অটলবিহারী নন্দীর লিখিত পাগল হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

(২) প্রভু যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস দূর দূরান্তরের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তারকা দৃষ্টে জানিতে পারিয়া সেরূপ কোন সন্তান জন্মিয়াছেন কিনা দেখিবার জন্য জেরুজেলামে আসিয়াছিলেন।

আমাদের ঠাকুরের জন্মের বহু পূর্ব্বে ঠাকুরের পিতার ১৪ বৎসর বয়সের সময় এক সন্ন্যাসী এবং একজন দৈবজ্ঞ তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, একজন 'সিদ্ধ মহাপুরুষ' তিনি পুত্ররূপে লাভ করিবেন। (হরনাথ ম্যাগাজিন, অমিয় হরনাথ ৭পৃঃ)

(৩) প্রভু যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন ঃ—

(A) "পিতঃ আমি তোমার নাম মানুষের নিকট প্রচার করিতেছি।" (St John XVII-V. 6)

(B) "স্বর্গীয় পিতঃ তুমি তাহাদিগকে তোমার নাম দ্বারা রক্ষা কর।"

(St. John XVII—VII.

(C) "স্বর্গীয় পিতঃ তোমার নাম ধন্য হউক।"

(St. Luke XI-V-2.

আমাদের ঠাকুরের প্রচারের মধ্যে প্রধান উপদেশ হইয়াছে "নাম করা গুণ গাওয়া ছাড়া আর কি আছে? নাম ভিন্ন গতি নাই—নাই—নাই!" পত্রাবলী চারি খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক পত্রেই এবং যখনই লোকের নিকট কোন উপদেশ দিয়াছেন তার মধ্যেও আগাগোড়া নামের মহিমা এবং নামের আবশ্যকতাই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অভিজ্ঞতা চারি খণ্ডের বহু স্থানেই আমি উহা উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) সকলেই জানেন যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ, বিশেষতঃ ধর্ম্মযাজকগণ মালা জপ সহ নাম করিয়া থাকেন।

আমাদের ঠাকুরও বলিয়াছেন যে "মালা একতিলের জন্যও ছাড়িও না, ঘুমাইবার সময় বিছানার ধারে রাখিবে, বিছানাতে শুয়ে শুয়ে নাম করিবে। কোন রকম মনে বিকার জন্মাইও না। প্রভুর নামে সকল পবিত্র হবে।" (পত্রাবলী : ৪।৬৬)

এই প্রসঙ্গে একটী উপন্যাস মনে পড়িয়া গেল, পাঠকগণের সঙ্গে আস্বাদন করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একজন ব্রাহ্মণ নানারূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া অরণ্যে যাইয়া আরাধনা দ্বারা শ্রীআশুতোষকে সন্তুষ্ট করায় তিনি উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ যখন জানিতে পারিলেন যে আশুতোষ একটীর বেশী বর দিবেন না, তখন তিনি বলিলেন যে তাঁহার যেরূপ অভাব তাহাতে একটী বরে তাঁহার কিছুই হইবে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর শ্রীআশুতোষ তাঁহার একটী ভূত ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন 'এই ভূত তোমার বাড়ী যাইয়া থাকিবে, তোমার যখন যাহা অভাব ইহার নিকট চাহিলেই সে পূরণ করিয়া দিবে।' এই বলিয়া আশুতোষ চলিয়া গেলে ভূত কৈলাস ছাড়িয়া মর্ত্তে যাইতে হইবে ভাবিয়া ব্রাহ্মণের সহিত অনেক রাগারাগির পর তাহাকে সর্ব্বদা কাজ দিয়া রাখিতে হইবে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে কাজ দিতে না পারিলে সেই মুহূর্ত্তেই সে ব্রাহ্মণের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এই সর্ত্তে তাঁহার সহিত চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাঁহার যা কিছু

অভাব তাহা ভূতকে দিয়া পূরণ করিয়া নিলেন। যে কাজে মানুষের দুই বৎসর লাগিতে পারে, ভূত মহাশয় তাহা দুই দিনেই শেষ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আবশ্যক কাজ অল্প দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। তখন অনাবশ্যক কাজ, তাহাও যখন শেষ হইল, কল্পনায় যাহা আসে তাহাই করাইতে লাগিলেন, কিন্তু আর কল্পনায়ও কুলায় না; একটু চিন্তা করিতে গেলেই ভূত ঘাড় ধরিতে চায়। তখন ভূতকে আর একটী কাজের আদেশ দিয়া সেই ফাঁকে ব্রাহ্মণ পলাইয়া যাইয়া আশুতোষকে ভূত ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য ধরিলেন। আশুতোষ বলিলেন তিনি ভূত ফিরাইয়া নিতে পারেন না। ব্রাহ্মণও কিছুতেই ছাড়েন না, নানা ভাবে ধরিয়া পড়ায় আশুতোষ বলিলেন "ভূত দ্বারা ১০৮টী গাঁইট আছে এমন একটী বাঁশ আনাইয়া তোমার আঙ্গিনায় পোতাইবে এবং তাহাকে প্রত্যেক গাঁইটে গাঁইটে পা দিয়া একবার উঠিতে ও একবার নামিতে এবং তুমি অন্য আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত থামিতে পারিবে না এই আদেশ করিবে।" ব্রাহ্মণ তদনুসারে আসিয়া ভূতকে ঐ আদেশ প্রদান করায় ভূত ১০৮ গাঁইটের প্রত্যেক গাঁইট ধরিয়া উঠা নামা করিতে করিতে হায়রান হইয়া পড়ায় ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত এই সর্ত্তে আপোষ করিলেন যে ব্রাহ্মণ যখন যাহা বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন, অন্য সময় বসিয়া থাকিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে **মন ভূতকে** জব্দ করার উপায় হইল ১০৮টী দানাযুক্ত মালা নিয়া অনবরত অনুলোম ও বিলোম জপ করিতে থাকা।

(৪) প্রভু যিশুখৃষ্ট যেমন সঙ্গোপনে নামটী করার উপদেশ দিয়াছেন—(Mathew VI-5 & 6)

ঠাকুরও বলিয়াছেন "নিজের গুপ্ত নামটী মনে মনে করিবে, অন্যে যেন শুনিতে না পায়।"

(পত্রাবলী ৩।৪৯)

(৫). প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন প্রেমে আত্মহারা হইতে পারিলেই

ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। আরও বলিয়াছেন যে তিনি ভক্তমণ্ডলীকে ভালবাসিয়াছেন এবং চিরকালই ভালবাসিবেন।

(St John XV-V. 9-14)

আমাদের ঠাকুরও বলিয়াছেন "হরিকে ভালবাস্থন আর হরির যাহা যাহা তাহাও ভালবাস্থন। হরিকে ভালবাসিয়া হরির জিনিষগুলি ভাল না বাসিলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই কোন বিলাতী প্রেমময়ী আপনার প্রেমিককে লিখিয়াছেন "If you love me, love my dog" (যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকেও ভালবাস)। তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎকে ভালবাসা চাই, কেননা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জন। এই পৃথিবীকে আর পৃথিবীর জিনিষকে কৃষ্ণের ধন বলিয়া ভালবাস্থন, তা'দের জন্য তা'দিগকে ভালবাসিবেন না।" (পঃ ২।২৫ পৃঃ)

আরও বলিয়াছেন, "তোমরাই আমার জীবন সর্ব্বস্ব।" "'তোমাদের আছি ও থাকিব।" "প্রেমে মগ্ন থাক।" ইত্যাদি। (পত্রাবলী—১।৬, ১।৮, ১।২০, ১।২২, ১।২৬, ১।৩৩, ২।৬, ২।১৮, ২।২০, ২।৩১, ৩।২২, ৩।৪২, ৩।৫১, ৪।২, ৪।৪১, ৪।৮৪, ৪।১৩১, ৪।১৫৮, ৪।১৫৯, ৪।১৬৭ পৃঃ)

(৬) পাপের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করিলেই ভগবানকে পাওয়া যায় বলিয়া প্রভু যিশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন।

(Mathew IV-V. 17 & V-44.)

ঠাকুরও বলিয়াছেন, কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপের সহিত সেই প্রভুর আশ্রয় লইলেই পরম শান্তি পাইবেন সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা, ভণ্ড হইয়া মানুষ ভুলাইতে পারা যায় কিন্তু প্রভুকে ভুলান যায় না। এই জন্য তাঁর নিকট নিষ্কপট চিত্তে যাইতে হইবে, সর্ব্বদাই নিজ কৃত কর্ম্ম তাঁকে জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। তা'হলে অবশ্যই তাঁর দয়া হবে কোন সন্দেহ নাই।" (পঃ ৪।১১৬)।

(৭) প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "স্বর্গীয় পিতার নিকট যাহা চাহিবে তাহাই জানিও তিনি দিতে পারেন।"

(St. John XV—V. 16)

দয়াময় ঠাকুরও বলিয়াছেন "কৃষ্ণের নিকট যাহা চাহিব তাহাই পাইব।" (পত্রাবলী ২।১৩)।

(৮) পিতা মাতার সেবা সর্ব্বান্তঃকরণে করিবার জন্য প্রভু যিশুখৃষ্ট এবং ঠাকুর উভয়েই আদেশ করিয়াছেন।

(Mathew XV—V4. এবং পঃ ১।২, ২।১, ২।১১, ৪।১৯, ৩।১১৪)

(৯) প্রভু যিশুখৃষ্ট ভগবানকে প্রলোভিত করিতে বারণ করিয়াছেন।

(Mathew IV—V. 7)

ঠাকুরও বলিয়াছেন যে "ভাড়াতে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।" (পত্রাবলী ৩।১০৮)

(১০) প্রভু যিশুখৃষ্ট পরের সমালোচনা না করার জন্য এবং অন্যের সমালোচনা যে ভাবে করা হইবে নিজের সম্বন্ধেও সেই সমালোচনাই হইবে বলিয়া বলিয়াছেন।

(Mathew VII—V. 1 & 2)

ঠাকুর বলিয়াছেন, "যাহারা না খাইয়া, না নিদ্রা যাইয়া পর নিন্দায় কাল কাটায়, তাহারা কে জানিতে চাও ? তাহারা জটিলা কুটিলা ইত্যাদি ."

(পঃ ২।৩২)

"নিন্দুকে সাধু শোধন করে। কেননা, নিন্দা করিয়া সমস্ত পাপ সাধুর শরীর হইতে টানিয়া লয় ও আপনারা পাপী হয়। আর সাধু পবিত্র হইয়া যায়।" (পঃ ২।৫০)

(১১) প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "লোকেরা যখন তোমাকে আমার কারণে ভর্ৎসনা করিবে, নিগ্রহ করিবে এবং অন্যায় মতে তোমার বিরুদ্ধে সকল প্রকার অনিষ্টকর কথা বলিবে তখনই তুমি ধন্য। তুমি আনন্দ করিবে এবং অত্যন্ত প্রীত হইবে।"

(Mathew V—V. 11 & 12)

ঠাকুরও ঐরূপ নিন্দাবাদের জন্য মন খারাপ না করিয়া মনের আনন্দে সকলে একত্র হইয়া "নিত্যানন্দের বাগানে"র গরিমা বৃদ্ধি করার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। (পঃ ৪।১৬৯)

(১২) প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "যে কেহ স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহে, সেই অন্তরে পাপ করিয়াছে।" (Mathew V—V. 28)

আমাদের ঠাকুর স্ত্রীলোকগণকে মাতৃস্থানীয় বলিয়া বিশেষ ভাবে বহু স্থানে উপদেশ দিয়াছেন। (পঃ ২।২২, ২।৮০)

(১৩) প্রভু যিশুখৃষ্ট গোপনে দান করিতে এমন কি বাম হস্তকে না জানাইয়া দক্ষিণ হস্তে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(Mathew VI—V. 2. 3. 4)

আমার ঠাকুরও গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। (পঃ ১।৯, ৩।৮, ৩।১৮, ৩।৪৩, ৩।৬০, ৪।১২০)

(১৪) পার্থিব ধন রত্ন সংগ্রহের চেষ্টা পরিহার করতঃ স্বর্গীয় ধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রভু খৃষ্ট যেমন উপদেশ করিয়াছেন, ঠাকুরও তেমনি পার্থিব অর্থ চিন্তার অসারতা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

(Mathew VI—V. 20, 21, 24) (পঃ ২।১১, ২।৩৪, ৩।৪৯, ৪।৯৪, ৪।৯৫, ৪।১০১)

(১৫) প্রভু যিশুখৃষ্ট ভণ্ড সাধু সম্বন্ধে এবং কাহার সঙ্গ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন (Mathew VII—V15 X--V. 17) আমাদের ঠাকুরও সেইরূপ সৎসঙ্গ করার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। (পঃ ২।১, ৩।৬, ৪।৫৮, ৪।১১৯, ৪।১৩৪)

(১৬) প্রভু যিশুখৃষ্ট যেমন কুচিন্তা পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন (Mathew XV—V. 11, 17, 18, 19) ঠাকুরও তেমনি কুচিন্তা সর্ব্বদা পরিহার জন্য বারংবার নানা ভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

(পঃ ৩।১৯, ৩।৮১, ৩।১১১, ৪।১৭)

(১৭) প্রভু যিশুখৃষ্ট ভক্তদের জন্য নিজের শান্তি দাম করিয়া তাহাদের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। (John XIV—27)

আমাদের দয়াময় ঠাকুরও আমাদিগকে সর্ব্বদাই অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে আমাদের পাপের বোঝা যেন তাঁহারই মাথায় চাপাইয়া দিয়া আমরা নিষ্পাপ হইয়া হরি সেবায় আত্মসমর্পণ করি। (পঃ ২।১৫, ২।১৭, ২।১৯, ২।৩৩২)

(১৮) প্রভু যিশুখৃষ্ট মৃত্যু সম্বন্ধে এবং তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্র সফল হওয়ার বিষয়ে ও নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

(Mathew XVII—V. 22, 23. Johz XIII—V. 18, 19)

আমাদের ঠাকুরের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সামান্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

মহাত্মা ৺অটলবিহারী নন্দী পত্রাবলীর ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে একটী বড় বিপদ আসিতেছে বলিয়া পত্র লিখার কয়েক দিন পরই তিনি দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী মতে আরোগ্য হইয়া যায়।

ঐ পরিশিষ্টে শ্রীযুত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "এক সময় তিনি (ঠাকুর) লিখিয়াছিলেন যে তোমার Duty-তে রাত্রি ৫ ঘটিকার সময় গাড়ী অন্য লাইনে যাইয়া এঞ্জিন লাইন চ্যুত হইবে, সাবধান থাকিও। ছয় মাস পরে উহা ঠিক ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল।"

শ্রীকৃষ্ণধন শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সতর্ক করিয়া তাহার পৌত্র শ্রীমান্ ভূতভাবনকে শিলাপাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড—পরিশিষ্ট।)

(১৯) প্রভু যিশুখৃষ্ট অলৌকিকভাবে এক মরুভূমিতে ৫টী মাত্র রুটি ও ২টী মাছ দিয়া ৫০০০ লোককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন।

(Mathew XIV—V. 15-20)

১৯২৩ সালে আমার কলিকাতার বাসায় ঠাকুর শুভ পদার্পণ করিলে আমি মাত্র ৫০ জন ভক্তের প্রসাদ পাওয়ার মত আয়োজন করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে শতাধিক ভক্তের সমাগম হওয়ায় তাঁহারই কৃপায় ঐ প্রসাদ দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াও অনেক প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল।

(অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ড ৭৯।৮০ পৃঃ)

বরিশাল হরনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে আমি মাত্র ১০০০।১২০০ শত লোকের প্রসাদ পাওয়ার আয়োজন করিয়াছিলাম। ঠাকুর আমার বাসায় শুভ পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া একাকী বাড়ীর মধ্যে যাইয়া একদম ভাণ্ডার গৃহ ও পাকের গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে শুভ দৃষ্টিপাত করতঃ বলিয়াছিলেন "অক্ষয় বাবার অক্ষয় ভাণ্ডার।" "চমৎকার।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ২৫০০ শত লোক পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পাওয়ার পরও দেখা গেল বহু পরিমাণ চাউল, ডাইল, ঘি, তরকারী প্রভৃতি মজুদ আছে।
(অভিজ্ঞতা ২য় খণ্ড ১৬৬।১৭৯ পৃঃ)

বরাহনগরের জন্মোৎসব সময়ের খিচুড়ি প্রসাদ অপর্য্যাপ্ত বিতরণের বিষয় হরনাথ-স্মৃতি ষষ্ঠ লহরীতে এবং সোণামুখীর পৌষুলী বা আনন্দমিলন উৎসবের অফুরন্ত রসগোল্লা প্রসাদ কাড়াকাড়ি করিয়া পাওয়ার বিষয় হরনাথ স্মৃতি দ্বিতীয় লহরীতে বিস্তারিত বিবৃত আছে। এতদ্ব্যতীত পুরী উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণ সেবাতে এবং অন্যান্য বহু বহু স্থানে এরূপ ঘটনা বহু হইয়াছে তাহা হরনাথ ভক্তগণ এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই জানেন।

(২০) এক সময়ে প্রভু যিশুখৃষ্ট ভক্তগণসহ সমুদ্রপথে জাহাজে যাওয়ার কালে ভীষণ ঝড় তুফান হওয়ায়, তিনি আশ্চর্য্যজনক ভাবে ঝড় তুফান নিমেষে দূর করিয়া ভীত ভক্তগণকে শান্তি দিয়াছিলেন এবং সমুদ্রকে শান্ত করিয়াছিলেন।

(Mathew VIII, V. 23-26.)

আমাদের ঠাকুরও আঠারবাড়ীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তমণ্ডলী সহ ষ্টীমারে

যাওয়ার কালে ঐরূপ ভীষণ ঝড় তুফান শান্ত করিয়া ভীত ভক্তমণ্ডলীকে শান্তি দিয়াছিলেন। (হরনাথ-স্মৃতি ৩য় লহরী ১৩ পৃঃ)

বরিশাল "হরনাথ আশ্রম" প্রতিষ্ঠার দিনও শেষ রাত্রি হইতেই প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় হঠাৎ সে বৃষ্টি থামিয়া যায় এবং সারাদিন আর বৃষ্টি হয় নাই। অথচ বরিশাল হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরবর্ত্তী ঝালকাঠী পর্য্যন্ত সারাদিনই বৃষ্টি হইয়াছিল। (অভিজ্ঞতা ২য় খণ্ড ১৬৫।১৭৪ পৃঃ)

(২১) একজন দেবদূত কোন এক নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে একটী কূপের ভিতর প্রবেশ করতঃ জল আলোড়িত করিতেন। ঐ আলোড়িত জল যিনি সর্ব্ব প্রথম স্পর্শ করিতে পারিতেন তাহার যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধিই হউক না কেন তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যাইত। ৩৮ বৎসর পর্য্যন্ত অথর্ব্ব হইয়াছিল এমন একজন লোক ঐ কূপের পাড়ে যাইয়াও কেহ তাহাকে সাহায্য না করায় সে ঐ জল ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিয়া বহু দিন যাবৎ তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভু যিশুখৃষ্ট সেই স্থানে যাইয়া ঐ লোকটীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বলিলেন "Rise, take up thy bed and walk" অর্থাৎ উঠ, বিছানা নিয়া চলিয়া যাও। লোকটী তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় হাঁটিয়া চলিয়া গেল। (John V. 4, 5, 6, 7, 8, & 9.)

কটকের ভক্তপ্রবর শ্রীযুত যতীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কোন আশাই ছিল না। নল দ্বারা তরল আহার ডাক্তারগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যতীশ বাবু ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় শুনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ায় ঠাকুর একাকী রোগীণীর নিকট যাইয়া "কি হয়েছে মা? তোমার ব্যারাম তো ছেড়ে গেছে মা" এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্যারাম সারিয়া গেল।

(অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ড, ২৮।২৯ পৃষ্ঠা)

(২২) প্রভু যিশুখৃষ্ট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াই একটী স্ত্রীলোকের জ্বর আরোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। (Mathew VIII. V-15)

ঠিক যেমন ঠাকুর কৃপা বশে কটকের ইংরেজ পুলিস সাহেবের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন জ্বর হওয়ায় ডাক্তারবাবু আশা নাই বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর হঠাৎ সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়া মেম সাহেবের কর-মর্দ্দন করতঃ 'What is it with you, mamma? Get up please—Get up please." বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পুলিশ সাহেব Officiating Inspector General হইয়া পেন্সন পাইয়া বিলাতে গিয়াছেন, শুনিয়াছি যে তাঁহারা উভয়ে এখনও জীবিত আছেন।

(অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ড ৪২ পৃষ্ঠা)।

রাওলপিণ্ডির মিলিটারী একাউণ্টেণ্ট আফিসের শ্রীযুত রাধাবিনোদ সেন অম্লশূল বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পেটে ও বুকে হাত দিয়া বলেন তোমার রোগ সারিয়া গিয়াছে এবং সেই সময় হইতেই তিনি পূর্ব্বের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্ট)

(২৩) প্রভু যিশুখৃষ্ট চক্ষুরোগ হইতে মুক্ত করিয়া অন্ধকে চক্ষু দান করিয়াছিলেন। (Mathew IX, V. 30)

আমাদের ঠাকুর যখন ১৩২৪ সনে কলিকাতা ৺শরৎচন্দ্র দের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে যাইয়া জানিলাম, ঠাকুর উপরে আছেন। নীচের তালায় দেখি কলিকাতা সহরস্থ এক ভদ্রলোক (নাম আমার এখন মনে নাই) খুব নাচিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহার ছেলেটী একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা হওয়ায় গতকল্য হইতে সে বই পড়িতে পারিতেছে।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্ত্রীর চক্ষুর রোগ কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবে ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য হইয়াছিল তাহা "হরনাথ-স্মৃতি" দশম লহরীর ১ম পৃষ্ঠায় তাহার নিজের লিখিত প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে।

(২৪) একজন শত-সেনানায়কের চাকর তাহার বাড়ীতে পক্ষাঘাতে অচল হইয়া খুব কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়া সেনানায়ক যাইয়া যিশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হইয়া

প্রভুকে তাহার বাড়ীতে নিতে চান, কিন্তু তিনি বলিলেন, "তোমার চাকর সুস্থ হইয়া যাইবে।" চাকরও সেই সময়ই সুস্থ হইয়া গিয়াছিল।

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র নিজে, তাঁহার স্ত্রী, ২টী ছেলে ও ১টী মেয়ে বেরিবেরি রোগে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুরকে টেলিগ্রাম করেন। তদুত্তরে ঠাকুর তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানান যে তাঁহারা সুস্থ হইয়া যাইবেন এবং তাঁহারা যেন সোণামুখী যাইয়া থাকেন, তদনুসারে তাঁহারা সুস্থ হইয়া গেলেন। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্ট)

ভক্তপ্রবর ৺হেমচন্দ্র ঘোষের একটী ৪ বৎসরের মেয়ে জানালা হইতে মেঝেতে পড়িয়া যাওয়ায় কেরোসিনের আগুণে তাহার বুক, পা ও পিঠের স্থানে স্থানে সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া যায়। মেয়েটীর মা আসিয়া 'ঠাকুর কি হবে' বলিয়া উদ্দেশে শরণাপন্ন হওয়ায় মেয়েটী ঘুমাইয়া পড়ে। পরের দিন দেখা গেল যে, মেয়েটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। সামান্য দু' একটী ফোস্কা মাত্র আছে। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড পরিশিষ্ট)।

৺আশুতোষ গুহ বিগত ১৯১৬ সালের জার্ম্মান যুদ্ধের সময় বসরার হাঁসপাতালে যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন, জীবনের কোন আশাই ছিল না, তখন দয়াময় ঠাকুর কি ভাবে তাঁহাকে দূর দূরান্তর হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা হরনাথ-স্মৃতি ৪র্থ লহরীতে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

(অভিজ্ঞতা ৩য় খণ্ডের ২১৮ পৃঃ)।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন ঘোষ যখন বন্ধুহীন বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর পীড়িত অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি যে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবে দূর হইতে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া আরোগ্য হইয়াছিলেন তাহা "হরনাথ স্মৃতির" নবম লহরীতে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন।

ঠাকুরের অযাচিত করুণায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবে আরোগ্য হইয়াছেন তাহা পত্রাবলীর ৪র্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে তিনিই লিখিয়াছেন।

——(০)——

আমার ঠাকুর যেমন শ্রীনামের এবং মালা জপের উপর খুবই জোর দিয়াছেন, মুসলমানগণের মধ্যেও অনেকেই তেমনি মালা নিয়া ডুবিয়া থাকেন এবং সমস্ত মুসলমানগণই প্রতি রোজ পাঁচ পাঁচ বার নমাজ পড়েন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছি যে রীতিমত নমাজ না পড়িলে কবিলা (স্ত্রী) তালাক পড়ে। তাঁহারা বৈষ্ণবদের মত খোদাতালাকে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে মাখিয়া জুখিয়া লইয়াছেন। কেহ যদি একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করেন "কয়টী ছেলে?" অমনি উত্তর হইবে "আমার আবার ছেলে-পুলে কি? খোদাতালা দিয়াছেন ২টী ছেলে ১টী মেয়ে।" তাঁহারা কখনো ত কাহাকেও নিন্দা করিবেন না, কোন অতিথিকে ফিরাইয়া দিবেন না। এমন কি ঘরে আর কিছু না থাকিলেও শুধু কাঁচা লঙ্কা এবং লবণ দিয়াই তাঁহাকে ভাত খাওয়াইয়া দিবেন এবং অতিথিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিবেন "খোদাতালা যাহা বক্তে লিখিয়াছেন ভালই খাইয়াছি"। আমাদের ঠাকুরের উপদেশও ঠিক এমনই। আরবী পারসী আমি জানি না। কাজেই কোরাণ সরিফ আমার পড়া নাই। তবে একজন পরম ধার্ম্মিক মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত "তাপস মালা" গ্রন্থ পড়িয়াছি। অনেক মুসলমান মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশাবলী উহাতে লিখিত আছে। অতি চমৎকার গ্রন্থ। তাহার একটী মাত্র উপাখ্যান এখানে বর্ণন করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

১। একটী বাদশাহের একটী মাত্র কন্যা—খুবই শিক্ষিতা এবং বিবাহের উপযুক্ত বয়স্কা। কিন্তু পিতা বিবাহের যত প্রস্তাব আনিতেছেন, কন্যা সবই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। অবশেষে পিতা জানিতে পারিলেন যে অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা, বংশ যেমনই হউক না কেন যদি পরম ধার্ম্মিক একজন বর পাওয়া যায় তবে কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তাই পিতা খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে উপযুক্ত বয়সের এবং উপযুক্ত চেহারার একটী পরম ধার্ম্মিক পাত্র পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার 'নিত্য ভিক্ষা—তনু রক্ষা'। কন্যা তাহা

জানিয়া শুনিয়াও সেই ছেলেকে মনোনীত করিলেন।' ছেলেটী আর কি করেন? বাদশাহের হুকুম। তাহার নিজের অবস্থা বাদশাহকে খুলিয়া বলিলেও তিনি ছাড়িলেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। প্রচলিত নিয়মানুসারে কন্যা বিবাহের পর স্বামীর বাড়ী আসিবামাত্র তাহাকে কিছু খাইতে দিতে হয়। কিন্তু এই বরের ঘরে তো খাবার কিছুই নাই। তাই, তিনি বিবাহ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া কিছু আটা সংগ্রহ করতঃ বিনা ঘৃতেই কয়েকখানা রুটি প্রস্তুত করিয়া সেঁকিয়া মাচার উপর ঢাকিয়া রাখিয়া বিবাহ করিতে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া ঐ রুটী বাদশাহের কন্যাকে খাইতে দেন। রুটি তখন শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে পূর্ণ বয়স্কের দাঁতও ফেল্ পড়িয়া যায়। কিরূপে ঐ রুটি সংগ্রহ করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া কন্যাটি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিলেন "আমার দোষ কি? আমি তো পূর্ব্বেই আমার অবস্থার বিষয় পরিষ্কার করিয়া তোমার পিতাকে বলিয়াছি। আমি জানি যে এই রুটি তোমার কুত্তারও উপযুক্ত নহে। কিন্তু আমার নিকট ইহাই মূল্যবান জিনিষ।" মেয়ে বলিলেন "আমি সেজন্য কাঁদি না, আমি কাঁদি এইজন্য যে আমার পিতা এত বড় বুদ্ধিমান হইয়াও এতবড় একটা ভুল করিলেন! আমি পিতার নিকট চাহিয়াছিলাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বর।" ছেলেটী যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইঙ্গিতে তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলা হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "আমি অত্যন্ত গরীব বটে কিন্তু আমি অধার্ম্মিক নই। তুমি আমার উপর অবিচার করিও না।" মেয়ে বলিলেন "আমি তোমাকে ধার্ম্মিক বলি কি করিয়া? খোদা-তালাতে যখন তোমার বিশ্বাস নাই, তখন তো তুমি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম সোপানেই এখন পর্য্যন্ত পা দিতে পার নাই। খোদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তুমি তোমার স্ত্রীকে কি খাওয়াইবে তজ্জন্য পুরুষকারের সাহায্য নিয়া ভিক্ষা করতঃ রুটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছ।" তখন ছেলেটী তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন।

ঠাকুরের উপদেশও ঠিক তাই, যথা ঃ—

১। "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে পারি।" (পঃ ১।৯ পৃষ্ঠা)

২। "যদি কেহ অ-ধরকে ধরিতে চান তিনি যেন পূর্ণ বিশ্বাস রূপ শক্ত জমীর উপর দাঁড়াইয়া নাম রূপ জাল বিস্তার করেন।" (পঃ ৩।৬৪ পৃঃ)

৩। "যাঁহারা পুরুষকার—পুরুষকার করে চীৎকার করিতেছে তাহারা প্রকৃত ঘরে ঢুকে নাই।" (পঃ ৩।১০৯ পৃঃ)

৪। "দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও।" (পঃ ৩।১১২ পৃঃ)

৫। বিশ্বাস ও নির্ভর করে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম, হারা-জেতাতে কোন লজ্জা হবে না। যাঁর বোঝা তাঁরই মাথায় দিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে চলিতে থাক—বেশ আনন্দে যাইতে পারিবে।" (পঃ ৪।৫২ পৃঃ)

৬। "কার্য্য সম্বন্ধে আমিত্ব থাকিলেই দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।" (পঃ ৪।৪৩)

ময়মনসিংহ—সুন্দাইল "হরনাথ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। তাই, বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা—ঠাকুরের অতি প্রাচীন এবং প্রিয় ভক্ত—শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায়কে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি ৫।৫।৪৩ তারিখ আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই পত্রখানি এতদিন খুঁজিয়া পাই নাই; অদ্য হঠাৎ সেইটী হাতে পড়ায় তাহার সংস্পৃষ্টাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"আশ্রম স্থাপনকালে আমি আমার গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আড্ডা স্থাপন করিলে কুলাইতে পারিব না বলিয়া ঈশ্বরগঞ্জ আড্ডা করিয়া ১৩৩৩ সনের ১০ই ফাল্গুন প্রাতের গাড়ীতে নান্দাইল রোডে নামিয়া বেলা ৯ টায় ঠাকুর আমার বাড়ীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আমি ৩টী পাল্কি ও ৩টী হাতী ষ্টেশনে রাখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছোট দাঁতাল হাতীতে চড়িয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে ঈশ্বরগঞ্জ রাখিয়া আসিয়াছিলেন; তাহাতে আমি মনঃক্ষুন্ন হওয়ায় বলিলেন, 'আশ্রম প্রতিষ্ঠা সময়ে বুঝিবে।' পরে আশ্রম

প্রতিষ্ঠা সময়ে শ্রীশ্রীমার ফটো আশ্রম ঘরে একত্র অধিবাস করিয়া রাখা অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, 'এই 'ফটো' এখানে কেন? তোমার গোপাল আমি, গোপালের ত স্ত্রী নাই। যশোদা কি শ্রীমতী রাধিকাকে কৃষ্ণের প্রিয়া মনে করিত? না, খেলার সাথী বলিয়া মনে করিত? তোমারও তাহাই মনে করা উচিত। আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তোমার কি সংস্রব আছে? দ্বারকায় কৃষ্ণের যে স্ত্রী পুত্র ছিল তাহাদের সঙ্গে তো নন্দ যশোদার কোন সংস্রব ছিল না। তাই তোমারও থাকা উচিত ও আবশ্যক নহে। তজ্জন্যই তোমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীকে আনি নাই।' শ্রীযুক্ত কিরণ দাদা প্রভৃতি তখন উপস্থিত ছিলেন। এবারও খড়্গপুরে কিরণ দাদা তাহা স্বাকার করিয়াছেন ও তাঁহার স্মরণ আছে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় মত আমার আশ্রমের নাম "শ্রীশ্রীহরনাথ আশ্রম, সুন্দাইল" রাখা হইয়াছে। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন বলিয়া এত কথা লিখিলাম।"

সে যাহা হউক, আমি ১৬ই মে (১৯২৭) পুনরায় কলিকাতা যাইয়া শুনিতে পাই যে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক তাহার দুইদিন পূর্ব্বে (১৪ই মে) শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া পথে কয়েক ঘণ্টা মেদিনীপুরে অপেক্ষা করিয়া সোণামুখী চলিয়া গিয়াছেন। ১৭ই মে ভক্ত-ভ্রাতাদের নিকট জানিতে পারিলাম যে আমি বরিশাল রওয়ানা হইবার পর—

১। ঠাকুরের শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমতা (Amta) রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অল্প কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ঝিকড়া গ্রামস্থ ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে ৮ই মে ঝিকড়া যাইতে হইয়াছিল। তথায় ঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত একটী আশ্রম মন্দির আছেন। ভক্তগণ স্থানীয় অন্যান্য বহুলোকের সাহায্যে খুব জাঁকজমকের সহিত মিছিল সহকারে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করতঃ প্রকাণ্ড একটী মহোৎসব দিয়াছিলেন।

২। ঠাকুর ৯ই মে প্রাতে কলিকাতায় ৺শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। শরৎ দাদা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার দোতালায়

একখানি ঠাকুর ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ দিন রাত্রে ঐ ঘর প্রতিষ্ঠা করেন। শত শত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ ঘরের মধ্যে মার্ব্বল বেদীর উপর বসাইয়া মূল্যবান পুষ্প ও মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ শরৎ দাদার স্ত্রী স্বয়ং ঠাকুরের অর্চ্চনা করেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বেদীর উপর হইতে নামিয়া আসিবামাত্র বেদীর উপর ঠাকুর-ঠাকুরাণীর চিত্রপট স্থাপিত হন। ঠাকুর যখনই কলিকাতা আসিতেন তখনই এই শরৎ দাদার বাড়ী উঠিতেন এবং সেই সময় শরৎ দাদা কিরূপ ভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শত শত ভক্ত সহ ঠাকুরকে সেবা করিতেন তাহা আমি অভিজ্ঞতা ১ম খণ্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি। শরৎ দাদা এতদিন সাক্ষাৎ সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেইরূপ সুযোগ আর পাইবেন না এইজন্যই বোধ হয় এত অর্থ ব্যয় করিয়া ঠাকুরঘর নির্ম্মাণ করতঃ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বেদীর উপর ঠাকুর-ঠাকুরাণীর চিত্রপট স্থাপন করিলেন। ইহার পর কলিকাতা হইতে সোণামুখী যাইয়া অল্প কয়েকদিন পরেই ঠাকুর অপ্রকট লীলা অভিনয় করেন। কাজেই শরৎ দাদা তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল ঐ চিত্রপট সেবা করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন।

ক্রমান্বয়ে তিন দিন শরৎ দাদার বাড়ী থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভক্তগণ সহ হরিকথা কীর্ত্তনে আনন্দে কাটাইয়া দেওয়ার পর ১২ই মে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর দোতালা হইতে অতি ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে একতালায় নামিয়া তাঁহার বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া দুই হস্ত দ্বারা বুক চাপিয়া ধরিলেন। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার রব উঠিয়া গেল। তাঁহার আদেশানুযায়ী তাঁহাকে এক গ্লাস বরফ জল দেওয়া হইল এবং বরফের ব্যাগ বুকের উপর চাপিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করতঃ জীবনের কোন সাড়া কি নাড়ীর কোন গতি পাইলেন না। তিনি কয়েকটী ঔষধ বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের জীবনে এইরূপ অবস্থা ইতিপূর্ব্বে আরও ২।৩ বার

হইয়াছিল। ভক্তগণ তাহা জানেন, কাজেই তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন নাই। আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই ঠাকুর আবার উঠিয়া বসিলেন। অল্প কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার শরীরে কোনরূপ দুর্ব্বলতার চিহ্নও আর দেখা গেল না। তিনি পূর্ব্ববৎ ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সামান্য কিছুকাল পূর্ব্বেই যে তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, সেরূপ কোন চিহ্নই আর রহিল না। তত্রাপি শরৎ দাদা প্রভৃতি ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ঠাকুর শরৎ দাদার বরাহনগরের বাগান বাড়ী যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিতে স্বীকার করিলেন এবং ১৪ই মে তথায় যাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু ১৩ই মে ঠাকুর দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন "আমি কাল প্রাতে সোণামুখী যাইব।" ভক্তগণ ঠাকুরকে ফিরাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহার শেষ কথা হইল "সোণামুখীর মাটী ও আবহাওয়াতেই আমার এই দেহ গঠিত, সুতরাং আমি তথায় এই দেহ রাখিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিব।"

১৪ই মে ঠাকুর চিরতরে কলিকাতা ছাড়িয়া গোমো ট্রেণে রওয়ানা হইয়া যান। মেদিনীপুরের ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে তথায় নামিয়া একরাত্র তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। তৎপর ১৬ই মে তিনি সোণামুখী পৌছেন।

আমি ১৮ই মে বরিশাল ফেরত পৌছি। ২।১ দিন পরেই জানিতে পারিলাম যে ঠাকুর সোণামুখীতেও কোন শান্তি না পাইয়া ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার গ্রীষ্মাবাস মাছ-ডোবা গিয়াছেন। অতি নির্জ্জন, মনোরম এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় স্থান। ঠাকুরের তখনকার মনের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহার এক প্রিয় ভক্তের নিকটে লিখিয়াছেন—"দাদা আমার কি হইয়াছে আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে যেন আমি একজন আগন্তুক এবং অপরিচিত লোকের মধ্যে—অপরিচিত স্থানে বাস

করিতেছি। এমন কি আমার স্ত্রী, ছেলে ও আত্মীয় স্বজনগণের মুখও আমার অচেনা মনে হইতেছে। চারিদিকের যাহা দেখি তাহার কিছুই যেন চিনিতে পারিতেছি না। আমার জীবন সম্পূর্ণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। জানি না কৃষ্ণের কি ইচ্ছা!"

আমি ২২শে মে বরিশাল হইতে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বল রওয়ানা হইয়া ২৬শে মে রাত্রে বরিশাল পৌঁছি। ২৭শে মে বেলা আন্দাজ আটটার সময় আমি দোতালার ঠাকুর ঘরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপর উঠিয়াছি এমন সময় নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাইলাম।

"Sonamukhi—26

Father died last night at 9
come immediately.

Anukul"

টেলিগ্রামটি পাইয়া প্রথম মনে হইয়াছিল যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা অনুকূলের পিতা মারা গিয়াছেন। কারণ স্বপ্নেও ভাবি নাই, ঠাকুর এইরূপ ভাবে হঠাৎ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং তজ্জন্য সহস্র সহস্র ভক্তদের মধ্যে আমার মত একজন নগণ্য লোকের নিকট ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—আমাদের অনুকূল দাদা ঐরূপ ভাবে টেলিগ্রাম করিবেন। পরে টেলিগ্রামের উপরিভাগে সোণামুখীর নাম দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল এবং আমি বসিয়া পড়িলাম। তখনকার অবস্থা মনে হইলেও আর কলম অগ্রসর হইতে চায় না। কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি না, আবার হাতে সরকারী কার্য্যও যথেষ্ট আছে এবং আমার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার তদন্তীয় কার্য্য তত্ত্বাবধান উপলক্ষে তৎপরদিনই কলিকাতা হইতে বরিশাল আসিতেছেন। সুতরাং আমার এখন সোণামুখী যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যাইয়াই বা কি করিব? কি দেখিব? অনেকক্ষণ এই ভাবে চলিয়া গেল। তৎপর উঠিয়া ধীরে ধীরে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জগদীশবাবুর

নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ করিয়া আসিয়া অনুকূল দাদার নিকট টেলিগ্রাম করিলাম। এবং তাঁহার নিকট ও শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাদার নিকট বিস্তারিত পত্র লিখিলাম। রীতিমত হবিষ্য করিতে আরম্ভ করিয়া ৫ই জুন যথাসম্ভব শ্রাদ্ধের কার্য্য করিলাম। তৎপর বৈদ্যনাথ দাদা অতি দুঃখের সহিত আমাকে লিখিলেন—

"আপনার পত্র পাইলাম। কলিকাতায় আমাদের আর কাহারও হাত পা যেন চলিতেছে না। এখন আপনাদের মত উদ্যমশীল ও কর্ম্মী যুবকগণই বাবার কার্য্য চালাইতে অগ্রগামী হউন। বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া বিশেষ সমারোহ ব্যাপার হইয়াছে। গ্রামের ধনবান জমিদার গত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপই হইয়াছে। অকাল মৃত্যু নহে—"বুড়া-মরা" সুতরাং গ্রামের লোকে বিশেষ শোক বোধ করে নাই।"

বিপদের উপর বিপদ! কলিকাতা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে আমার সহোদর প্রতিম এবং হরনাথ জগতের চিরসঙ্গী ললিত মোহন দত্তও আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অবশ্যই আমি ১৬ই এবং ১৭ই মে তাহাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম তাহাতে তখনই তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। তত্রাপি তাহার অভাব প্রতিক্ষণেই অনুভব করিতেছি। এবং আজীবন করিতে হইবে। যদি আবার জন্ম হয় তবে যেন তাঁহার সঙ্গ পাই—যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম সঙ্গী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥"

অবশেষে ২৯শে জুন বরিশাল হইতে রওয়ানা হইয়া ৩০শে জুন কলিকাতা পৌছিয়া উপরোক্ত ললিত মোহন দত্তের বিধবা স্ত্রীকে দেখিয়া এবং তাহার আকুল ক্রন্দন শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনের এইরূপ অবস্থা নিয়া ভক্তপ্রবর বৈদ্যনাথ দাদা ও

দ্বিজেন দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঐ দিন রাত্রেই সোণামুখী রওনা হইলাম। পরদিন ১লা জুলাই বেলা ১টার সময় সোণামুখী পৌছিয়া বাগানবাড়ী অনন্ত কুণ্ডের উত্তর পাড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ক্ষেত্র দেখিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি করি, উপায় তো নাই! কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের সমাধি প্রদক্ষিণ করতঃ প্রণামান্তে ৺ভূতনাথ দাদাকে তথায় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী পৌছিয়া কি দেখিলাম? নীরব, নিস্তব্ধ! সমস্ত বাড়ীটির উপর যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যেরূপভাবে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পাযাণও গলিয়া যায়। দেখিয়া শুনিয়া পাগলের মত হইয়া পড়িলাম। সে দৃশ্য মনে হইলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। ৩রা জুলাই মেদিনীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব এবং ২রা জুলাই অধিবাস। সুতরাং ১লা জুলাই রাত্রেই ঠাকুর ঠাকুরাণীর চিত্রপট লইয়া ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র কেষ্টদাসের সমভিব্যবহারে আমাকে সোণামুখী হইতে রওয়ানা হইয়া আসিতে হইয়াছিল। সোণামুখী য়াওয়ার সময় এবং আসিবার সময় বাঁকুড়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত নন্দবাবা, যশোদা মা এবং বাসুদেব মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ঠাকুরের তিরোধান ও শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। ২রা জুলাই মেদিনীপুর পৌছিলাম। ঠাকুর ঠাকুরাণীর চিত্রপটের উপরই ২রা জুলাই অধিবাস এবং ৩রা জুলাই জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। তদবধি ১৩৩৫ সনে পুরী, ১৩৩৬ সনে দেউলটী, ১৩৩৭ সনে কলিকাতা, ১৩৩৮ সনে উলুবেড়িয়া, ১৩৩৯ সনে পুরী, ১৩৪০ সনে কোকনদ, ১৩৪১ সনে পুরী, ১৩৪২ সনে পুরী এবং ১৩৪৩ সনে খড়্গপুরের জন্মোৎসবে চিত্রপটের উপরই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। কোকনদের উৎসব হইতে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপটের বামে বসিতেছেন। প্রত্যেক জন্মোৎসবই পূর্ব্ববৎ সমারোহের সহিত চলিতেছে, ভক্ত সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক দেখাইতেছেন যে তিনি প্রতি জন্মোৎসবের সময়ই উপস্থিত থাকেন। গত সন খড়্গপুরের উৎসবের

সময় জনৈক ভক্ত উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করায় ঠাকুরের চিত্রপটও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। দিনের বেলায় ঘটনা এবং বহু নিরপেক্ষ লোকও তাহা দর্শন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসব এবং সোণামুখীতে অনুষ্ঠিত 'আনন্দ মিলন' ও তিরোধান উৎসব বর্ণনা করিতে গেলে অন্ততঃ আর একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। তার একটী মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১৯৩০ সনের ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতার উপনগর বরাহ-নগরে ঠাকুরের একটী উৎসব হয়। আমি ২৭শে ডিসেম্বর বৈকালে বরিশাল হইতে রওয়ানা হই। পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় কলিকাতা পৌঁছাবার কথা। কিন্তু কুয়াসার দরুণ ষ্টীমারের দেরী হওয়ায় খুলনা একস্‌প্রেস্ ট্রেণ ধরিতে পারা গেল না। কাজেই ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় আমাকে কলিকাতা পৌঁছিতে হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের বাড়ী যাইয়া শুনিলাম সকলেই বরাহনগর উৎসবে গিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে রওনা হইয়া রাত্র প্রায় ৯টার সময় উৎসব প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া দেখি সকলেই প্রসাদ পাইয়া ইষ্ট গুষ্টি করিতেছেন। ঠাকুরের সমস্ত উৎসবেই উৎসবান্তে কিছু না কিছু থাকিয়াই যায়। সুতরাং সবই ছিল, ছিল না কেবল মিষ্টি। তজ্জন্য সকলেই খুব দুঃখিত হইলেন, কারণ তাঁহারা জানেন যে আমি খুব রসগোল্লা প্রিয়। আমি প্রসাদ পাইতে বসিলাম। কিছুকাল পরেই জনৈক ভক্ত স্তূপ করা সতরঞ্চি ঠিক করিতে যাইয়া তাহার নীচে এক হাঁড়ি রসগোল্লা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠাকুর, অক্ষয় দাদার জন্য রসগোল্লা রাখিয়া দিয়াছেন।" একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা গেল না যে তাহাদের মধ্যে কে ঐ রসগোল্লা ঐ স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। বাহিরের লোক একটীও ছিলেন না। ভক্তগণের মধ্যেও এমন কেহ ছিলেন না যে তিনি অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া উহা তথায় রাখিতে পারেন। তখন ঠাকুরের কৃপা স্মরণ করিয়া আমার যাহা অবস্থা

হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল রেমুনার 'গোপীনাথ' যে তাঁহার পরম ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ভোগের সময় নিজের ধড়ার আঁচলের তলে এক হাঁড়ি ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়া 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নাম ধারণ করিয়াছিলেন সেই কথাটী। সকলেই বোধ হয় সেই উপাখ্যানটী জানেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা চতুর্থ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। স্থানাভাবে পয়ারটী এখানে সন্নিবেশ করিতে পারা গেল না। আমি আনন্দে ঐ দিনের ডাইরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি "Thakur proved himself to me to be রসগোল্লা-চোরা গোপীনাথ।"

সে যাহা হউক, ঠাকুরের তিরোধান সম্বন্ধে আমি সোণামুখী ও বাঁকুড়াতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে ঠাকুর তাঁহার এত প্রিয় 'মাছ-ডোবা' যাইয়াও কোন শান্তি না পাইয়া ২৩শে মে সোণামুখী ফিরিয়া যান। গ্রামের বহুলোক, কি শত্রু, কি মিত্র, ঠাকুরের আশ্চর্য্য আকর্ষণে পূর্ব্ববৎ দুইবেলা আসা যাওয়া করিতে আরম্ভ করেন এবং ঠাকুর সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মতই তাঁহাদিগকে নিয়া পূর্ব্ববৎ চা পান, গল্প, ক্রীড়াদি করিতে থাকেন। ঠাকুরের এমনই প্রভাব যে বাহিরে তাঁহার সম্বন্ধে যে যে ভাবই পোষণ করুন না কেন তাঁহার নিকট আসিয়া থাকা পর্য্যন্ত কেহ কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে পারেন না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। একদিন বাগানবাড়ী বেড়াইবার সময় অনন্ত কুণ্ডের উত্তর পাড় যাইয়া ঠাকুর হঠাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি মরিলে আমাকে এই স্থানে দাহ করিও।" প্রকাশ থাকে যে তদনুসারে ঐ স্থানেই ঠাকুরের জড়দেহ দাহ করা হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট বরাবর অন্ততঃ ২।৪ জন ভক্ত থাকেনই। কিন্তু তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে একে একে সকলকেই নানা অছিলায় সরাইয়া দিলেন। রহিয়া গেলেন একমাত্র আমাদের সেই ৺ভূতনাথ দাদা।

অবশেষে সেই নিদারুণ ২৫শে মে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন

প্রাতঃকালেও শ্রীশ্রীনিরদয় ঠাকুর (হঠাৎ 'নিরদয়' শব্দটী বাহির হইয়া গেল, তিনি যখন আমাদিগকে কিছু না কহিয়া না বলিয়া এরূপভাবে চলিয়া গেলেন, তখন নিরদয় বলিব না ত আর কি বলিব ?) পূর্ব্ববৎ গ্রামিক লোকের সঙ্গে একত্রিত হইয়া চা পান ও নানারূপ গল্প করেন। হঠাৎ নাপিত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ঠাকুর সকলকেই ক্ষৌরি হইতে বলিলেন—সময় হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিলেন। কিন্তু ঠাকুর "এত বড় বাঁড়ুযো বংশ ! একজন হঠাৎ মরিয়া গেলে ত দশদিন ক্ষৌর কার্য্য বন্ধই রাখিতে হইবে" এই বলিয়া সকলকে ক্ষৌরি হইতে বাধ্য করিলেন। আবার কতক্ষণ পরে কথা প্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যদি হঠাৎ মরিয়া যাই তবে তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। চন্দন কাষ্ঠ বাগান বাড়ীতেই আছে, আর ঘৃত ঘরেই আছে।" কিন্তু ঠাকুরের এই ইঙ্গিত কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তৎপর সকলে একে একে নিজ নিজ কার্য্যোপলক্ষে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরও আফিস ঘরে যাইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বেলা আন্দাজ ১০টা। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ঐ দিন তিনি বিভিন্ন দেশের ছয় জন ভক্তের নিকট ৬ খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পরে জানা গিয়াছে যে প্রত্যেক পত্রেই তিনি যে চলিয়া যাইতেছেন তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত ছিল। তাঁহার তৈল-মর্দ্দন লীলাটি পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহার তৈল মর্দ্দনে অনেক সময় লাগে, অন্যান্য দিনের মত এই দিনও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে তৈল মর্দ্দন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আহারের সময় এক গ্রাস অন্ন মুখে দেওয়া মাত্র বুকে সাংঘাতিক বেদনা উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া বসেন। এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মত সকলের সঙ্গে রীতিমত আলাপ করিতে থাকেন। রাত্র আন্দাজ ৮॥০ টার সময় ঠাকুর আমাদের ছোট মাসিমার নিকট হইতে চাহিয়া স্বহস্তে একবাটী দুধসাগু পান করিলেন। কিছুকাল পরেই

দেখা গেল যে কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের মাথা যেন টলিয়া পড়িতেছে। ঠাকুরের ছোট ছেলে কৃষ্ণদাস কারণ জিজ্ঞাসা করিলে "তুমি ত আমাকে মাথা সোজা করিয়া থাকিতে বল নাই!" এই কথা বলিয়া ঠাকুর আবার মাথা সোজা করিয়া বসিলেন। কিছুকাল পরে ঠাকুর বলিলেন "কয়েক রাত্রি আমি ঘুমাই নাই, আমার ঘুম পাইতেছে। বিছানা ঠিক করিয়া দাও, আমাকে কেহ বিরক্ত করিও না।" তদনুসারে তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর একতালার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোঠায় তাঁহার বিছানায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী ও মাসী মা নীচে বসিয়া আছেন এবং ঠাকুর খাটের উপর শয়ন করিয়া আছেন। অল্প কিছুকাল পরেই, রাত্রি ৯টার সময়, ছোট মাসীমা ও কৃষ্ণদাস, ঠাকুর কেমন আছেন দেখিতে যাইয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া কোন সাড়া না পাওয়ায়, ঠাকুরের শরীরে হাত দিয়া দেখেন যে শরীর শক্ত হইয়া গিয়াছে। তখন ছোট মাসীমা "ঠাকুর কর ধরিয়াছেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই দেখিলেন এবং ডাক্তার আসিয়াও বলিলেন যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তারপর গ্রামিক সমস্ত লোক আসিয়া একত্র হইয়া তাঁহাদের যাহা করিবার তাহাই করিলেন। এ সম্বন্ধে আর কিছু লিখিতে কলম আর অগ্রসর হইতে চায়?

ঠাকুরের তিরোধান সম্পর্কে যাঁহার যাহা মনে লয় তিনি সেইরূপ ধারণা লইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কেহ বলেন, ঠাকুর তো ইতিপূর্ব্বে আরও ২।৩ বার বহু সময় পর্য্যন্ত এইরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিলেন সেইবার সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করা বড়ই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন জীবন্তেই তাঁহাকে সংকার করা হইয়াছে আর কেহ কেহ বলেন যে না, প্রকৃতই তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। "যাঁর যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।" সে যাহা হউক, ভালবাসা ও ভক্তির আকর্ষণ অনুযায়ী বিষয়টী যিনি যে ভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন তিনি সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ লোকের সাধারণ মৃত্যুতেও কোন কোন সময়ে কত কি, কথা উঠে।

সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ রক্ষা সম্বন্ধে যে নানালোক নানারূপ বলিবে তাহা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহেরই তো কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন, কেহ বলেন শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির সঙ্গে, আর কেহ বলেন শ্রীটোটা গোপীনাথের মূর্ত্তির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। আবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বলেন তাঁহার পূজিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার মত লোকের আলোচনা করা সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। চক্ষের উপরই দেখিতেছি যে, প্রভু জগদ্বন্ধু বহু বৎসর হয় দেহ রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের দৃঢ়বিশ্বাস যে তিনি দেহ রক্ষা করেন নাই। তজ্জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয় নাই। আমি সেই অবস্থায় নিজেই তাঁহার দেহ দেখিয়া আসিয়াছি। তৎপর যখন অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইল। কিন্তু তিনি সমাধির মধ্য হইতেও বাহির হইবেন এই, বিশ্বাসে তাঁহার শিষ্যগণ আজ পর্য্যন্তও সমাধি গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া দিবারাত্র দলে দলে এক এক সময় এক এক দল "হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ" এই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। একটী মুহূর্ত্তও কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তজ্জন্য কি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা চলে?

সে যাহা হউক আমাদের ঠাকুরের দেহ ত সৎকার করা হইয়াছে। ভক্ত-ভ্রাতাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস বোধ হয় কাহারও নাই যে, তিনি আবার সেই শরীরেই গাত্রোত্থান করিবেন। তবে আমরা থাকি কি নিয়া? তিনি কি আমাদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই? নিশ্চয়ই রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতপূর্ণ উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্যদের জন্য তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়া শ্লোকাকারে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই নাম "শিক্ষাষ্টক"। উহা তাঁহার বিজ্ঞ শিষ্যবর্গেরই উপযুক্ত। কিন্তু আমরা গণ্ডমূর্খ ও সাংসারিক নানা চিন্তাদিতে বিভ্রান্ত, তাই আমাদের অবস্থানুযায়ী

ব্যবস্থা করিয়া দয়াময় ঠাকুর নানারূপ চিত্তাকর্ষক কথাচ্ছলে বা পত্রাদির মধ্য দিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের "হরনাথাষ্টক"। যথা—

(১) "আমি রে তোদেরি পাছে, নিতি আছি কাছে কাছে,
বারেক পাগল ভেবে করিস্ স্মরণ।"

"আমি যেখানেই যাই তোমাদেরই আছি ও থাকিব" (পঃ ৩।২৯)। "আমি তোমাদের নিকট থাকি ও ছিলাম" (পঃ ৩।৩০)। "আবার মিলিব কোন চিন্তা নাই" (পঃ ৩।৭৮)। "তোমরা আমার জীবন, তোমাদিগকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব" (পঃ ৪।১৫৯)। "পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দাও" (পঃ ১।২০, ২।১৯)। "তোমাদের জন্য পাপপুণ্য ভয় করি না" (পঃ ২।১৫)। "আমি জগতের সকলের সেবা করিতে আসিয়াছি" (পঃ ২।১৭)। "দুঃখের পসরা আমার মাথায় দাও" (পঃ ২।৩৩২, ৪।৭)। "যাবার সময় আমি যেন Good return নিয়া যেতে পারি। আমি তোমাদের, তোমরা আমার" (পঃ ৪।১৬৭)।

(২) "সদাই হরিনামে মত্ত থাক ; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি, জগতে কিছুই নাই। যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণ নামের স্পর্শে শুচি হইয়া উঠে। তাই বলি শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক। নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। নাম হতে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরু-বস্তু" (পঃ ১।১)। "কৃষ্ণ ধরিবার কল একমাত্র তাঁর নামটীকে দৃঢ় আশ্রয় করিয়া থাকা, অচেনা বস্তুর প্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাঁর নামটী মনে রাখা। তাই বলি বাবা! নাম যেন কোন রকমে ভুলিও না, নাম ছাড়িও না, মনের সকল সাধ মিটিবে, সফল মনোরথ হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিবে" (পঃ ৪।১)। বিনা বিচারে নাম লইতে থাকুন, "হরেকৃষ্ণ" (পঃ ৩।৬৯)। "সংসারে থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ নামটী কর, সন্ন্যাস অপেক্ষা বেশী ফল পাইবে" (পঃ ৪।৬৮)। "প্রেমে হরিকে বাঁধিতে চাও, নাম কর" (পঃ ৪।৭৭)।

"নামের বিনিময়ে বিষ্ণুত্ব লইলেও ঠকা হইবে" (পঃ ৪।৯৮)। "মালা এক তিলের জন্যও ছাড়িবে না" (পঃ ৪।৩৬)। "যখন নামে ডুবে আছেন পলকে পলকে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন" (পঃ ৪।১৩৩, ৪।১৩৪, ৪।১৪০)। "পূজা পাঠ হইতে নামে সন্তুষ্ট" (পঃ ৪।১৪২)। "নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র মহাযজ্ঞ আর নাই" (পঃ ৪।১৪১)।" নাম জানিয়াই ধ্রুব বাঘ হাতী স্পর্শ করিয়া শেষে আসল পাইয়াছেন" (পঃ ৪।৭৩); "কৃষ্ণ কৃপা ভাড়াতে চাহিও না" (পঃ ৩।১০৮)। "গাড়ীতে পাল্কীতে যাইতে যাইতে নাম করুন" (পঃ ৪।১৫৩)।

(৩) "দেখুন মহারাজের সঙ্গে মহারাজের, আমীরের সঙ্গে আমীরের, যোগীর সঙ্গে যোগীর, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর আর গরীবের সঙ্গে গরীবের আলাপই শোভা পায়; ইহার বিপরীত যেখানে, সেখানেই কষ্টের কারণ। তাই বলি, যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করুন; কিন্তু আমার কিছুই নাই বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানায়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র যন্ত্র জপ ধ্যান, কিছুই করিতে হয় না, কেবল মাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু আমার এমনই তুর্ভাগ্য যে এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না" (পঃ ১।৬)। "ঘোর কলিকালের যেমন শক্ত ব্যাধি, নিতাই গৌর তেমনই বিচক্ষণ। দেখে শুনে তেমনই অমোঘ "হরিনাম" মহৌষধির ব্যবস্থা করে গেছেন। তুঃখী তাপী এ ঔষধের গন্ধ মাত্রেই পরমানন্দে ভাসে, আর একবার খেলে সকল জ্বালা জুড়ায়" (পঃ ৪।৮৮)। "নিতাই আমার প্রেমময় সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ এবং প্রধান প্রেমদাতা। যদি প্রাণের গৌর পাইতে চান নিতাইয়ের পদাশ্রয় করিতে ভুলিবেন না। নিতাই বড় দয়াময়" (পঃ ২।১৮)। "অন্ধকে বিপথে লইয়া যাইতে যেমন কোন কষ্ট করিতে হয় না, তেমনই মানুষ ভুলাইতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মানুষ ভুলে, আমার নিতাই কিন্তু তাতে ভুলেন না। তাঁকে ভুলাবার দ্রব্য অন্য রকম, সেটী যার তার নিকট থাকে না, নিতাই দয়া করে যাকে দেন

তিনিই পাইয়া চরিতার্থ হন। নিতায়ের দেওয়া রজ্জু দ্বারা নিতাইকেই বান্ধেন; এ বন্ধন বড়ই মধুর, যাকে বান্ধে এবং যে বান্ধে উভয়েই সমান আনন্দ পায়" (পঃ ২।২০)। "আমাদের সকলেরই মহা উৎকট ব্যাধি, সেইজন্যই এবার সকলের বড় ডাক্তার নিতাই গৌর, মহা অমৃত হরিনাম লইয়া আসিয়াছেন। আর আমাদের ভয় কি? খেতে না চাহিলেও দয়াময় নিতাই মুখ চিরে খাওয়াইবেন। * * * সকলে মিলে নিতাই পদ আশ্রয় করি আসুন। তা হ'লেই সাধ মিটিবে সকল জ্বালা জুড়াইবে। * * * * আমরা দিক্ বিদিক্ শূন্য হয়ে, আসুন কেবল হরি বলি, তাহলেই নিতাই প্রেম আনিয়া দিবেন। * * তাই বলি বাবা, নিত্যানন্দে বিশ্বাস করিয়া হরি বলুন তা হ'লেই মনের সকল সাধ মিটিবে, দয়াল নিতাই দয়া করিবেন। * * * * এ সংসারে কতবার আসা যাওয়া গেছে কতবার কত রকম সাধন ভজন করা গেছে, এবার একবার নিতাই বলে আনন্দ দেখুন, এ আনন্দের কাছে সব তুচ্ছ হ'য়ে যাবে। বাবা, নিতাই আমাদের নিজ জন, তাকে কোনরকম ভয় করবেন না, যখন যা মনে আসবে অবাধে খুলে বল্‌বেন, কোন রকম সমীহ করবেন না।" (পঃ ৪।১৫)।

৪। "কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে থাক" (পঃ ১।২৬)। "প্রেম দ্বারা সেই প্রেমময় কৃষ্ণকে বাধ্য করে, প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়।" (পঃ ১।৩৩)। "বিনা প্রেমে সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না" (পঃ ২।১৮)। "প্রেমে হস্তী বাঘ বশ হয়" (পঃ ৩।৫১)। যাহারা গৌরকে ভালবাসিয়াছে তাদের ভালবাসাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। * * * ভবে আসিতে ভয় পাইও না, ভ্রমেও মুক্তি চাহিও না; যারা নিতান্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন তারাই খেলা ছেড়ে জড়বৎ থাকিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে রাখিয়া বারবার এই ভবে আসিব" (পঃ ৪।১০৮) "কৃষ্ণ ধরিবার ফাঁদই চক্ষের জল (পঃ ৪।৫৭)।" গোপী অনুগত হইয়া গোপী ভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া করে। তোমাকে আমাকে সেই প্রেম নিকুঞ্জে ডেকে লন, তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, একমাত্র প্রেম

থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান সেখানে কিছুই যেতে পায় না (পঃ ১।২১)।” একবার এই জগৎকে সেই পূর্ণানন্দময় ধাম করে তুলুন, সবাই কেবল ভালবাসা শিক্ষা ক’রে তারই লেনা-দেনা করুক (পঃ ৪।৮৪)।” “সদা প্রেমে মগ্ন থাক, সকলকে ভালবাস এই ভালবাসার রাজত্ব যত প্রশস্ত করিবে ততই চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে (পঃ ২।৩১)”

৫। (ক) মরিতে হইবে অহরহঃ চিন্তা কর, (খ) যথা লাভে সন্তুষ্ট থাক, (গ) এ পৃথিবীতে যাহা হবার তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত এইটী ধ্রুব বিশ্বাস কর (ঘ) সঙ্গ ত্যাগ কর (ঙ) মন নিতান্ত চঞ্চল হইলে নির্জ্জন স্থানে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন কর (চ) সকলের উপর একজন আছেন, কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন কর (ছ) জীবে দয়া, অর্থীর অভিলাষ পূরণ, আতুরের দুঃখ নিবারণ কর (পঃ ১।১৯, ৪।১৫৮)। গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর কর (পঃ ৩।৮, ৩।৪৩, ৩।১৮, ৪।১০৮)। নিজে না খাইয়াও ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিও, সাধ্য মত দুঃখীর দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা রাখিও” (পঃ ১।৭৬, ৪।৮০)। “জগৎ জননী হইয়া সব দুঃখী তাপীর দুঃখ মোচন করুন (পঃ ৪।১০৮)।” গরীবের উপর দয়া রাখিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট থাকেন (পঃ ১।৯)।

(৭) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করুন (পঃ ৩।৫০)। সাধুগণ কৃষ্ণ অপেক্ষাও দুর্লভ (পঃ ৩।৪৯)। “পাপীর সঙ্গ করিও না (পঃ ৩।৮০)।” সদা ভাল সঙ্গে অথবা নিঃসঙ্গে থাকিবে (পঃ ৪।১১৯)।” ‘ভক্তমাল’ প্রত্যহ একটু পড়ুন, ‘সাধক কণ্ঠহার’কে কণ্ঠহার করুন। সকলের প্রধান সাধুসঙ্গ করুন (পঃ ৪।১৫৩)। ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ সদা পাঠ করিবেন, ‘হরিদাস’ ও ‘রঘুনাথ’কে আদর্শ করিবেন, ‘ছোট হরিদাস’কে সদা মনে রাখিবেন, ‘গদাধর’ ও ‘জগদানন্দে’র বিষয় গোপনে চিন্তা করিবেন। ‘রূপ-সনাতনে’র কার্য্য সমালোচনা করিবেন, তাহা হইলেই প্রভুর কথা সকলই জানিতে পারিবেন (পঃ ৪।১৩৫)। ‘সাধক কণ্ঠহারকে’ কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং চলিতে বসিতে কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে একটী পদ বলিতে থাকিবেন (পঃ ৩।১০)। সত্যপথে

চল (পঃ ২।৪২)। অসৎ চিন্তা, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাও (পঃ ৩।১৯, ৩।৮০)। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বরং কুকার্য্য করিও কিন্তু কুচিন্তা করিও না (পঃ ৩।১১১, ৪।১৩৪)।

* (৮) "যাতে তব সুখ রাখিলে আমায়
আমি তাতে দুঃখ বাসিনা।
তুমি হে আমার ভরম সরম,
এটী নাথ, কভু ভুলনা!

* * *

যেদিন আদর ভরে যতন করে
পরালে নানা গহনা।
সেদিন যেমন হাসিয়া প'রেছি
আজ কেন হেসে খুলিব না?

* * *

তোমারই তরে সাজি হে আমি,
আমা তরে কিছু করি না।
তুমি হে আমার দেখাবার স্থল,
আর কারেও আমি জানি না!

* * *

---

*শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষার পূর্ব্বে এইটী লিখিয়া হরনাথ জগতের তমালিনী মাকে (মেদিনীপুরের ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত উকিলের স্ত্রী) পাঠাইয়া দিয়া যান এবং তমালিনী মা উহা হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সভাকে পাঠাইয়া দেন। ১৩২৭ সালের মোহন মুরলীর ১ম পৃষ্ঠায় ইহা মুদ্রিত করিয়া ঐ সালেরই মেদিনীপুরের জন্মোৎসবে পরিবেশন করা হইয়াছিল।

সুখে দুঃখে রাখ—যেমন অভিলাষ,
আমি তাতে কিছু বলি না।
তব সুখ লাগি এসেছি হে আমি
সেটি যেন কভু ভুলি না॥

* * *

পতির আদরে নারীর গরব,
তাও কি বন্ধু জান না?
তুমি হে আমায় চিরদাসী বলে
গণিতে কভু ভুলনা॥

* * *

শেষ নিবেদন, তোমা ভেবে নাথ,
সুখ দুঃখ ভেদ মানি না।
পাগলিনী হ'য়ে তোমা ছাড়া বন্ধু
আর যেন কিছু চাহি না॥

তোমাদের—হর"

উপরোক্ত শিক্ষাষ্টক যদি আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সেইভাবেই চলিতে পারি তবেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকৃত সেবা করা হইবে। এবং তাহা হইলেই আমরা যে একটী মাত্র প্রশ্ন "কে তুমি কেন তোমায় জারে তাপত্রয়" এর প্রকৃত উত্তর দিয়া আনন্দধামে যাবার certificate পাইয়া জনমের মত কৃতার্থ হইব। ঠাকুর বলিয়াছেন "প্রশ্ন যেমন একটী, উত্তর তেমনি সামান্য, গুছাইয়া বল্‌তে পার্‌লেই হয়। 'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলে গেল। সেইকালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি লৈল॥' যেমন জিজ্ঞাসা করিবে 'কে তুমি?' অমনি উত্তর দিতে হবে 'নিত্য কৃষ্ণদাস'। যেমন জিজ্ঞাসা করিবে 'কেন তোমায় জারে তাপত্রয়'? অমনি এক নিঃশ্বাসে এবং অনুতাপের সহিত

বলতে হবে কৃষ্ণ দাসত্ব অভিমান ভরে ভুলিয়াছি। এইটী মনে প্রাণে বলিতে পারিলেই certificate, আর স্কুলে পড়িতে হবে না।"

(পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড ১২শ পত্র)

"সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি' নাহি পা'ন অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে?
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

* * *

অতএব সেই সব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্ত করিলুঁ লীলা করি' নমস্কারে॥
যে কিছু কহিলুঁ এই দিক্ দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন॥" (চৈঃ চঃ)

"হর ব'লে ডাকরে ওরে অবোধ মন।
সময় থাকিতে কর হর নাম স্মরণ॥

এতদিন মিছা কাজে, করিলি যাপন,
একবার না ভজিলি সে রাঙ্গা চরণ।
নিত্য সুখভোগে রত মায়া মোহে অভিভূত,
বিষয় বাসনা আকিঞ্চন॥

নিজ হিত যদি চাও, ওরে পাষাণ মন,
হর পদে মন প্রাণ কর সমর্পণ।
এক মনে এক প্রাণে হররূপ কর ধ্যান,
হর বিনে নাহি পরিত্রাণ॥

সম্মুখে চেয়ে দেখ, দাঁড়ায়ে শমন,
স্থযোগ খুঁজিছে শুধু নিতে তোর প্রাণ।
হর হরি বল ভাই শমনের আর ভয় নাই
হর ব'লে যাবে দিব্য ধাম॥"

—— ০ ——

নমঃ শ্রীহরনাথায় শ্রীকৃষ্ণাভিন্নরূপিণে।
সদারপুত্রভৃত্যায় কৃষ্ণোন্মুখ করায় চ॥

—— ০ ——

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু!

সমাপ্ত।

